# কালসমুদ্রে আলোর যাত্রী
# রাজকৃষ্ণ রায়

অধ্যাপিকা শুক্লা দত্ত এম. এ., পি. এইচ. ডি.

পরিবেশক
**পুস্তক বিপণি**
২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রচ্ছদ
অভ্র রায়

প্রকাশনায়
শ্রীমতী প্রতিমা দত্ত, পূর্ণেন্দু প্রকাশন
৩০/সি, মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৪

মুদ্রণে
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২ বিডন রো,
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাদা

**পূর্ণেন্দু দত্ত**

যাঁর হাতে বইটি তুলে দিতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম

## মুখবন্ধ

রাজকৃষ্ণ রায় অধুনা-বিস্মৃত একটি নাম। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বা বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয় বটে, কিন্তু তাঁর জীবনী বা রচনার সঙ্গে এ কালের বাঙালি পাঠকের বিশেষ পরিচয় নেই। একদা মঞ্চসফল নাটকের রচয়িতা এবং সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে সব্যসাচীর ভূমিকায় অবতীর্ণ রাজকৃষ্ণকে পুনরাবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁর সম্বন্ধে এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। রাজকৃষ্ণের জীবনকথা সংকলনে সে কালের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, স্মৃতিকথা এবং ইতিহাসগ্রন্থের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। জীবনকথাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও এখন মনে হচ্ছে অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেল। ভবিষ্যতে নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেলে জীবনী-অংশটির সম্প্রসারণ সম্ভব।

রাজকৃষ্ণের নাটক নিয়ে যথাসাধ্য বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নাটকের রচনাগত বৈশিষ্ট্য যেমন আছে, তেমনি মঞ্চস্থ করার ইতিহাসের মধ্যে বাংলা নাট্যশালার একটি অধ্যায়ের পরিচয় নিহিত আছে। বিশেষ কাল-চিহ্নিত রচনা হওয়া সত্ত্বেও রাজকৃষ্ণের নাটকের আবেদন যে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়নি, তার প্রমাণ 'লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র' প্রহসনের সাম্প্রতিক অভিনয় ও মঞ্চসাফল্য। মনে হয়, ভিন্নতর কালেও রাজকৃষ্ণের নাটকের সমাদর সম্ভব।

রাজকৃষ্ণ নাটক রচনার জন্য খ্যাতি অর্জন করলেও তাঁর কবিপ্রতিভা সম্ভবত তাঁকে সাহিত্যের ইতিহাসে উচ্চতর স্থানের অধিকারী করেছে। স্বভাবকবিত্ব স্বতোৎসারিত গীতিকবিতার ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে, কিন্তু তিনি যে সচেতন শিল্পী ছিলেন, তার প্রমাণ ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যের স্বীকৃতিদান সেকালে সহজ ছিল না; রাজকৃষ্ণের কাব্যবোধের পরিচয় মিলবে তাঁর সাহিত্যসমালোচনায়।

শুধু নাটক আর কাব্য নয়, সাহিত্যের প্রায় সবগুলি ধারাতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ আমাদের বিস্মিত করে। গল্প-উপন্যাস থেকে শুরু করে রুষিয়ার ইতিহাস, নানা ধরনের অনুবাদ থেকে শুরু করে ভারতকোষ সংকলন—মাত্র চুয়াল্লিশ বছরের জীবনে প্রায় অসাধ্যসাধন বলে মনে হয়। অথচ সারাজীবন রাজকৃষ্ণকে কঠিন প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। দরিদ্র পরিবারে জন্ম, জীবিকার জন্য উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ, মঞ্চস্থাপনে ও পরিচালনায় বাস্তববুদ্ধির অভাব, আজীবন শারীরিক যন্ত্রণাভোগ, কিন্তু তবু উদ্যম হারাননি, আদর্শ বিসর্জন দেননি। মাঝে মাঝে সাময়িক হতাশা তাঁকে গ্রাস করেছে। তবু সৃষ্টির আনন্দে জীবনের প্রতিটি

মুহূর্ত ব্যয় করেছেন। আঁধার রাতে একলা পথিক রাজকৃষ্ণকে তাই কালসমুদ্রে আলোর যাত্রী বলা যেতেই পারে।

যাঁর নিরলস উৎসাহ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া গ্রন্থটি রচনার কাজ সম্পূর্ণ হতো না, তিনি আমার নিত্য শুভার্থী ও সাহিত্যপাঠে পথপ্রদর্শক ড. অলোক রায় —তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁকে আমার শ্রদ্ধাবনত প্রণাম জানাই। ড. অরুণকুমার মিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক-বিশেষপত্র পড়াবার সময় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহ জাগান, রাজকৃষ্ণ নিয়ে আলোচনায় তাঁর উৎসাহদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। বিশেষভাবে ঋণী অগ্রজপ্রতিম বিজ্ঞানী ড. তরুণকুমার রায়ের কাছে, যাঁর স্বতঃপ্রণোদিত সহায়তার কথা আজ খুবই মনে পড়ছে। তথ্য এবং বই সংগ্রহে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করেছেন শ্রীঅশোক উপাধ্যায়, শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য, ড. তপোব্রত ঘোষ, শ্রীশিলাদিত্য সেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, চৈতন্য লাইব্রেরি, বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি, ভারতী পরিষদ এবং মহাজাতি সদনের গ্রন্থাগারে বসে পড়াশোনা করেছি, সে সময়ে গ্রন্থাগারের পরিচালক ও কর্মীদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি তা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। মুদ্রণ এবং প্রকাশের কাজে দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্সের শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ এবং প্রেসের অন্যান্য কর্মীদের শুধু কর্মনৈপুণ্য নয়, মানবিকতাবোধেরও পরিচয় পেয়েছি।

মা ও বাবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রশ্ন ওঠে না। তাঁদের স্নেহচ্ছায়ায় জীবনের অনেক সংকট মুহূর্তে বাধাবিঘ্ন অতিক্রমে সক্ষম হয়েছি। বিশেষত আমার মায়ের প্রেরণা ও সহায়তা ছাড়া এ কাজ সমাপ্ত করা কঠিন হতো। গ্রন্থপ্রকাশে তাঁরাই সব চেয়ে বেশি আনন্দ পাবেন। দিদি ড. শুভ্রা রায় শুধু স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে নয়, সক্রিয়ভাবে রচনার কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে, দীর্ঘ দিনের আরব্ধ কাজটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে।

শুক্লা দত্ত

# সূচিপত্র

# ভূমিকা

"কাল বলিতেছে কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, আজি হউক, কালি হউক, বঙ্গবাসীর হৃদয়-দর্পণে তিনি প্রতিফলিত হইবেনই হইবেন।"[১]

রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যুর অনতিপরে 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় তাঁর রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কিংবা কবির অমরত্বলাভ সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা-প্রকাশ, আজকের দিনে শুধু অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা নয়, একান্ত বিস্ময়কর মনে হয়। সাহিত্যের ইতিহাসে রাজকৃষ্ণকে সাধারণত গৌণকবি ও নাট্যকারের থেকে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয় না। অথচ রাজকৃষ্ণ তাঁর স্বল্প জীবন-পরিসরে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় যে-বিচিত্র সৃষ্টি-কর্মের নিদর্শন রেখে গেছেন, তা সে কালে পাঠক ও দর্শকসমাজে সাদরে গৃহীত হয়েছে। কবিতা, উপন্যাস, গল্প, ঐতিহাসিক-নিবন্ধ, অনুবাদ রচনা—প্রায় সবক্ষেত্রেই তাঁর অনায়াস দক্ষতার নিদর্শন পাঠককে একদা অভিভূত করেছিল, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে তাঁর অপ্রতিহত জনপ্রিয়তা দীর্ঘদিন তাঁকে যে-খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল তার তুলনা নেই। শশিশেখর বসু প্রবীণ বয়সে স্মৃতিচারণকালে লিখেছেন,

"রাজকৃষ্ণ রায়কে দেখেছি ১৮৮৮-৯ সালে।...জীবনী লেখায় আমি পটু নই। এটা তাঁর জীবনচরিত নয়। তিনি ছেলে বুড়োদের উপর কি রকম নাটকীয় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাই জানতে আধুনিকেরা শুনেছি অনেকে উৎসুক।...যাঁরা তাঁকে দেখেননি তাঁরা গৃহে গ্রন্থাবলী পড়ে কবি, ভক্ত, দৃশ্যকাব্য রচয়িতা, তেজস্বী লেখক বলে তাঁকে এখনও অভিবাদন করেন। আবার পরবর্তী সাহিত্য-ভারে ভারাক্রান্ত বাংলাদেশের অনেকেই তাঁকে ভুলে গেছেন, তাঁরা বলবেন, 'হ্যাঁ চিনেছি, বলে যাও।'...

"কলেজ স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি: ওদিক থেকে একটি যুবক হাত নেড়ে আমাকে হুকুম করলেন—'ছাড় পথ বিলম্ব না সয়! / বড় আশা মনে / হরি দয়াময় হেরিব নয়নে।' বুঝলাম ইনি 'স্টেজ-স্ট্রক'; অভিনেতা হবার জন্য ব্যগ্র। স্টেজ-ফিভার জন্য রাস্তায় সনক ঋষি সেজে অভিনয় করচেন।

"আর এক গলিতে ছোট ছেলেরা 'রামের বনবাস' দেখে চেঁচাচ্ছে, 'তুই কি নিবি?'—টাকার তোড়া। 'তুই কি নিবি?'—মোটা মোটা টাটু ঘোড়া।

"আর একজন আস্ফালন করচেন ফুটপাথ দিয়ে যেতে যেতে 'দেবমূর্তি নাহি রবে! কদর্য মূরতি হবে।' ও ফুটপাতের আর এক কলেজের ছেলে উত্তর দিল, 'বাক্য মোর না হবে না হবে অন্যথা!' (প্রেসিডেন্সি কলেজের স্টেজে ছাত্ররা সেকসপিয়ার প্লে করতো, কিন্তু এত উত্তেজনা দেখতাম না।)

"মনে হতো কলকাতা কি পাগল হলো না কি? একজন নাটক লিখলেন,

কালসমুদ্রে. ১

অন্য লোক থিয়েটার করলো, আর রাস্তার লোক খ্যাপা পাগলের মতন গাম্ভীর্যের সঙ্গে অভিনয় করে বেড়াতে লাগলো। রঙ্গে নয়, দ্রুত পদ চালনায় সোজা তাকিয়ে। রাজকৃষ্ণ রায়ের উপর ভক্তি আমাদের মনে গভীর ভাবে জাগলো।"[২]

কিন্তু রাজকৃষ্ণের নাটক উনিশ শতকের শেষপাদে অসামান্য প্রচার ও মঞ্চ-সাফল্য লাভ করলেও গিরিশচন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক ধীরে ধীরে সাধারণ দর্শকের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার পর রাজকৃষ্ণ কিছুটা পশ্চাদ্‌পটে চলে যান। রাজকৃষ্ণ বয়সে গিরিশচন্দ্র ঘোষের থেকে পাঁচ বছরের মতো ছোট হলেও, পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনায় আত্মপ্রকাশের কিছু আগে। গিরিশচন্দ্রের মতো তাঁকেও 'ড্রামাটিস্ট' না বলে 'প্লেরাইট' বলাই সংগত। রাজকৃষ্ণ অভিনয়ে সুনাম অর্জন করলেও, নট হিসাবে তিনি স্মরণীয় কীর্তির অধিকারী নন। তাঁর নাটকের সংখ্যাও গিরিশ-চন্দ্রের থেকে কম।[৩] তবে রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র প্রায় আরও আঠারো বছর জীবিত ছিলেন এবং মৃত্যুর তিন মাস আগেও তাঁর শেষ নাটক প্রকাশিত হয়। সেদিক থেকে রাজকৃষ্ণ 'গিরিশযুগে' সর্বাধিক সংখ্যক নাটক লিখেছেন বললে সম্ভবত ভুল হবে না।

সুকুমার সেনের মতে, "১৮৮০ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ—অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের জীবনের অবসান পর্যন্ত—বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চ গিরিশ-শাসিত ছিল বলা যায়।"[৪] রাজকৃষ্ণ যখন বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য নাটক লিখছেন (১৮৭৫-৭৮) গিরিশচন্দ্র তখন নবগঠিত ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালনা ভার গ্রহণ করে 'আগমনী' (১৮৭৭) ও 'অকালবোধনের' (১৮৭৭) মতো ক্ষুদ্র 'নাট্যরাসক' বা 'নাট্যগীতি' রচনা করছেন। (নাটকগুলি গিরিশচন্দ্রের স্বনামে প্রকাশিত হয়নি।) এই সময়ে যে কয়েকজন নাট্যকারের নাটক সাধারণত মঞ্চে অভিনীত হতো, তাঁরা হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, উপেন্দ্রনাথ দাস, অতুলকৃষ্ণ মিত্র এবং অমৃতলাল বসু। ১৮৭৪ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'এমন কর্ম আর ক'রব না', 'অশ্রুমতী', মনোমোহনের 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' ও 'নাগাশ্রমের অভিনয়', উপেন্দ্রনাথের 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', অতুলকৃষ্ণের 'আদর্শ সতী', 'নির্বাপিত দীপ', 'প্রণয়-কানন' বা 'প্রভাস', 'আগমনী' প্রভৃতি, এবং অমৃতলালের 'হীরকচূর্ণ', 'চোরের উপর বাটপাড়ি' নাটক প্রকাশিত হয়েছে। রাজকৃষ্ণ এঁদেরই অনুসরণে পৌরাণিক বিষয়াবলম্বনে গীতাভিনয় বা গীতিনাট্য এবং সামাজিক অসংগতি অবলম্বনে প্রহসন বা কৌতুকনাট্য রচনা করেছেন। কিন্তু রাজকৃষ্ণের রচনায় এঁদের নাটকের প্রভাব সন্ধান করে লাভ নেই, কারণ যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁর নাট্যাদর্শ প্রথমাবধি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। এমন কি পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র যখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার

হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন, তখনও রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের অনুকরণ করেননি। সাদৃশ্য যেটুকু দেখা যায়, তা হলো যুগগত অভিন্ন নাট্যবোধ, এবং দর্শকরুচির অনুমোদন লাভের আকাঙ্ক্ষা।

রাজকৃষ্ণ নাটক লিখেছেন মঞ্চের দিকে তাকিয়ে। তিনি নিজে সুঅভিনেতা ছিলেন, নাট্যপরিচালনাতেও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর নাটক একদা মঞ্চ সাফল্য লাভ করে, কারণ নাটক রচনাকালে অভিনয়োপযোগিতার কথা তিনি ভেবেছেন সব চেয়ে বেশি। সাহিত্যকর্ম হিসাবে বিচার করলে তার মধ্যে অনেক দুর্বলতা নির্দেশ করা সম্ভব। আধুনিক সমালোচকেরা যে জন্য প্রায় 'এক কথায়' তাঁর সমগ্র নাট্যসৃষ্টিকে ব্যর্থ বলে নির্দেশ করেছেন,—"এক কথায় বলিতে গেলে নাট্যরচনায় রাজকৃষ্ণের কোন প্রেরণা ছিল না, কেবল মাত্র প্রয়োজনীয়তার তাগিদে তাঁহাকে নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের অন্যান্য নাট্যকারের মতই তিনি রঙ্গমঞ্চ পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেইজন্যই তাঁহাকে নূতন নূতন নাটক পরিবেশন করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অন্তরে প্রেরণা না থাকিলে বাহিরের তাগিদে সাধারণতঃ যে বস্তু সৃষ্টি হইয়া থাকে রাজকৃষ্ণের নাটকগুলিও তাহাই হইয়াছে, ইহারা অন্তরের দিক দিয়া ত নাটক হয়ই নাই, এমন কি বাহিরের দিক দিয়াও অনেক সময় নাটকের রূপ লাভ করিতে পারে নাই।"[৫] উনিশ শতকের শেষপাদের অধিকাংশ বাঙালি নাট্যকার 'প্রয়োজনীয়তার তাগিদে' নাটক লেখেন, কিন্তু 'বাহিরের তাগিদে' নাটক লিখলে তা নাটক হবে না, এমন কথা বলা অনুচিত। উনিশ ও বিশ শতকের অনেক শ্রেষ্ঠ নাটক 'বাহিরের তাগিদে' অর্থাৎ মঞ্চের প্রয়োজনে লেখা হয়, কিন্তু সেইজন্যই সেগুলি অপসৃষ্টি বিবেচিত হতে পারে না। অন্যদিকে 'অন্তরের প্রেরণা' থাকলেই তা উৎকৃষ্ট রচনা বলে পরিগণিত হয় না। আসল কথা, সৃষ্টিক্ষমতা। বলাবাহুল্য, সৃষ্টিক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও একজন লেখকের সব রচনা সমান উৎকর্ষ লাভ করে না, যার নিদর্শন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। রাজকৃষ্ণের সব নাটক সার্থকতা লাভ করেনি, কিন্তু নাট্যরচনার কোনো প্রেরণা তাঁর মধ্যে ছিল না, এ রকম সিদ্ধান্ত অসমীচীন হবে।

প্রথমত, নাট্যকারকে তাঁর যুগপটভূমিকায় রেখে বিচার করতে হবে। এক যুগের জনপ্রিয় নাট্যকার অন্য যুগে জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু উনিশ শতকে রাজকৃষ্ণের সমকালে নাট্যকারের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। রাজকৃষ্ণের প্রথম নাটক 'পতিব্রতা' ( ১৮৭৫ ) যে-বছর প্রকাশিত হয়, সেই বছর আরও অন্তত ছেচল্লিশটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র চার-পাঁচটি নাটক মঞ্চসাফল্য লাভ করে। তারপর প্রায় আঠারো বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তিনি প্রায় বাহান্নটি নাটক রচনা করেন, এবং নাটকগুলি শুধু মঞ্চের দর্শক

নয়, বাঙালি-পাঠকও সাদরে গ্রহণ করেছিল তার ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে। সে কালের বিভিন্ন পত্রিকায় রাজকৃষ্ণের নাটক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছিল তা পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা সম্বন্ধে সমালোচকদের মনে অন্তত কোনো সন্দেহ ছিল না—

১. আমরা তাঁহার নাটক পড়িতে পড়িতে কত সময় অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। কল্পনাবলে তিনি যে দুই একটি চিত্র সংযোজন করিয়াছেন তাহা অতীব সুন্দর এবং মনোমদ হইয়াছে। লক্ষ্মণ যেখানে রামচন্দ্রকে সাজাইবার জন্য ফুলের মালা গাঁথিছেন আর আপনা আপনি মনের হরষে ভবিষ্যৎ-সুখচিন্তা করিতেছেন, সে দৃশ্যটি অতি মনোহর; তাহা পড়িবামাত্র হৃদয় পুলকে ভরিয়া উঠে। রামায়ণের চরিত্রগুলির যথাযথ চিত্র বিষয়ে রাজকৃষ্ণবাবুর ক্ষমতা দেখিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি।[৬]

২. রাজকৃষ্ণবাবু সেই সর্বজনপ্রিয় মহাভারতের করুণরসাত্মক যদুবংশ-ধ্বংস ব্যাপার নাটকাকারে বিবৃত করিয়াছেন। পদ্য-পটু রাজকৃষ্ণবাবু যে, আগাগোড়া পদ্যে নাটকখানি লিখিয়াছেন, ইহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। নাটকের পাত্রগুলির প্রকৃতিও বেশ অঙ্কিত হইয়াছে। বলরাম ও কৃষ্ণ সকলের অপেক্ষা সুন্দর হইয়াছেন। অভিনয় কালে নাটকখানি নিশ্চিতই লোকের মন হরণ করিবে।[৭]

৩. নরমেধযজ্ঞের কুশীদজীবী মণিদত্তের চরিত্র কবির হাড়ে হাড়ে গাঁথা ছিল। নাটকেও সেই চরিত্র বড় উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। আমরা জানি এই নাটকের অভিনয় দেখিয়া তাঁহার জনৈক ভয়ঙ্কর সুদখোর মহাজন তাঁহাকে সমস্ত সুদ রেহাই দিয়াছিলেন।[৮]

দ্বিতীয়ত, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রাজকৃষ্ণ যখন নাটক লেখেন তখন বিচ্ছিন্নভাবে দু'একটি নাটকের ক্রটি-নির্দেশ, তাঁর সাহিত্যকৃতির যথার্থ বিচার নয়। অন্তরের প্রেরণা না থাকলে নাটক কেন, কাব্য বা গল্প কোনো কিছু রচনাই সম্ভব নয়। সাময়িক উত্তেজনায় দু'চারটি গ্রন্থ রচনা অনেকের পক্ষে সম্ভব হলেও, দীর্ঘদিন ধরে স্বতন্ত্র গ্রন্থের এবং একাধিক প্রকাশকের উদ্যোগে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর অব্যাহত জনসমাদর খুব বেশি দেখা যায় না। রাজকৃষ্ণ প্রথম দিকে নিজেই তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে সাত খণ্ডে রাজকৃষ্ণের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লেখেন—"বহুদিন হইতে পুস্তকের ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকায়, আমারবিশ্বাস আছে যে মূল্যাধিক্যপ্রযুক্তই আমাদের দেশে কোন পুস্তকই অধিক বিক্রয় হয় না। সেই বিশ্বাসেই আমি রাজকৃষ্ণ বাবুকে তাঁহার গ্রন্থাবলী অল্প মূল্যে প্রকাশ করিবার কথা বলি। তাহাতে

তিনি সম্মত হইলে আমি এই বহুব্যয় সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি। বলাবাহুল্য যে এই উদ্যমে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় সংস্করণের আয়োজন করা হইয়াছে।"[৯] রাজকৃষ্ণের জীবনীকার জানিয়েছেন, "প্রথম সংস্করণের পর, দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম ভাগ গ্রন্থাবলী এক কালীন দুই সহস্র কাপি মুদ্রিত হয়, কিন্তু সে দুই সহস্র কাপিই অল্পদিবসের মধ্যে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায়—এমন কি বঙ্গবাসী প্রভৃতি প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে গুরুদাস বাবুকে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিতে হয় যে 'আর কেহ মূল্য পাঠাইবেন না, গ্রন্থাবলী নাই।' এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ধীরে ধীরে কবির আর্থিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। পুস্তক বিক্রয়ের দ্বারা এই সময় তিনি অর্থের মুখ দেখিতে পান।"[১০]

কোনো সন্দেহ নেই, স্বল্পমূল্যে গ্রন্থাবলী প্রকাশের উদ্যম তার পরেও অনেকবার দেখা গেছে, কিন্তু শুধু মাত্র মূল্য হ্রাসের ফলে কোনো গ্রন্থের প্রভূত বিক্রয় সম্ভব নয়। পাঠক রাজকৃষ্ণের রচনার জন্য আগ্রহ পোষণ করতো বলেই তাঁর গ্রন্থাবলীর ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়েছে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় গ্রন্থাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা না হলেও, জানানো হয়েছে, "তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে অনেকেরই আগ্রহ। তাঁহার সমুদয় গ্রন্থ একত্রে মুদ্রিত হওয়ায় অনেকেই আহ্লাদিত হইবেন সন্দেহ নাই। বিশেষ অল্প মূল্যে পাঠের এত অধিক সামগ্রী আর কখন বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।"[১১]

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, রাজকৃষ্ণ মঞ্চাভিনয়ের জন্য নাটক লিখেছেন। যদি সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাটক যথোচিত মূল্য লাভ না করে তাহলেও বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তাঁর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি লাভ করবে। বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে এক সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, পরে নিজে বীণা থিয়েটার স্থাপন করলেন, শেষ জীবনে স্টার থিয়েটারে বেতনভুক্ নাট্যকার ছিলেন বেঙ্গল থিয়েটারে তাঁর 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' (প্রথম অভিনয় ১১.১০.১৮৮৪) অসামান্য মঞ্চসাফল্য লাভ করে। দীর্ঘদিন অব্যাহত দর্শক-আকর্ষণে সক্ষম, এই ধরনের নাটক যিনি লেখেন, তিনি নাটক লিখতে জানতেন এমন মনে করা অন্যায় হবে না। ১৮৮৭ সালে নাট্যসমালোচক 'প্রহ্লাদচরিত্রে'র অভিনয় সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি। সংপ্রতি উক্ত রঙ্গালয়ে [অনুসন্ধান] সমিতির কোন কর্ম্মচারী 'প্রহ্লাদ চরিত্রে'র অভিনয় দেখিতে যান। তাঁহার মতে প্রহ্লাদের অভিনয় বাস্তবিকই বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির 'বিজয় নিশান'। ফলতঃ 'প্রহ্লাদ চরিত্র' আজি পর্য্যন্ত পুরাতন হইল না, ইহা কি রঙ্গ-ভূমির অল্প গৌরবের কথা?"[১২] শুধু বেঙ্গল থিয়েটারে নয়, প্রায় একই সঙ্গে বীণা থিয়েটারেও 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' (প্রথম অভিনয় ১৮.১২.১৮৮৭) প্রভূত পরিমাণে দর্শক আকর্ষণে সক্ষম হয়। প্রথম দিকে রাজকৃষ্ণ নিজে কিছুদিন

হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় অভিনয় করেন, 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় সেই নাট্য-প্রযোজনা সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়—

The author acted Hiranyakasipoo and played his part admirably and displayed his power of representation to the greatest advantage. He carried the house with him without a single break. All the necessary qualifications of a successful actor he appeared to possess in a great degree. No unnecessary gesture or gesticulation was even seen in his acting. The boy hero vied with him for the credit of supremacy and he carried it off to the delight of the audience. His sweet and melodious voice and devotional postures and attention produced a charming effect on the audience. He held the whole house breathless over his noble fate throughout. The mother of the hero did contribute not a little to the success of the play. Her piteous solicitude to save the life of her blessed child was most admirably rendered. She had the entire sympathy of the audience. As each scene followed the other, the excitement of the audience increased more and more, and at last it reached its highest climax and the audience were enchanted. All credit is due to Babu Rajkristo Roy.[১৩]

শুধু 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নয়, বীণা রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন সময়ে 'হরধনুর্ভঙ্গ', 'চন্দ্রহাস', 'হরিদাস ঠাকুর', 'দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ', 'মীরাবাঈ', 'চমৎকার' প্রভৃতি নাটক সাধারণ দর্শককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। রাজকৃষ্ণ ব্যবসায়িক সাফল্য লাভের কথা ভেবে বীণা রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেননি, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ আদর্শ স্থাপন। সমসাময়িক কালের দর্শক জানিয়েছেন, "আমরা বিগত ৮ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বীণা রঙ্গগৃহে চন্দ্রহাস নামক একখানি নবনাটকের মহলা দেখিতে গিয়াছিলাম। সকলেই অবগত আছেন, উক্ত রঙ্গালয়টি শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় কর্তৃক স্থাপিত। অন্যান্য রঙ্গালয়ে যেরূপ স্ত্রীলোকের অভিনয় বারাঙ্গনা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, এই নব-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে সেরূপ হয় না। এই পার্থক্যই বীণা রঙ্গালয়ের বিশেষ চিহ্ন ও এই পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। বাবু রাজকৃষ্ণ রায়, বহু যত্নে, বহু পরিশ্রমে, বহু অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া, এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বীণা রঙ্গালয় এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই,

কিন্তু এই অসম্পূর্ণাবস্থায় যাহা দেখিলাম তাহাতেই ইহা প্রশংসার যোগ্য। দৃশ্যপটগুলি মহামূল্যের না হইলেও, অতি পরিপাটি হইয়াছে—তবে কমদামের জিনিসে যেমন আভ্যন্তরিক গুণ অপেক্ষা বাহ্যিক চাকচিক্য অধিক থাকে, ইহাতেও সেইরূপ বাহ্যিক চাকচিক্যের আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা গুণহীন নহে।"[১৪] মঞ্চের প্রয়োজনের কথা ভেবে রাজকৃষ্ণকে নানা ধরনের নাটক লিখতে হয়েছে, এবং বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবে বীণা রঙ্গমঞ্চ অর্থকরী সাফল্য লাভ না করলেও নাট্যসমালোচকদের প্রশংসা লাভে সক্ষম হয়েছে, যেমন—

১. On Saturday last the new drama 'Chundrahas' by Baboo Raj Kristo Roy, was for the third time put on the stage of this theatre. The performance was good in every respect and the dresses and sceneries were in an improved style. On the Sunday following the wellknown drama 'Prolhad Charitra' by the same author, was for the first time put on the boards before a respectable gathering. The part of 'Prolhad' was acted by a lad 10 years old. The principal part, that of 'Horono Kosiva', was played by the author himself.[১৫]

২. Last evening, Boboo Raj Krishna Roy's new drama 'Chandrahash' was produced at this theatre. The house was full. The sceneries and dresses were good. The play was a great success with the exception of some minor defects, such as punctuality in commencing the play. The boy who played the part of the hero sang excellently well. In the part of Dhreshto badhi the minister's fluent delivery and commanding voice were appreciated by the audience, Kulindo and his wife, Madhabutty, acted well. The author himself played the part of Bhuddro and was comical throughout.[১৬]

৩. আয়ানের নৃত্য ইংরেজ-ইংরেজিনীদের উৎকৃষ্ট বল নাচের তুলনায় কিছুতেই ন্যূন নহে। এরূপ নৃত্য অনেক উদ্যম, চেষ্টা ও শিক্ষার ফল, সন্দেহ নাই।

চন্দ্রাবলী ও রাধার বালক-বেশ পরিহার ও নারী বেশ-পরিধান দৃশ্যগুলি বড়ই নয়ন-প্রীতিকর ও মনোমুগ্ধকর। বীণা থিয়েটারের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমরা আন্তরিক প্রীতি লাভ করিয়াছি।

কৃষ্ণ, রাখালবালক, চন্দ্রাবলী ও রাধা, পরস্পরের হ্যাঁচকা টানের সময় সমস্বরে গীত-উচ্চারিত অতি সুমধুর 'পূর্ণ কোরস'—যেন এখনও কর্ণে লাগিয়া রহিয়াছে।

আমাদের সুযোগ্য ইংরেজী সহযোগী ইণ্ডিয়ান মিরার-সম্পাদক, রাজকৃষ্ণ বাবুকে 'The Great Tragio-Comedian of the day' বলিয়াছেন। গোবর্দ্ধনের মাতা ( চন্দ্রাবলীর শাশুড়ী ) ভাকুণ্ডা গোবর্দ্ধনকে ভূতলে পতিত ও নীরবে অবস্থিত দেখিয়া সখেদে মড়াকান্না ধরণে উৎকৃষ্ট সুর লয়-গঠিত যে গীত গাহিয়াছিল, সেইরূপ গীতগুলিই মিরার-সম্পাদকের কথার যথার্থতা প্রতিপাদন করিতেছে।[১৭]

পরে স্টার থিয়েটারে রাজকৃষ্ণ নাট্যকার হিসাবে যোগ দিলে, অন্তত সাময়িকভাবে গিরিশচন্দ্রের অভাব তিনি দূর করতে সক্ষম হন। স্টারে 'নরমেধযজ্ঞ', 'লয়লা-মজনু', 'বনবীর', 'ঋষ্যশৃঙ্গ', 'বেনজীর-বদরেমুনীর' প্রভৃতি নাটক শুধু রাজকৃষ্ণের সুনাম বৃদ্ধি করেনি, তাঁর অকাল মৃত্যুর সময় তাঁকে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের গৌরব দান করে। যথার্থ প্লেরাইটের মতো রাজকৃষ্ণ মঞ্চসফল নাটক রচনার কৌশল জানতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি একজন যথার্থ কবি ছিলেন বলেই তাঁর নাটক সর্বদা না হলেও কখনো সাহিত্যমূল্যে বরণীয় ও স্মরণীয় হয়েছে।

'বঙ্গদর্শনে' রাজকৃষ্ণের গ্রন্থাবলী সমালোচনাকালে প্রথমেই জানানো হয়েছে—"রাজকৃষ্ণবাবু কবি বলিয়া পরিচিত।"[১৮] রাজকৃষ্ণ নিতান্ত বালক বয়স থেকে কবিতা রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বঙ্গভূষণ' চতুর্দশপদী কবিতার সংকলন। কাব্যরচনায় রাজকৃষ্ণের অনায়াস নৈপুণ্য সে কালে যেমন প্রশংসা লাভ করেছে, তেমনি কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রকরণে অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য তাঁর রচনাকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিয়েছে। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর 'অবসর-সরোজিনী'-'নিভৃত নিবাস'-'নিশীথ-চিন্তা' কাব্যের সমালোচনাকালে সমালোচক একাধিক ত্রুটি নির্দেশ করলেও, সেই সঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "সকলেই সমস্বরে কাব্য বিষয়ে তাঁহার কল্পনার অরুণ বিকাশ, ভাষার স্ফটিক বিমলতা, ছন্দের মৃদু তরল গতির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া আসিতেছে, এবং আমরাও সরল অন্তরে সে প্রশংসার অনুমোদন করি।"[১৯] রাজকৃষ্ণের নাটকের মতোই তাঁর সব কবিতা আধুনিক পাঠকের কাছে সমান তৃপ্তিকর মনে হয় না, কিন্তু তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি ভালো করে পড়লে তার মধ্যে শুধু প্রশংসনীয় কিছু অংশ নয়, কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধিও চোখে পড়বে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার কবি রাজকৃষ্ণের ঐতিহাসিক ভূমিকা এইভাবে নির্দেশ করেছেন, "ইঁহার কবিতায় যে পরিমাণে স্বতঃস্ফূর্তি ছিল তাহা অনেক সমসাময়িক খ্যাতনামা লেখকের রচনায় পাই নাই। ছন্দেই রাজকৃষ্ণের স্বাধীনতার প্রকাশ বেশি। পদ্য-ঘেঁষা উচ্ছ্বাসপূর্ণ গদ্যকে

পদ্যের পংক্তিতে সাজাইয়া ইনি তাহা এক রকম গদ্য-কবিতায় পরিণত করিয়াছিলেন। কবিতার ছন্দে ও ভাবে রাজকৃষ্ণ অনেক সময়ে হেমচন্দ্রের অনুবর্তন করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের রচনার সঙ্গে রাজকৃষ্ণের রচনার সাদৃশ্য শুধু একই শব্দের অথবা বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তিতে ও বাগ্‌বাহুল্যে।...প্রচুর গান লিখিয়াছিলেন রাজকৃষ্ণ। ইঁহার নাটকের কোন কোন বাঙ্গালা ও ভাঙ্গা হিন্দী গান একদা লোকের মুখে মুখে ফিরিত।"২০ স্বতঃস্ফূর্ততার জন্য রাজকৃষ্ণকে অনেক সময় 'স্বভাব কবি' বলে মনে হয়, কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের পরে উনিশ শতকে আর কোনো বাঙালি কবি রাজকৃষ্ণের মতো কবিতার শিল্পরূপ,—বিশেষভাবে কবিতার ছন্দ নিয়ে এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভাবেননি। রাজকৃষ্ণকে, ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বলা যায়, যার প্রথম ব্যবহার দেখা গেছে 'নিভৃতানবাস' (১৮৭৮) কাব্যে। পরে রাজকৃষ্ণের 'হরধনুর্ভঙ্গ নাটকে' আভিনয়িক অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটেছে, এবং নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "এ দেশে কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাহির করেন। চতুর্দ্দশ অক্ষরে মিত্রাক্ষরিক পয়ার ছন্দ বাঙ্গালায় বহুদিন হইতে প্রচলিত, মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সেই চতুর্দ্দশটি অক্ষরেই গ্রথিত। বঙ্গরঙ্গভূমিতে উক্ত কবির মেঘনাদবধ কাব্যখানি নাটকাকারে সজ্জিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথাবার্ত্তায় কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই উচ্চারণ ও প্রয়োগাদিকে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের নূতন ও সুন্দর অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করি। অভিনয়কারিদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদবধের চতুর্দ্দশাক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষর ছন্দ, অঙ্গভঙ্গী ও বাগভঙ্গীর অনুগত হইয়া, আমাদের কর্ণে কেমন আর একতর নূতন ছন্দের ছাঁচ গড়িয়া দিয়াছিল। তখন বোধ হইয়াছিল, যেন মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে আর এক প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রসূত হইতেছে। সেই আভিনায়ক ছন্দের পক্ষপাতী হইয়া, আমি একসময়ে বঙ্গ-রঙ্গভূমির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও অসাধারণ নটচূড়ামণি ৺বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে, ঐরূপ ছন্দের নাটক সৃষ্টি করিয়া অভিনয় করিতে অনুরোধ করি, তাহাতে তিনি বলেন যে, 'এখন মাইকেলের অমিত্রাক্ষরই চলুক, ক্রমে ক্রমে পাকিয়া কিছুকাল পরে রঙ্গ-ভূমিতে অভিনেতারা এই মাইকেলী ছন্দ হইতে আভিনয়িক ছন্দের মৌখিক কবি হইয়া অভিনয় করিতে পারিবেন।' ইংল্যাণ্ডেও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। শরচ্চন্দ্রবাবুর সেই কথা আমার মনে জাগিয়াছিল। এখন দেখিতেছি, ফলেও তাহাই দাঁড়াইতে চলিল। শুভক্ষণে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ দেখা দিয়াছিল, এবং অভিনয়ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিল, নহিলে আধুনিক 'ভাঙ্গা

অমিত্রাক্ষর ছন্দ' বাঙ্গালায় হইত কি না সন্দেহ।"[২১] রাজকৃষ্ণ সেই সঙ্গে আরও জানিয়েছেন, "ইংল্যণ্ডে কোন কোন অভিনেতৃ সম্প্রদায় সেক্ষপীর, বেন জনসন্, অটওয়ে, ইয়ং প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবিদিগের ছন্দোময় নাটকের ছন্দ এইরূপ আভিনয়িক ভাঙা-ছন্দে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন।"[২২] রাজকৃষ্ণ নাট্যসংলাপের ভাষা-ছন্দ নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছিলেন, ( "আভিনয়িক ছন্দ প্রসঙ্গে রাজকৃষ্ণ রায় যে-কথাগুলি বলেছেন তার গুরুত্ব স্বীকার্য।"[২৩] ) এবং অমিল মুক্তকছন্দ নিয়ে বিভিন্ন নাটকে তাঁর পরীক্ষা গৈরিশছন্দকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেছিল এমন বললে ভুল হয় না। গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' নাটকে প্রথম গৈরিশ ছন্দের প্রয়োগ দেখেছি। 'রাবণবধ' নাটকের প্রথম অভিনয় ৩০ জুলাই ১৮৮১। রাজকৃষ্ণের 'নিভৃত-নিবাসে'র কথা বাদ দিলেও তাঁর 'হরধনুর্ভঙ্গ' 'রাবণবধে'র সঙ্গে প্রায় একই সময়ে মঞ্চস্থ হয়। ফলে গিরিশচন্দ্র ছন্দের ব্যাপারে রাজকৃষ্ণের কাছে ঋণী না হলেও উভয়ের নাট্যচিন্তা ও ছন্দচিন্তার ঐক্য বিশেষ করে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

আভিনয়িক ছন্দ নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে রাজকৃষ্ণ 'ছন্দের আর একটি নবরীতি'[২৪] প্রবর্তন করেন তাঁর 'রাজা বিক্রমাদিত্য' ( ১৮৮৪ ) নাটকে—"ইহা আভিনয়িক পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক গদ্য। দুই একস্থলে আভিনয়িক পদ্যচ্ছন্দও আছে, কিন্তু উহার ভাগ অতি অল্প। বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত এরূপ পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক গদ্যে কোন নাটক প্রকাশিত হয় নাই। অভিনেতৃগণের পক্ষে পদ্য যেরূপ সহজ অভ্যাসের সামগ্রী, গদ্য সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত আমি সহজে অভ্যস্ত হইবার সুবিধার জন্য এই নূতন ধরণের গদ্য নাটক লিখিলাম। আমার বিবেচনায় প্রচলিত ধরণের গদ্যাপেক্ষা এরূপ পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক ধরণে গদ্য নাটক লিখিলে অভিনয় ও অভিনেতৃবর্গের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ বাগ্‌ধৃতি বা বাক্‌পূর্ত্তির ( প্রম্‌টিং ) পক্ষে এইরূপ গদ্যপঙ্‌ক্তি যেমন অভিনয়-ব্যাঘাত-নিবারণের সুগম-উপায়, টানা গদ্য পঙ্‌ক্তিতে তেমন হইতে পারে না।"[২৫] মনে হয় 'আভিনয়িক পদ্য-পঙ্‌ক্তিক গদ্য' রচনাকালেই তাঁর মনে জাগে 'পদ্য পৌঙ্‌ক্তিক গদ্য-পদ্য' তথা গদ্যকাব্য রচনার ইচ্ছা। ১৮৮৪ সালের জুলাই মাসে 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায় তাঁর 'বর্ষার মেঘ' নামে যে রচনাটি প্রকাশিত হয়, তার পাদটীকায় তিনি লেখেন, "যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল পদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্য পৌঙ্‌ক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নূতন অঙ্গ। লেখা তো হইল। এখন পাঠকমণ্ডলী কি বলেন।"[২৬] আধুনিক ছন্দোবিজ্ঞানী রাজকৃষ্ণের এই প্রয়াস সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "রাজকৃষ্ণ রায় 'গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব' উপলব্ধি করেই গদ্যভাষাকে 'পদ্য পৌঙ্‌ক্তিক প্রণালীতে' ছোট বড়ো ভাব-গুচ্ছের আকারে সাজিয়েছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইতিপূর্বেই ( ১৮৬১ ) অনুরূপ

পংক্তিভাগে সাজিয়ে গদ্য কবিতা লিখেছেন।···তবে শব্দগ্রন্থন বা পংক্তিভাগ সেখানে সর্বাংশে সার্থক হয়নি, বাক্যগুলিতে ভাবস্পন্দও সুস্পষ্ট নয়। সে তুলনায় রাজকৃষ্ণ রায় অনেক বেশি সফল হয়েছেন। সুতরাং 'পদ্য পৌঙ্‌ক্তিক' গদ্য কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁকে পথিকৃতের সম্মান দেওয়া যেতে পারে। গদ্য কবিতা বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বে (১৮৭৮) তাঁর কবিতাপুস্তকে (মেঘ, বৃষ্টি এবং খদ্যোত) প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু 'পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক প্রণালীতে' সেখানে সাজিয়ে দেননি। এই গদ্যের মতো ছোটবড়ো পংক্তিভাগে সাজাতে রবীন্দ্রনাথের মনেও প্রথম দ্বিধা ছিল: সে কারণেই 'লিপিকায়' (১৯২২) গদ্য-কবিতা 'বস্তুত গদ্য অনুচ্ছেদের আকারে সাজিয়েছিলেন।·· এই দ্বিধা 'পুনশ্চ' (১৯৩২) রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম কাটিয়ে উঠেছেন।—এদিক থেকে রাজকৃষ্ণ রায় উনবিংশ শতকের শেষ পাদেই গদ্য-কবিতার 'পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক' বিন্যাসে যে সাহস দেখিয়েছেন তার গুরুত্ব কম নয়।"[২৭]

প্রচলিত মিত্রাক্ষর ছন্দও রাজকৃষ্ণের হাতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে। তিন মাত্রা বা ছ'মাত্রার কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দের প্রয়োগ বিহারীলালের প্রভাবজাত হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে রাজকৃষ্ণের অনায়াস নৈপুণ্য লক্ষ্য করতে পারি—

'গিরি-শিরে ব'সে দেখিনু নয়নে,
প্রতীচি-বিভাগে গগন-রবি
গড়া'য়ে গড়া'য়ে পড়ি'ছে কেমনে,
প্রকাশি' নূতন লোহিত ছবি!'[২৮]

'নিভৃত-নিবাস' কাব্যে রাজকৃষ্ণ শুধু ভাঙা-অমিত্রাক্ষর ছন্দ নয়, অমিল মুক্তকের আরও কয়েক ধরনের রূপবন্ধ ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত 'দণ্ডক' ছন্দের অনুসরণে বাংলায় 'বহুপদী-দীর্ঘরেখা' ছন্দ প্রবর্তনের জন্যও রাজকৃষ্ণ স্মরণীয়তা লাভ করতে পারেন। কাব্যের নবম সর্গে এই ছন্দের ব্যবহার কালে কবি পাদটীকায় মন্তব্য করেন, "এই ছন্দটি নূতন গড়িয়া দেওয়া হইল। ইহাতে বহুবিধ ছন্দের পদ আছে এবং ইহার পঙ্‌ক্তিগুলি দীর্ঘ বলিয়া বহুপদী দীর্ঘরেখা নাম দেওয়া গেল।"[২৯]

শুধু নাটক বা কবিতা নয়, গদ্য এবং পদ্য আখ্যান রচনাতেও রাজকৃষ্ণের প্রতিভা একদা স্বীকৃতি পেয়েছে। উনিশ শতকে বহুপ্রচলিত আখ্যানকাব্যের ধারানুসরণে তাঁর আগ্রহ ছিল না, তিনি চেয়েছিলেন কবিতার আধারে গল্পরস পরিবেশন করতে। কাহিনী উদ্ভাবনে কোনো অসামান্য শক্তির প্রকাশ না ঘটলেও তাকে একই সঙ্গে বিশ্বাস্য ও উপভোগ্য করে তোলায় রাজকৃষ্ণের কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। এই ধরনের রচনা সম্বন্ধে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি—

The merit lies in the descriptive power displayed in it. Indeed, the realistic tone and appearance of Ghorar Dim is something like a novelty in Bengali poetry which generally deals either with morbid sentimentalism or with material world very different from that which we see around us. Such appreciation of the every day world is seldom shown by Bengali authors, and a habit of observation of which Bengalis as a nation do not possess but the cultivation of which is absolutely necessary for the purpose of the new civilisation which they must now accept. Ghorar Dim, though a small thing, possesses great value. It is written in a spirit which we hope and trust will become general among Bengali authors.[৩০]

খোসগল্পগুলি প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থকারের নাম ছিল না, কিন্তু সাহিত্য-সমালোচকেরা অজ্ঞাতনামা লেখকের প্রশংসায় কোনো দ্বিধা করেননি—"বলি এ খোস্‌গল্পকার কে? সরল কথায় সরল পদ্যে সরল উপদেশ-লেখক কোন্ মহাত্মা? নাম প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু তিনি যিনিই হউন, তিনি একজন সুকবি, সুচিত্রকর ও সদুপদেষ্টা। কবিতা ইহার কোন্‌খানে নাই? ইহার ছত্রে ছত্রে কবিত্ব; জয় ডাক্তার ও নফ্‌রা রাখাল চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; উপদেশ ইহাতে যাহা আছে তাহাতে অনেক কাঙালের ঘোড়া রোগ সারিতে পারিবে, অনেক নারকীর চরিত্র-দোষ সংশোধিত হইতে পারিবে—।"[৩১]

উপন্যাস রচনাকালে রাজকৃষ্ণ বঙ্কিমযুগের সামাজিক উপন্যাসের আদর্শ গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ গল্পকবিতার মতো সেগুলির মধ্যেও সমাজচিত্র অঙ্কন এবং নৈতিক আদর্শ-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা যায়। আমাদের মনে পড়বে, রাজকৃষ্ণ এক সময়ে 'সমাজ দর্পণ' নামে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তবে 'হিরণ্ময়ী' এবং 'কিরণময়ী'র কাহিনী মধ্যযুগের পটভূমিকায় স্থাপিত, ফলে ঘটনা-সংস্থান কিছুটা রোমান্সধর্মী। রাজকৃষ্ণের 'জ্যোতির্ময়ী' উপন্যাস সমালোচনাকালে সে কালের সাময়িকপত্রে যে কথা লেখা হয়, তা তাঁর প্রায় সব গদ্য-আখ্যান সম্বন্ধেই কম বেশি পরিমাণে প্রযোজ্য —"গ্রন্থের ভাষাটি বেশ প্রাঞ্জল এবং গল্পটিও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। চরিত্র-অঙ্কনের চেষ্টা অপেক্ষা গল্পচ্ছলে একটা ঘটনা বিবৃত করা বোধ হয় রায়-মহাশয়ের উদ্দেশ্য এবং সেইজন্যই বুঝি কাব্যাংশে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির উৎকর্ষলাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং উপন্যাসের অঙ্গহানি হইয়াছে। তবে গল্পাংশে গ্রন্থকারের বিলক্ষণ ক্ষমতা উপলব্ধি হয়।"[৩২]

সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে সমান পারদর্শিতা প্রদর্শন প্রায় কোনো লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। রাজকৃষ্ণ একই সঙ্গে গদ্য ও পদ্যের বিভিন্ন ধারায় নিত্য নতুন সৃষ্টি কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগত কারণে মন্তব্য করেছেন, "তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল, গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, গল্পে, অনুবাদে, উপন্যাসে তাঁহার সমান হাত ছিল; এবং তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা ও সাহস ছিল অপরিসীম। নিদারুণ দুর্দশার মধ্যেও তিনি যে মূল বাল্মীকির রামায়ণ ও বেদব্যাসের মহাভারত কবিতায় অনুবাদ করিবার সাহস ও ধৈর্য্য দেখাইতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম বাংলা-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইবার কথা। তবে অপরিচয় ও অজ্ঞতার দরুণই আজিকার বাঙালী পাঠক তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছে।"[৩১] রামায়ণ, মহাভারত ও কল্কিপুরাণের যেমন পদ্যানুবাদ করেছেন রাজকৃষ্ণ, তেমনি গদ্যে লিখেছেন সে-কালের পক্ষে বিস্ময়কর 'রুসিয়ার ইতিহাস'। বাংলা ভাষায় প্রথম 'ভারতকোষ' তথা এনসাইক্লোপিডিয়া রচনার পরিকল্পনা রাজকৃষ্ণই গ্রহণ করেন, এবং শরচ্চন্দ্র দেবের সঙ্গে যৌথভাবে এই বিরাট অভিধান ও কোষগ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে বিষয়বুদ্ধির অভাবে অপরিসীম দারিদ্র্য ভোগ করেছেন, নানা ব্যাধি পীড়িত দেহ তাঁর কর্মোদ্যোগে নানা বাধাসৃষ্টি করেছে। তারপর মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু শুধু সমসাময়িক কালের সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি নয়, পরবর্তীকালেও অনেকদিন পর্যন্ত বাঙালি সাহিত্যব্রতীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছেন, যে জন্য সকৃতজ্ঞ বাঙালি কবি তাঁর সম্বন্ধে লেখেন—

রাজকৃষ্ণ রায়

প্রমাণ করিতে নিজ দুর্ভাগ্য জীবনে
ভারতী ও কমলার অলঙ্ঘ্য বিবাদ
—কি কঠোর সত্য তাহা নহে তা' প্রবাদ-
এসেছিলে তুমি কি গো ভারত ভুবনে?
বাণীর অকুণ্ঠ কৃপা, অজস্র বর্ষণে
নারিল ঘুচাতে তব কুগ্রহ প্রমাদ;
ব্যর্থ করি ভারতীর শুভ আশীর্বাদ,
বিকালে অমূল্য রত্ন, লক্ষ্মীর ছলনে!

রসাল, সরল, দ্রুত রচনা তোমার
বর্ষি' রঙ্গমঞ্চে নিত্য নব উন্মাদনা,
অর্পিয়াছে বাণীপদে শত উপহার—
রামায়ণ-'ভারতের নবীন সাধনা,

অবসরে যত্নে গাঁথা কবিতার হার—
ভারতী-কৃপার স্ফুট অভ্রান্ত দ্যোতনা।[৩৪]

রাজকৃষ্ণ সাহিত্যের ইতিহাসে বা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে 'অমরত্ব' লাভ করবেন কি না সে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী নিরর্থক, তবে সাহিত্যের ছাত্র ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনেই তাঁকে স্মরণ করবেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে যদি এ কালের পাঠকের কোনোভাবে যোগাযোগ ঘটে তাহলে নৈরাশ্যের কারণ ঘটবে না, কারণ সেখানে আছে 'ভারতী-কৃপার স্ফুট অভ্রান্ত দ্যোতনা।'

১. অনুসন্ধান, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১, পৃ. ১৫৬।
২. শশিশেখর বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, কথাসাহিত্য, শ্রাবণ ১৩৬১, পৃ. ৭৮২-৮৩।
৩. 'তাঁর [ গিরিশচন্দ্রের ] নাট্যরচনার প্রাচুর্যে তিনি রাজকৃষ্ণ রায়কেও ছাড়িয়ে যান।' দেবীপদ ভট্টাচার্য, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ : জীবন-কথা', গিরিশ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃ. ২৬।
৪. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭৭, পৃ. ২৮৬।
৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৩৬০, পৃ. ৫০৪।
৬. কল্পনা, আষাঢ়-ভাদ্র ১২৮৯, পৃ. ২৭৮-৭৯।
৭. বঙ্গবাসী, ১৭ চৈত্র ১২৯০।
৮. যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়, প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃ. ৭৫।
৯. ভূমিকা, গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, চৈত্র ১২৯০।
১০. যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়, প্রদীপ, পৃ. ৭৩।
১১. সংক্ষিপ্ত সমালোচন, বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৯, পৃ. ৫৭৬।
১২. অনুসন্ধান, ১৪ ডিসেম্বর ১৮৮৭।
১৩. দ্র. শিশির বসু, একশ বছরের বাংলা থিয়েটার, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৩, পৃ. ৪৩৭-৩৮।
১৪. নববিভাকর সাধারণী, ১২ ডিসেম্বর ১৮৮৭।
১৫. *The Statesman*, December 20, 1887.
১৬. *The Statesman*, December 28, 1887.
১৭. বাঙ্গালা এক্সচেঞ্জ গেজেট, ১৪ শ্রাবণ ১২০৭, পৃ. ১-২।

১৮. বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮৯, পৃ. ৫৭৬।
১৯. ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৬, পৃ. ১৯১।
২০. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭৭, পৃ. ৪১৬-১৭ ; ৪২০।
২১. ভূমিকা, হরধনুর্ভঙ্গ, রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী, অষ্টম ভাগ, বসুমতী, পৃ. ৯৫-৯৬।
২২. তদেব, পৃ. ৯৬।
২৩. দেবীপদ ভট্টাচার্য, 'গৈরিশ ছন্দ', গিরিশ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭১, পৃ. ১৭।
২৪. নীলরতন সেন, আধুনিক বাংলা ছন্দ, প্রথম পর্ব, ১৯৮০, পৃ. ১৮৪।
২৫. বিজ্ঞাপন রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী, ষষ্ঠ ভাগ, বসুমতী, পৃ. ১৩৬।
২৬. আর্য্যদর্শন, শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ১৭৬।
২৭. নীলরতন সেন, আধুনিক বাংলা ছন্দ, প্রথম পর্ব, ১৯৮০, পৃ. ১৮২।
২৮. গিরিসন্দর্শন, গ্রন্থাবলী, প্রথমভাগ, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ১৩০৫, পৃ. ১৭৯।
২৯. নিভৃত নিবাস, গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ১৩০৫, পৃ. ২৫১।
৩০. *Calcutta Review*, July, 1881.
৩১. কল্পনা, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১২৮৮।
৩২. কর্ণধার, দ্বিতীয় বৎসর, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৯৫-৯৬, পৃ. ২২১।
৩৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় ( সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৫০ ), ১৩৫৫, পৃ. ৫২।
৩৪. নবকৃষ্ণ ঘোষ, তর্পণ, ১৩২২, পৃ. ৬৪।

## জীবনকথা

### জন্ম ও বংশপরিচয়

বর্ধমান জেলার একটি গ্রামের নাম মাহাতা-রামচন্দ্রপুর। সেই গ্রামের এক মধ্যবিত্ত তিলি-পরিবারে রাজকৃষ্ণ রায় জন্মগ্রহণ করেন। সে দিনটি ছিল ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে অকটোবর ( ১২৫৬ সালের ৬ই কার্ত্তিক ), রবিবার, সময় বেলা আড়াইটে। পিতা রামদাস রায়।

রাজকৃষ্ণ রায়ের জন্ম সাল-তারিখ নিয়ে মতান্তর আছে। কেউ তাঁর জন্মসাল ১২৫৮ বলেছেন,[১] কেউ ১২৬২ বলেছেন,[২] আবার কেউ তা নির্দিষ্ট করেছেন ১২৫৬ সাল।[৩] রাজকৃষ্ণ তাঁর জন্মতারিখ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বহু জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের নির্ণীত কোষ্ঠীর মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। রাজকৃষ্ণের হিতৈষী বন্ধু এবং দীর্ঘদিনের সহকর্মী শরচ্চন্দ্র দেব রাজকৃষ্ণের জীবনী লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন—জ্যোতিষাচার্য্য শ্রীযুক্ত মহেশ্বর জ্যোতির্ভূষণের মতে রাজকৃষ্ণের জন্ম ১২৫৬ সালের ৬ই কার্ত্তিক হওয়া উচিত।[৪] রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে নানা পত্রিকাতে তাঁর জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলিতে পরস্পরবিরোধী সাল তারিখ পাওয়া যায়। বর্তমানে বিভিন্ন রচনায় প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে ২১শে অকটোবর ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দই তাঁর জন্মতারিখ বলে আমরা গ্রহণ করছি।

রাজকৃষ্ণ তাঁর নিজের জন্ম সাল-তারিখ সম্বন্ধে নিজেই সঠিকভাবে অবগত ছিলেন না। কারণ তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এগারো মাসের মধ্যেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। যখন তাঁর দু'বছরেরও কম বয়স তখন তাঁকে কলিকাতায় পিতার কাছে নিয়ে আসা হয়। পিতা প্রথমে কলিকাতায় জোড়াসাঁকো অঞ্চলে কোনো এক ধনীগৃহে সামান্য কাজ করতেন, পরে কলিকাতাতেই ব্যবসা আরম্ভ করেন। পিতার গৃহে তাঁদের স্বজাতীয়া এক রমণী বাস করতেন। শৈশবে মাতৃহারা রাজকৃষ্ণকে এই রমণীই মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেন। রাজকৃষ্ণ তাঁকে মাসি বলে ডাকতেন। পরবর্তীকালে তিনি জানতে পারেন যে এই অতি দরিদ্র, সহায়সম্বলহীন বিধবা নারী প্রকৃতপক্ষে তাঁর পিতার সেবিকামাত্র। সে যাই হোক, মাসির পুত্রাধিক যত্নেই তিনি বড় হন। মাসির জীবনের অন্তিমকাল অবধি রাজকৃষ্ণ তাঁকে জননীর মতো শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। বাল্যকালেই রাজকৃষ্ণের পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁর বয়স বারো বছর—একথা জানা যায় জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়-কৃত কোষ্ঠী বিচার থেকে[৫]। মাতাপিতাকে হারিয়ে আত্মীয়কুটুম্বহীন, জন্মদুঃখী রাজকৃষ্ণের জীবনের সূচনা এইভাবেই হয়। রাজকৃষ্ণ একদা বলেছেন,

"একে তো পিতামাতার দারুণ দরিদ্র-দশা, তাহাতে অতি শৈশবেই আমি পিতৃ-মাতৃহীন হই। সংসারে আত্মীয়-স্বজনও কেহ ছিল না; বিষয়-সম্পত্তির তো কথাই নাই! সুতরাং বাল্যবয়সের সে দুঃখের কথা আর কি বলিব? তখন আমার দুঃখের আর অবধি ছিল না।"[৬]

## শিক্ষা

চরম দারিদ্র্যের মধ্যে শৈশব অতিবাহিত হওয়ার ফলে রাজকৃষ্ণ স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ বেশি দিন পাননি। তাঁর পিতার জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও কিছুদিন তিনি নিমতলায় ডাফ সাহেবের ফ্রী চার্চ ইনস্টিটিউশনে পড়েছিলেন। মৃত্যুকালে পিতা সামান্য কিছু অর্থ রেখে যান। সেই অর্থ এবং মাসির কায়িক পরিশ্রমজাত উপার্জনের উপর নির্ভর করে রাজকৃষ্ণের শিক্ষা এবং প্রতিপালন ব্যবস্থা হয়েছিল। মাসি তাঁর সাধ্যমতো শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু রাজকৃষ্ণ বেশ কয়েকবার কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়ায় অবশেষে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

## সাহিত্যানুরাগ ও কাব্যসৃষ্টি

শৈশবে মাতৃহারা রাজকৃষ্ণের জীবনে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁর মাসি। অনুমান করা যায়, অন্যান্য শিশুদের মতো তিনিও গল্প-কাহিনী শুনতে ভালোবাসতেন। আর মাসিই তাঁকে শোনাতেন সে-সব কাহিনী। বাংলা দেশের আর পাঁচজন মা-মাসির মতো তিনিও শিশু রাজকৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী। সেই কারণেই রাজকৃষ্ণ আমাদের এই জাতীয়-মহাকাব্য দু'টির সঙ্গে আবাল্য পরিচিত ছিলেন। এই কাহিনীগুলির মধ্যে যে ভক্তিরসের সন্ধান পাওয়া যায়, তার স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই ভক্তিরসের প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায় তাঁর রচিত বিভিন্ন নাটকগুলিতে।

অত্যন্ত অল্প বয়স থেকে রাজকৃষ্ণের মধ্যে যে-গুণটির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তা হলো তাঁর কবিত্বশক্তি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় বালক রাজকৃষ্ণের মুখে মুখে পদ্য বানাবার ক্ষমতা বর্ণনা করেছেন।[৭] তখন যে-সমস্ত সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হতো—'সংবাদ প্রভাকর' তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। সম্পাদনা করতেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। অল্প বয়সে ঈশ্বর গুপ্তকে রাজকৃষ্ণ দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেনি। তবে গুপ্তকবির জীবিতকালে তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পাঠ করেছেন। তাঁর প্রথম কবিতা রচনার ইচ্ছা জাগে প্রভাকর পত্রিকার পদ্য পাঠ করে। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাজকৃষ্ণ 'সংবাদ প্রভাকরে' অনেক পদ্য লিখেছেন—কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত তা দেখে যেতে পারেননি। এ-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে কিছু কবিতা তাঁর

গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে। 'সংবাদ প্রভাকর' ছাড়াও 'এডুকেশন গেজেট'-এ রাজকৃষ্ণের কৈশোরে রচিত বহু কবিতা প্রকাশিত হয়। অল্প পরে 'আর্য্যদর্শন' ( জ্যৈষ্ঠ ১২৮১, আশ্বিন ১২৮৩ ), 'জ্ঞানাঙ্কুর' ( ভাদ্র ১২৮২ ), 'তমোলুক পত্রিকা' ( জ্যৈষ্ঠ-কার্ত্তিক ১২৮২, গদ্য পদ্য ), 'বঙ্গমহিলা' ( মাঘ ১২৮২ ) প্রভৃতি পত্রিকাতে রাজকৃষ্ণের রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর প্রাথমিক কাব্যরচনার মধ্যে 'বঙ্গভূষণ', 'ভারতে যুবরাজ' ( ভারতে তৎকালীন প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে রচিত ), 'স্তবমালা' প্রভৃতি স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু ১২৮৩ সালে 'অবসর-সরোজিনী' কাব্যের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয়ে সকলে চমকিত হয়। এ-গ্রন্থ রচনা করে তিনি বিশেষভাবে জনসমাদর লাভ করেন। এরপর বছর দু'একের মধ্যে তিনি আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা-গ্রন্থ রচনা করেন—'নিশীথচিন্তা', 'নিভৃতনিবাস', 'ভারতগান', 'অবসর-সরোজিনী'র দ্বিতীয় ভাগ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এর আগে তিনি ছোটদের পাঠোপযোগী কবিতাপুস্তকও লিখেছিলেন। এ-সমস্ত গ্রন্থই তাঁর পাঠক-সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল—রাজকৃষ্ণের সাহিত্যিক পরিচিতি ঘটিয়েছিল সে-সমাজের সঙ্গে।

জীবিকার্জন

কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু কোনো ধনী-পরিবারে নয়। আর্থিক সচ্ছলতা, ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য,—কোনোদিনই তাঁর ছিল না। সারাজীবন অভাবের তাড়না তিনি অনুভব করেছেন, দারিদ্র্য তাঁকে গ্রাস করেছে। যদি কখনও বা সুখের আলো তাঁর জীবনকে ক'টা দিন ছুঁয়ে গেছে, পরের দিনগুলিই আবার ঢেকে গেছে দুঃখের অন্ধকারে।

রাজকৃষ্ণ জীবিকার জন্য সারাজীবন নানা ধরনের কাজ করেছেন। প্রথম উপার্জনের সন্ধানে যান নিউ বেঙ্গল প্রেসে ১৮৭৩ সালে। কৃষ্ণগোপাল ভক্তের এই প্রেসটি ছিল সিমুলিয়া, মানিকতলা স্ট্রীটে। এখানে কর্মী হিসাবে যোগদানের পর তিনি 'বঙ্গভূষণ' ও 'স্তবমালা'—কবিতার এই বই দু'টি প্রকাশ করেন। এই প্রেসে থাকার সময়ে তিনি পরিচিত হন পাথুরিয়াঘাটার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে। তাঁর নির্দেশে এই সময় তিনি সংগীত-কবিতা ইত্যাদি রচনায় নিযুক্ত হন।

নিউ বেঙ্গল প্রেসে কাজ করার আগে তিনি জীবিকার্জনের জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু স্বনামে সেগুলি প্রকাশিত হয়নি। অর্থের প্রয়োজনে তিনি 'পতিব্রতা' নামক গীতিনাট্যটি রচনা করে বটতলায় বিক্রয় করেন। একদা কবি মনে করেছিলেন স্কুলপাঠ্য কবিতা গ্রন্থ প্রচার করে লাভবান হবেন, তাই 'কবিতা কৌমুদী' ( ১ম ও ২য় ভাগ ) প্রকাশ করেন, কিন্তু সেখানেও সফলতা এল না। এ সময়ই তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করে এ যাবৎ রচনার সংকলন হিসাবে 'অবসর-

সরোজিনী' নামে একটি কবিতার বই প্রকাশ করতে সচেষ্ট হন। তাঁকে এই ব্যয়সাধ্য কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী এবং তাঁর দেওয়ান রায় রাজীবলোচন বাহাদুর। স্বজাতীয় এই কিশোর কবি স্বর্ণময়ীর অত্যন্ত স্নেহপাত্র ছিলেন, রাজীবলোচনেরও তাঁর প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ-মমতা ছিল। তাঁদের আনুকূল্যেই ৩৭ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীটস্থ অ্যালবার্ট প্রেসে 'অবসর-সরোজিনী'র মুদ্রণ শুরু হয়। অ্যালবার্ট প্রেস তখন সবেমাত্র নতুন স্থাপিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করেন কলিকাতা পর্সিবাগান নিবাসী গিরিশচন্দ্র ঘোষের দু'জন আত্মীয়। এই গ্রন্থ মুদ্রণকালে তিনি স্বত্বাধিকারী গিরিশচন্দ্রের সুনজরে পড়েন।

মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করলে শুধু হয় না, এ-কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন। কিন্তু প্রেসের কাজে অনভিজ্ঞ হওয়ার জন্য গিরিশবাবুর আত্মীয়রা তা চালাতে পারছিলেন না। গিরিশবাবু প্রেস বন্ধ করে দেওয়া মনস্থ করেছিলেন। কারণ কর্মচারীদের বেতন পর্যন্ত তাঁকে ঘর থেকে দিতে হচ্ছিল। এ-সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে রাজকৃষ্ণ দ্বিধা করলেন না। তিনি গিরিশবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রেসের তত্ত্বাবধান ভার নিজের হাতে গ্রহণ করতে চাইলেন। গিরিশবাবু তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে মুদ্রাযন্ত্রের দায়িত্বভাবে তাঁকেই দিলেন। প্রেস কিন্তু আশুতোষ ঘোষ কোম্পানির নামেই চলতে লাগলো। হিসাবপত্র রাখার জন্য গিরিশবাবু একজন কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। প্রেসের জন্য কাজ সংগ্রহ ও দেখাশোনা রাজকৃষ্ণই করতে লাগলেন। রাজকৃষ্ণের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ কতকগুলি শর্ত করেছিলেন। মাসিক বেতন বারো টাকা, তবে তিনি নিজ ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থটুকুই শুধু গ্রহণ করবেন, যার লিখিতভাবে হিসাব থাকবে এবং পরে তাঁর লভ্যাংশ থেকে শোধ হবে। সেই সঙ্গে প্রেস থেকে তাঁর গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হবে, যার লাভক্ষতির অংশীদার হবে প্রেস। এ-ছাড়া প্রেসের মোট লভ্যাংশের অর্ধেকের অধিকারী হবেন রাজকৃষ্ণ রায়। রাজকৃষ্ণ এই সব শর্ত সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন। কারণ তাঁর মতো লেখক-মানুষের কাছে গ্রন্থ-প্রকাশের চেয়ে বড় সুযোগ আর কিছু ছিল না। গ্রন্থ-মুদ্রণের জন্য তাঁর আর চিন্তা রইল না। রাজকৃষ্ণ পরবর্তীকালে 'কল্কিপুরাণ'-এর উপহারপত্রে গিরিশচন্দ্রের এই সহায়তা, সহৃদয়তার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন,—"আপনি সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে আমার পরম সহায়। বিশেষতঃ আপনিই আমার সাহিত্য-জগৎ-প্রবেশের প্রধান পথ-প্রদর্শক। বহুকালের কথা, কি শুভক্ষণেই আমি আপনার 'আলবার্ট যন্ত্রে' আমার 'অবসর-সরোজিনী কাব্য' ছাপিতে দিয়াছিলাম। আপনি সেই পুস্তকপাঠে পুলকিত হইয়া, আমার হস্তে আপনার আলবার্ট প্রেসের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, উত্তরোত্তর নানাবিধ গ্রন্থরচনায় উৎসাহ দিয়াছিলেন।"[৮]

এই অ্যালবার্ট প্রেস থেকেই তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'অবসর-সরোজিনী' প্রকাশিত

হলো—যথেষ্ট সমাদরও লাভ করলো। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন কবিতার বই বাজারে বিশেষ বিক্রয় হচ্ছে না। বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে কবিতা অপেক্ষা নাটক-উপন্যাস-গল্পই বেশি আদরণীয়। সেইজন্য রাজকৃষ্ণ কবিতা ছেড়ে নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেন। অবশ্য মঞ্চ ও অভিনয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল, হয়তো নিজের মধ্যে সুপ্ত নাট্যপ্রতিভাও তিনি অনুভব করেছিলেন। প্রথম নাটক লিখলেন—'অনলে বিজলী' ( ১৮৭৮ )। শুধু রচনা করেই সন্তুষ্ট হলেন না, বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষদের সাহায্যে তাঁর প্রথম নাটকের অভিনয়ও করালেন। নাটক ও নাট্যমঞ্চের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সূচিত হলো।

রাজকৃষ্ণ এতদিন পর্যন্ত যে ধরনের বই লিখেছিলেন সেগুলি পাঠকসমাজের প্রশংসা লাভ করেছিল বটে, কিন্তু ওই ধরনের বইয়ের বিক্রয় ছিল অল্প। সাধারণ পাঠকসমাজের কাছে তাঁর কিছু 'রহস্যগ্রন্থ' বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল। যেমন 'ঘোড়ার ডিম', 'কুপোকাৎ' ইত্যাদি। অতএব তিনি এ-ধরনের লঘু রচনাকর্মে আত্মনিয়োগ করলেন। 'ঘোড়ার ডিম'-এর প্রকাশক ছিলেন শরচ্চন্দ্র দেব। তিনি জানান, এই বইটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে একই মাসে দু'বার মুদ্রিত হয়ে দু'হাজার কপি বিক্রীত হয়েছিল।[৯] পরবর্তীকালে বইটির বহুবার পুনর্মুদ্রণ হয়। গদ্যের জগতে বিচরণ করলেও কাব্যজগৎকে কিন্তু কবি বিস্মৃত হননি—এ সময়েই প্রকাশিত হয়েছে 'ভারতগান' ( ১৮৭৯ )।

অর্থাগমের জন্য নানা ধরনের গ্রন্থ রচনা করলেও রাজকৃষ্ণ বঙ্গরঙ্গভূমির জন্য নাটক রচনা বন্ধ করেননি। 'নাট্যসম্ভব', 'দ্বাদশ-গোপাল', 'লৌহ-কারাগার', 'বিক্রমাদিত্য', 'হরধনুর্ভঙ্গ', 'রামের বনবাস',—একাদিক্রমে বহু নাটক লিখে গিয়েছেন। বঙ্গরঙ্গভূমির কর্তৃপক্ষগণ তাঁর কোনো কোনো নাটক মঞ্চস্থ করে যথেষ্ট উপার্জন করেছিলেন—কিন্তু রাজকৃষ্ণ বরাবরই সে লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

রাজকৃষ্ণ অর্থোপার্জনের আশায় বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ রচনা করেছেন। ভারতে রুশ আসছে—এই গুজব রটলে তিনি 'রুসিয়ার ইতিহাস' লেখেন।

'বীণা' নামে নিজস্ব একটি মাসিক পত্রিকার দু'টি খণ্ড রাজকৃষ্ণ এই অ্যালবার্ট প্রেস থেকেই প্রকাশ করেন।

রাজকৃষ্ণের বহু গ্রন্থই অ্যালবার্ট প্রেস থেকে প্রকাশিত হলো। রাজকৃষ্ণের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে লাভজনক হয়েছিল—তাঁর নিজের ব্যয়নির্বাহও হচ্ছিল, কিন্তু প্রেসের স্বত্বাধিকারীর বিশেষ লাভ হচ্ছিল না। তিনি মনে করলেন, এই প্রেসের জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করেছেন—যা অন্য কোনো ব্যবসায় নিয়োগ করতে পারলে প্রচুর লাভবান হতেন। অতএব শেষপর্যন্ত তিনি প্রেস বিক্রয় করে দিলেন। অ্যালবার্ট প্রেসের ম্যানেজার রাজকৃষ্ণ রায় নির্দিষ্ট আয় থেকে বঞ্চিত হয়ে কর্মহীন হয়ে পড়লেন।

অনেক পুস্তক রচনা ও প্রকাশনা হলেও রাজকৃষ্ণের জীবনে দারিদ্র্য ঘুচলো না। রাজকৃষ্ণের শুভার্থী, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এজন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে তিনি একটি পথের সন্ধান দিলেন। বস্তুত তিনিই পথপ্রদর্শকের কাজটি করলেন। রাজকৃষ্ণের গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলো। প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ সামান্য দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল—দ্বিতীয় সংস্করণও ২০০০ কপি নিঃশেষিত হলো। অবশেষে সংবাদপত্রে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছিল যে, "আর কেহ মূল্য পাঠাইবেন না, গ্রন্থাবলী আর নাই।"[১০] রাজকৃষ্ণের জীবিতকালে গ্রন্থাবলীর পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে গ্রন্থাবলীর সাতটি খণ্ড প্রকাশিত হয়, ছোটবড় ৯৪টি গ্রন্থ সমন্বিত হয়ে, কিন্তু কোনোটিই প্রথম খণ্ডের মতো জনসমাদর পায়নি।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের ফলে তিন-চারমাস অর্থসুখ আসে রাজকৃষ্ণের জীবনে। অনেকের মতে, জীবিকার্জনের জন্য সাহিত্যসৃষ্টিকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সম্ভবত তিনিই পথপ্রদর্শক।

অ্যালবার্ট প্রেস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজকৃষ্ণের উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেল। স্বাধীনচেতা রাজকৃষ্ণের চাকরি করা আর পোষায় না। অ্যালবার্ট প্রেসের বেতন থেকে অধিকাংশ অর্থ সঞ্চয় করার ফলে এবং সামান্য কিছু ঋণ গ্রহণের সাহায্যে তিনি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে ১২৮৮ সালে ৩৭ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে একটি প্রেস স্থাপন করেন— 'বীণা যন্ত্র'। 'বীণা যন্ত্র' সম্বন্ধে শরচ্চন্দ্র দেব জানিয়েছেন, "আমিই তাহার অবৈতনিক প্রিণ্টার নিযুক্ত হই। গুরুদাস বাবুর যত্নে অনেক কাজ জুটিতে লাগিল, বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ নিচয়, স্বর্গীয় দুর্গাদাস করের মেটিরিয়া মেডিকা এবং অন্যান্য চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ ছাপা হইতে লাগিল।"[১১] দীর্ঘ দশ বৎসরের বেশি তিনি এই মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনা করেছিলেন। এখান থেকে তাঁর নানা ধরনের রচনার প্রকাশ হয়। উল্লেখযোগ্য ভাবে অর্থাগম না হলেও এই যন্ত্রালয় থেকে রাজকৃষ্ণের রচনাসমূহের যথেষ্ট প্রচার হয়।

নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু শুধু প্রেস চালানোর কাজ তাঁর ভালো লাগার কথা নয়। সাহিত্যচর্চা, বিশেষভাবে নাট্যচর্চা তাঁর প্রধান আকর্ষণের বিষয়। আর নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য প্রয়োজন নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ। কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনে সাফল্য আনেনি। বরং রঙ্গমঞ্চই আনলো তাঁর জীবনে বিপর্যয়।

গ্রন্থ-মুদ্রণ এবং গ্রন্থ-প্রকাশ, সেইসঙ্গে বই বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে রাজকৃষ্ণের জীবন একরকমভাবে কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু অভিনয়-কুশলী এই মানুষটি অভিনয়-প্রশংসায় উৎসাহিত হয়ে হঠাৎ নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। প্রতিষ্ঠিত হলো 'বীণা রঙ্গভূমি' (১৮৮৭)। স্থির করলেন বালকদের দিয়ে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়

করাবেন। রাজকৃষ্ণের এই নবপ্রচেষ্টা নানাজন দ্বারা প্রশংসিত হলেও অর্থাগম সেরকম কিছু হলো না। কোনো কোনো ধনী পরিবার সহানুভূতি সহকারে কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন। যেমন—

"বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের বীণা রঙ্গভূমিতে রঙ্গপুর তাজহাটের জমিদার রাজা গোবিন্দলাল রায় ২৫০্ এবং কুচবিহারের মহারাণী ২০০্ টাকা দান করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুকে উপকৃত করিয়াছেন।"[১১]

অবশেষে এই 'বীণা রঙ্গভূমি' ঋণগ্রস্ত-রাজকৃষ্ণ ভাড়া দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অর্থাগমের জন্যই নাটকের অভিনয়ে 'স্ত্রীলোকদের' গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু অভিনেত্রীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েও অর্থানুকূল্য তাঁর ভাগ্যে আর জুটলো না। শেষপর্যন্ত রঙ্গালয় ঋণের দায়ে হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

রাজকৃষ্ণের সমগ্র জীবন কেটেছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। 'বীণা রঙ্গভূমি' স্থাপনের ফলে ঋণের দায়ে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। তখন স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ অমৃতলাল বসু তাঁকে আশ্রয় দেন। স্টার কর্তৃপক্ষ মাসিক একশো টাকা বেতনে তাঁকে নিজেদের গ্রন্থকার নিযুক্ত করেন। এই থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য 'লয়লামজনু', 'নরমেধ যজ্ঞ', 'বনবীর', 'ঋষ্যশৃঙ্গ', 'বেনজীর-বদ্রেমুনির' প্রভৃতি নাটক তিনি লিখে দেন। রুগ্ন শরীরে স্টারের বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবেই তাঁর কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটে।

## বিবাহ

রাজকৃষ্ণ ১২৮৭ সালে 'বীণা যন্ত্র' স্থাপন করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি শালকিয়া গ্রামের এক স্বজাতীয় মহিলাকে বিবাহ করেন। এ সময়ে তিনি চোরবাগানের এক বাসাবাড়ির নিচের তলায় এক ক্ষুদ্র কুঠরিতে থাকতেন। ঠিকানা ৭৮।৪ মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট্। এই 'বাসা' থেকে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে রাজকৃষ্ণ এক পত্র লেখেন। পত্রশেষে কবি লেখেন, "আজিও আমি বিবাহ করি নাই, কিন্তু শীঘ্রই করিব ইচ্ছা করিয়াছি।"[১২] চিঠিটি ১ জানুয়ারি ১৮৮১ সালে লিখিত। অতএব অনুমান করা যায় কবি এ-বছরের প্রথমদিকেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

রাজকৃষ্ণের একটি পুত্র এবং একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের নাম রজনীরঞ্জন।

## সাহিত্যচর্চা

বঙ্কিমচন্দ্র সংগতকারণে উনিশ শতকের শেষভাগে নব্যলেখকদের উদ্দেশে লেখেন—"টাকার জন্ত লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্তই লেখে, এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে

দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে।"[১৩] বলা বাহুল্য সে সময় টাকার জন্য কেউ লিখতেন না তা নয়, কিন্তু সাধারণভাবে লেখকদের জীবিকার্জনের অন্য উপায় থাকতো, শুধুমাত্র সাহিত্য রচনাকে জীবিকা বলে কেউ গ্রহণ করতেন না। কিন্তু রাজকৃষ্ণ যখন দেখলেন বীণা যন্ত্র বা বীণা থিয়েটার জীবিকার্জনের সহায় নয়, তখন তিনি টাকার জন্যই লিখতে শুরু করলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেজন্য মন্তব্য করেন,—"বঙ্গ-বীণাপাণির ঐকান্তিক সেবা করিয়া যে সকল সাহিত্য-সাধক বাংলাদেশে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে সকল্প করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কবি এবং সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহাদের অগ্রণী।"[১৪]

গদ্যপদ্য রচনায় অনায়াস-পটুতার জন্য তিনি অত্যন্ত বিশিষ্ট ছিলেন। সে কালে ঐরকম বিচিত্র বিষয়ে অবিশ্রান্ত লেখক বাংলা সাহিত্যে আর কেউ ছিলেন না। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তার মধ্যেই এত বেশি রচনা এবং এত বিচিত্র ধরনের রচনা আর কেউ লিখেছেন বলে মনে হয় না। স্বাভাবিক ভাবে অল্প সময়ে অধিক রচনার ফলে লেখার মান সর্বদা বজায় থাকেনি—অনেক লেখাই সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠেনি। রাজকৃষ্ণের একটি অসামান্য ক্ষমতা ছিল—যে কোনো বিষয়ে দ্রুত এবং অনর্গল রচনার পারদর্শিতা। তিনি বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানির অনুরোধে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নামে একটি পৌরাণিক নাটক মাত্র পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে রচনা করে দেন। এ বিষয়ে রাজকৃষ্ণ লিখেছিলেন—"গত বৎসর (১২৯১ সাল) আশ্বিন মাসে পূজার পরেই একখানি নাটক অভিনয় করিবার জন্য বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানি প্রস্তুত হন। আমি তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে প্রহ্লাদ-চরিত্র নাটকখানি লিখিয়া দি।"[১৫] তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু শরচ্চন্দ্র দেবের কথাতেও রাজকৃষ্ণের এই দ্রুত ও অনায়াস-রচনা-শক্তির সমর্থন মেলে। তিনি জানিয়েছেন, "একবার আমি তাঁহাকে একদিন সন্ধ্যার সময় বলি যে কাল আমার সিন্ধুবিষয়ক একখানি নাটক চাই। তাহার ফলে পরদিন সাড়ে বারোটার সময় তাঁহার দশরথের মৃগয়া নামক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।"[১৬] রাজকৃষ্ণের অন্যতম জীবনীকারের স্মৃতিচারণায় পাই—"কবিবরের দ্রুত লেখনী-মুখে, স্রোতস্বতীও হারি মানে! শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—সহসা কেহ বিশ্বাস করিতেও পারিবেন না—কিন্তু আমাদের চাক্ষুষ দেখা—কবিবরের অবিশ্রান্ত লেখনী কি তরতর প্রবাহে প্রবাহিত হইত! এমন কেহ কখনও শুনিয়াছেন কি—তিনজন লিপিকার লিপিপত্র হস্তে অবিরাম গতিতে কবিতা লিখিয়া যাইতেছেন, আর কবিবর মূল রামায়ণ কি মহাভারত সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া বর্ষার বারিধারার ন্যায় প্রলয়-পবন প্রবাহের প্রায়, অনর্গল কবিতার স্রোতে সকলকে নিমগ্ন করিতেছেন। জানি না, শুনি নাই, কোন দেশে, কোন

সময়ে, এমন কোন কবির জন্ম হইয়াছিল কি না ?"[১৭]

কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সৃজনীশক্তির প্রথম স্ফুরণ ঘটলেও তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। কাব্যরচনা ও তা প্রকাশ করার পর পাঠকসমাজে প্রশংসিত হলেও তিনি অনুভব করেছিলেন, সাধারণ মানুষ কবিতা তত পড়ে না, গল্প-উপন্যাস-নাটক যত পছন্দ করে। তাই শুরু হলো তাঁর উপন্যাস নাটক-প্রহসন-গল্প রচনা। কিছু লঘু রহস্য গল্পের সৃষ্টি করে তিনি সাধারণ পাঠককে তৃপ্ত করেছিলেন। কিছু বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করে নানাবিষয়ে জাতির চেতনা সঞ্চারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি', 'শারদীয় জ্বালাখণ্ড' বা 'ভারতগান' কবিতামালার কবিতাগুলি তার প্রমাণ। এছাড়া তরলমতি বালকবালিকাদের প্রথম কবিতা-শিক্ষার উপযোগী করে তিনি বেশ কিছু নীতিমূলক কবিতা রচনা করেন, যা 'শিশু কবিতা' নামে প্রকাশিত। শুধু তাই নয়, অনুবাদকর্মেও তাঁর অসামান্য নিপুণতা অনস্বীকার্য। নিদারুণ আর্থিক সংকটের মধ্যে থেকেও তিনি বাল্মীকির রামায়ণ এবং বেদব্যাসের মহাভারত অনুবাদে সাহস এবং ধৈর্য দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রাজকৃষ্ণের মহাভারত অনুবাদ পাঠ করে তাঁকে একটি পত্রে লেখেন—"আমি আপনার কৃত মহাভারতের পদ্যানুবাদ দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারতের দুইখানি অনুবাদ আছে, (১) কাশীরাম দাসের পদ্যানুবাদ, (২) কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যানুবাদ। ইহার মধ্যে কাশীরাম দাসের পদ্য সংস্কৃতের অনুবাদ নহে ; উহা সংস্কৃত মহাভারত হইতে এত বিভিন্ন যে, উহাকে কাশীরাম দাসের মহাভারত বলিতে হয় ; কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত মূলানুযায়ী বটে, কিন্তু উহা সাধারণ পাঠকের উপযোগী নহে। সাধারণ লোকশিক্ষার্থই মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল, ইহা প্রাচীন কথা এবং যথার্থ কথাও বটে। অতএব লোকশিক্ষার্থ ইহার এমন একটা অনুবাদ চাই, যাহা সংস্কৃতের অনুযায়ী হইবে। অথচ সাধারণ পাঠকের উপযোগী হইবে। আপনার কৃত পদ্যানুবাদের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অনুবাদ সকলের বোধগম্য অথচ সকলের পক্ষে মনোহর হইতেছে। কিন্তু এই কার্য্য অতি গুরুতর ; আপনার ন্যায় পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শালী ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারও কার্য্য নহে। ভরসা করি, আপনি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন এবং সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। ইতি, তাং ৭ই আগষ্ট, ১৮৮৮।"[১৮] পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী রাজকৃষ্ণের রামায়ণ অনুবাদকর্মের বিবরণ দিয়েছেন যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—"আমি জানি তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া লিখিতে বসিতেন, আর বেলা ১০টা কোনদিন ১১টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত লিখিতেন, সে লেখায় তাঁহার পরিশ্রম হইত বলিয়াত বোধ হইত না—কেন না আমার স্মরণ হইতেছে, রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রেসে গিয়া আমি একদিন শুনিলাম আজ

৪।৫ দিন তাঁহার জ্বর হইয়াছে ; তিনি প্রেসে আসেন নাই। কিন্তু বাসায় গিয়া দেখিলাম—তিনি সেই জ্বর গায়েই রামায়ণের পদ্যানুবাদে ব্যস্ত। নিবারণ করিলে বলিতেন—ইহাতে আর পরিশ্রম কি ?"[১৯]

যদিও রাজকৃষ্ণ কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, অনুবাদ গ্রন্থ, গল্প, অভিধান, প্রবন্ধ—সাহিত্যের নানা শাখায় অবাধ বিচরণ করেছেন, তবু নাটকই তাঁর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ভক্তিরসে সিক্ত করে যেমন নাটক রচনা করেছেন, ঐতিহাসিক কাহিনীও তেমনি তাঁর নাটকের বিষয়ীভূত হয়েছে। গীতিনাট্য এবং ব্যঙ্গাত্মক নাটক রচনাতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজের বিভিন্ন সংকট নিয়ে তিনি ব্যঙ্গনাটক লিখেছেন। সমাজের নানা সমস্যা ও অসংগতি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। পণ প্রথা বর্তমান কালের মতো সেদিনও সমাজে এক দুষ্ট ব্যাধির আকারেই ছিল। এই 'পণ' যে সমাজে দুষ্ট ক্ষত স্বরূপ এবং এর বিষময় ফলে কত সংসার, কত নির্মল-নিষ্পাপ জীবন যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তাই নিয়ে রাজকৃষ্ণ লেখেন—'লোভেন্দ্র গবেন্দ্র' (১৮৯০) নামে সামাজিক ব্যঙ্গনাটকটি। আধুনিক সমালোচক তাঁর প্রহসনগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন,—"রাজকৃষ্ণ এ ক্ষেত্রেও সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারদের তুলনায় উন্নতরুচির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটকে অযথা ব্রাহ্মবিদ্বেষ ছিল না, বা সংস্কার-পন্থীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ছিল না। তিনি দ্বাদশ গোপাল, বেলুনে বাঙালী বিবি প্রভৃতি প্রহসনে সে যুগের নানা আতিশয্য ও সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধেই ব্যঙ্গের কষাঘাত হেনেছেন।"[২০]

রাজকৃষ্ণ সাহিত্যচর্চার তাগিদেই কিছু সাময়িকপত্র প্রকাশ ও পরিচালনা করেন। সে কালের বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। রাজকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' লেখার সুযোগ পেয়েছিলেন এমন কথা জানা যায়। এ বিষয়ে রাজকৃষ্ণের 'বীণা' পত্রিকার সহকারী এবং তাঁর বীণা প্রেসের তদারককারী কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন—"রাজকৃষ্ণ রায়কে বঙ্গদর্শনে লিখবার জন্য বঙ্কিমবাবু একবার চিঠি লিখেছিলেন। বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনে লিখলে কলম পিছু দেড় টাকা করে দক্ষিণা পাওয়া যেত। রাজকৃষ্ণবাবুকে দক্ষিণার কথাও জানানো হয়েছিল। রাজকৃষ্ণবাবুর মুখেই এ কথা শুনেছিলাম।"[২১] এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে নবকৃষ্ণবাবুই আবার জানিয়েছেন,—"বঙ্গদর্শনে একবার কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবুর লেখা বাতিল করে নগেন্দ্রনাথ বসুর একটি রচনা দেওয়া হয়েছিল।"

রাজকৃষ্ণ সাহিত্যসৃষ্টিই শুধু করে যাননি, সাহিত্যচর্চার জন্য তিনি একদা নানা সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। এর উল্লেখ করে ১৮৮৭ সনে প্রকাশিত রামায়ণ-বালকাণ্ডের আখ্যাপত্রে লেখা আছে 'Member of the Society of Bengali Literature, Calcutta ; Member of the

Society of Literary Criticism, Jayadevapur, Dacca, Bengal; Member of the Society for the Acquisition of Knowledge, Calcutta; Member of the Good Will Fraternity, Calcutta; etc. etc. etc.'

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, রাজকৃষ্ণ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'বিদ্বজ্জনগণ সমাগম সভা'র যে অধিবেশন হতো, সেখানে যেতেন। তখন তিনি সবেমাত্র সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেছেন। ১২৮৭ সালের ১৬ ফাল্গুন অনুষ্ঠিত সভায় রাজকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। সেদিন তিনি সেখানে 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় দেখেছিলেন।[২২]

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে ও প্রচেষ্টায় রাজকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মকে একত্রিত করার প্রয়াস হিসাবে সে-যুগে এ-কাজ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। ১২৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে'র চৈত্র সংখ্যায় এক 'সংক্ষিপ্ত সমালোচন' প্রকাশিত হয়—

"গ্রন্থাবলী। গদ্য ও পদ্য শ্রী রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রিট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥ আনা।

"রাজকৃষ্ণ বাবু কবি বলিয়া পরিচিত। তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে অনেকেরই আগ্রহ। তাঁহার সমুদয় গ্রন্থ একত্রে মুদ্রিত হওয়ায় অনেকেই আহ্লাদিত হইবেন সন্দেহ নাই। বিশেষ অল্পমূল্যে পাঠের এত অধিক সামগ্রী কখন বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।"[২৩]

রাজকৃষ্ণের এই অনলস সাহিত্যচর্চা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

## সাময়িকপত্রাদি পরিচালন

সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্যে রাজকৃষ্ণ রায় শুধু নানা পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাই নয়, পত্রিকা-পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। তাঁর পরিচালিত প্রথম পত্রিকা 'সমাজদর্পণ'। তাঁর পূর্বে সম্পাদক ছিলেন যশোদানন্দন সরকার।[২৪] রাজকৃষ্ণ অ্যালবার্ট প্রেসের ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পরেই এ-পত্রিকার প্রকাশের ভার নেন। তখন এই পত্রিকায় রাজকৃষ্ণের কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। হঠাৎ যশোদানন্দন 'সমাজদর্পণ'-এর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এ-অবস্থায় রাজকৃষ্ণ নিজেই এগিয়ে এসে পত্রিকা সম্পাদনার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রাহকের অভাবে পত্রিকা-পরিচালন সম্ভব হয় না। শেষপর্যন্ত পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে হয়।

রাজকৃষ্ণ মনে মনে কিন্তু একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশিত হলো—নাম 'বীণা'। এটি 'নানাবিষয়িনী কবিতা প্রসবিনী' একটি মাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালের এপ্রিল (১২৮৫ সালের বৈশাখ) মাসে।

'বীণা' পত্রিকা রাজকৃষ্ণ প্রকাশ করলেন ঠিকই, কিন্তু পত্রিকাটি দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারেনি। এর জীবনকাল মাত্র চারটি বছর। নিয়মিতভাবে প্রকাশও করতে পারেননি। প্রথম দুটি খণ্ড অ্যালবার্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় ১২৮৫ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র এবং ১২৮৬ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড বীণা যন্ত্রে মুদ্রিত হয় যথাক্রমে ১২৮৮ সালের বৈশাখ থেকে—(ঠিক কয়টি সংখ্যা জানা যায়নি) এবং ১২৯৩ সালের কার্ত্তিক থেকে ১২৯৪ সালের আশ্বিন পর্যন্ত।[২৫]

প্রথম সংখ্যা 'বীণা'র সূচনায় একটি গীত মুদ্রিত হয়, এটি সম্পাদকের রচনা। গানটি এখানে দেওয়া হলো—

(আস্থায়ী)

বাজল বীণা, নাচল জল,
বিজলী চমকে জলদ-গায়;
টুটল নিদ, ফুটল ফুল,
সচল ভেল অচল বায়।

(অন্তরা)

বাণী-বীণা বাজে ধীরি ধীরি,
দায়রা দায়রা দারা দিরি দিরি,
ধেত্তা ধিধি, তেত্তা তিতি
সঙ্গত ধীর মধুর ভায়।

(সঞ্চারী)

ভওঁর ভওঁরী বীণাকে সঙ্গ
গুঁজরি গুঁজরি করত রঙ্গ,
তা'কো সঙ্গ, নীরব বঙ্গ!
তু ভি গা রে সুর মিলায়,

(আভোগ)

নয়ী বীণা, বৈণিক নয়ো,
তন্ত্র নয়ো, মন্ত্র নয়ো,
নয়ো প্রবন্ধ, নয়ো প্রসঙ্গ;
নমহু বীণাপাণি-পায়॥

এই গানটির একটি স্বরলিপি বঙ্গ-সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের সংগীত-অধ্যাপক মদন-

মোহন বর্মণ করে দেন। সেটি প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। প্রথম বর্ষের 'বীণা'-য় 'ক্রোড়পত্রী'রূপে মোট আটটি বাংলা গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে। মদনমোহন বর্মণ এবং বৈকুণ্ঠনাথ বসু তিনটি করে এবং অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী দু'টি গানের স্বরলিপি তৈরি করে দেন।[২৬]

রাজকৃষ্ণ দ্বিতীয় বর্ষের 'বীণা'য় একটি নতুন বিষয় সংযোজন করেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করেন। 'বীণা'র 'পরিশিষ্ট'-স্বরূপ দ্বিতীয় বৎসরে 'গ্রন্থ-সমালোচন' বিভাগের প্রবর্তন করেন। রাজকৃষ্ণ এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন,—"বাঙ্গালা সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্রের সম্পাদকগণ কোন পুস্তক সমালোচনার্থ উপহার না পাইলে সমালোচনা করেন না, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সেরূপ করা ভাল নহে। উপহার না পাইলেও, অন্ততঃ ইচ্ছানুসারে কোন কোন গ্রন্থ ক্রয় করিয়াও সমালোচনা করা উচিত। আমরা বীণায় উপহারপ্রাপ্ত এবং ক্রীত পুস্তকাবলির সমালোচনা করিব।" (বীণা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১২৮৬)

রাজকৃষ্ণ সর্বপ্রথম অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' গ্রন্থটির সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হন। সমালোচনাকালে লেখেন—"আমরা এই পদ্যগ্রন্থখানি ক্রয় করিয়াছি। ...এ-গ্রন্থখানিতে প্রণেতার নাম নাই। তা' যাই হউক, গ্রন্থকার একজন মন্দ লেখক নহেন। তিনি উচ্চ দরের লেখক না হইলেও একজন ভাল লেখক বটেন। তাঁহার বর্ণনাশক্তি সুন্দর, এবং ভাষাও খুব সরল। কিন্তু উদাসিনীর গল্পটি চোরাই মাল। গ্রন্থকার কবিবর গোল্ডস্মিথের সন্ন্যাসী (Hermit) নামক পদ্যটি সাজাইয়াছেন। পাঠকগণ উদাসিনীর সহিত ইংরাজ কবির সন্ন্যাসী মিলাইয়া দেখিবেন। তবে কিনা সে গল্পটি অতি ক্ষুদ্র, আর উদাসিনীর গল্পটি দীর্ঘ।" (বীণা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১২৮৬)

তৃতীয় বর্ষের 'বীণা' সম্বন্ধে বীণা যন্ত্রের অবৈতনিক মুদ্রাকর শরচ্চন্দ্র দেব লিখেছেন—"বীণা যন্ত্রে অতি কষ্টে তৃতীয় বর্ষের বীণা শেষ হইয়া উহা বন্ধ হইল, তৃতীয় বর্ষের শেষাংশেও কবিতার পরিবর্ত্তে তাঁহার অদ্ভুত ডাকাত ও দুই সন্ন্যাসী ও অপরাপর একজন লেখকের চীনের কলসী নামক গল্প বাহির হইয়াছিল।"[২৭]

চতুর্থ বৎসর পূর্ণ করে 'বীণা' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। পাক্ষিক 'অনুসন্ধান' পত্রে এই প্রসঙ্গে জানানো হয়—"রাজকৃষ্ণ বাবু ঠনঠনিয়া পল্লীতে নিজের একটি থিয়েটার খুলিতেছেন; সেইহেতু অন্য কাজে লিপ্ত থাকিবার অবসর তাঁহার আদৌ নাই। তজ্জন্যই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে 'বীণা' বন্ধ করিতে হইল। সুতরাং 'বীণা'র পঞ্চম বর্ষের জন্য যে কয় জন গ্রাহক অগ্রিম মূল্য জমা দিয়াছিলেন, এখন তিনি টাকা ফেরত বা তাহাদের অভিলষিত পুস্তকাদি দিয়া তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিতেছেন।"[২৮]

'বীণা' পত্রিকায় বহু খ্যাতনামা লেখকের সাহিত্যকীর্তি স্থান পেয়েছিল।

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, রামদাস সেন, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, মনোমোহন বসু, ব্যোমকেশ মুস্তাফী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টারা এঁদের মধ্যে অন্যতম। ভাওয়ালের বিখ্যাত কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কয়েকটি প্রাথমিক রচনা 'বীণা'য় প্রকাশিত হয়। 'একদিন' নামে তাঁর একটি কবিতা প্রথম মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। পত্রিকাটি অবশ্যই 'বীণা'— এবং প্রকাশকাল ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক মাস ( প্রথম বর্ষ )।

'বীণা' পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 'গল্পকল্পতরু' নামে ফর্মার আকারে ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশের সূচনা করেন রাজকৃষ্ণ রায়। 'বীণা' কবিতার পত্রিকা, 'গল্পকল্পতরু' উপন্যাসের ধারক। ১২৮৬ সাল থেকে 'গল্পকল্পতরু' প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাস 'হিরণ্ময়ী'। এটি সমাপনের সঙ্গেই 'গল্পকল্পতরু'রও সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীকালে যখন বীণা প্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন আবার 'গল্পকল্পতরু' পুনঃপ্রচার করা হয়। তাতে 'জ্যোতির্ময়ী' এবং অন্যান্য লেখকের 'শান্তিকুটীর' প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

## অভিনয়-জীবন

রাজকৃষ্ণ যে সাহিত্যসৃষ্টিতেই পারদর্শী ছিলেন তাই নয়, তিনি সুঅভিনেতাও ছিলেন। নাটক রচনায় তিনি যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন ; সেই সঙ্গে অভিনয়-ক্ষমতাও নিতান্ত কম ছিল না তাঁর। রাজকৃষ্ণ মাঝে মাঝেই নানা স্থানে অভিনয় করে বেড়াতেন। মাহেশ, কলিকাতা, পাণ্ডুয়ার কাছে সরাই গ্রামে—এছাড়াও অনেক জায়গায় তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। তিনি সব ধরনের রসাভিনয়ই সমান দক্ষতার সঙ্গে করতে সমর্থ ছিলেন। তাঁর আরও একটি গুণ ছিল—তিনি ছিলেন সুনিপুণ মূকাভিনেতা। পাণ্ডুয়া স্টেশনের কাছে সরাই নামে একটি গ্রাম ছিল। সেখানে তাঁর প্রচেষ্টায় একটি নাট্যদল গড়ে ওঠে। তিনি নিজেও সে দলে অভিনয় করতেন। প্রথমে করেন একটি গীতাভিনয়—'আগমনী ও বিজয়া'। পরে 'সাবিত্রী' নামে একটি গীতাভিনয়, এটির প্রথমে নামকরণ করেছিলেন 'পতিব্রতা'। এছাড়া কয়েকটি প্রহসন রচনা করেও অভিনয় করান। কলিকাতার আর্য-নাট্য সমাজের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। তাদের সঙ্গে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' অভিনয় করেন। এ-নাটকের অভিনয়ে রাজকৃষ্ণ হিরণ্যকশিপুর চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয় অত্যন্ত প্রশংসিত হয় এবং তিনি বিশেষরূপে জনসমাদর লাভ করেন। রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষরা কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অভিনয় দেখানোর জন্য অপেরা হাউস দু'রাত্রি ভাড়া নেন। কলিকাতায় যে সমস্ত ইংরেজি এবং বাংলা কাগজ ছিল, তাতে আর্য-নাট্য সমাজের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকের, বিশেষ করে রাজকৃষ্ণের অভিনীত হিরণ্যকশিপুর চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা প্রকাশিত হয়।

রাজকৃষ্ণ শুধু যে সুঅভিনেতা ছিলেন তাই নয়, তিনি শিল্পজগতের আরও একটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতেন। তিনি সুরের জগতের সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। রাজকৃষ্ণ একজন ভালো সেতারবাদক ছিলেন। এ-কথার সমর্থন পাই শরচ্চন্দ্র দেবের রচনায়—"রাজকৃষ্ণবাবু সেতারবাদন-দক্ষ এইং অভিনয়কার্য্যে নিপুণ ছিলেন।"[২৯]

বীণা রঙ্গমঞ্চ স্থাপন

রাজকৃষ্ণের জীবনে নাটকের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। নাটকের জন্য তিনি সারাজীবন বহু অর্থব্যয় করেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা তিনি নাট্যদল গড়ে তুলেছিলেন। নানা বাধা এসেছে—দল ভেঙে গেছে—তবু তিনি নাটককে ত্যাগ করতে পারেননি জীবনের শেষ পর্যন্ত। নাট্যপ্রীতিই আবার তাঁর জীবনে অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছে—দুঃখ ডেকে এনেছে—রিক্ত, নিঃস্ব করে দিয়েছে রাজকৃষ্ণকে।

অভিনয়কুশলী রাজকৃষ্ণ শুধু নাটক রচনা এবং অভিনয় করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। স্থির করলেন নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করবেন। রাজকৃষ্ণ নানা স্থানে অভিনয় করে আনন্দ পেতেন। আর্য-নাট্য-সমাজে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' অভিনয় করেন। হিরণ্যকশিপুর চরিত্রে তাঁর অভিনয় উচ্চ প্রশংসিত হয়। তখনই স্থির করেন নিজস্ব রঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠা করবেন। সেইসঙ্গে আর একটি ঘটনাও আমরা স্মরণ করতে পারি। ১২৯২ সনের ২৬ আশ্বিন 'বেঙ্গল থিয়েটারে' 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখা রাজকৃষ্ণ-জীবনী থেকে আমরা জানি, "ইহা প্রথম অভিনয় কালে তাদৃশ আদরণীয় হয় নাই। শুনিয়াছি, রাজকৃষ্ণের সহিত বঙ্গরঙ্গভূমির কর্তৃপক্ষগণের সহিত বন্দোবস্ত ছিল যে, প্রথম দশটি অভিনয় রজনীতে যত টাকার টিকিট বিক্রয় হইবে, তিনি তাহার শতকরা দশ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। কিন্তু ভালরূপ টিকিট বিক্রয় না হওয়ায় তিনি ইহাতে লাভবান হইতে পারিলেন না। ইহার উপর উক্ত রঙ্গভূমিতে প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকের অভিনয় আরম্ভের পর ৩।৪ মাস কাল উক্ত রঙ্গভূমির কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার নিকট হইতে আর কোন পুস্তক লইলেন না। ইহাতে তাঁহার বড় অসুবিধা হইল। তিনি বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের নিকট একটি প্রথম শ্রেণীর অংশ প্রার্থনা করিলেন। তখন ঐ অংশের মূল্য প্রায় ১০০৲ টাকা, সুতরাং অধ্যক্ষগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। ইহারই ফলে রাজকৃষ্ণের বীণা থিয়েটারের সৃষ্টি।"[৩০] পরবর্তীকালে কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই নাটকের অভিনয়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করে। রাজকৃষ্ণের কথায় জানতে পারি—"এক 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকের অভিনয়ে লক্ষাধিক দর্শক হইয়াছে এবং উক্ত থিয়েটার কোম্পানী পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জন করিয়াছেন।"[৩১] পেশাদারি

রঙ্গালয়ের মধ্যে যেগুলি সে কালে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার মধ্যে বেঙ্গল থিয়েটার ছাড়া অন্য কোনো থিয়েটারে তাঁর নাটক তখন অভিনীত হয়নি। তাই নিজ নাটক অভিনয় উদ্দেশ্যেও তিনি রঙ্গমঞ্চ স্থাপনে উদ্যোগী হন এবং নাম দেন 'বীণা রঙ্গভূমি'।

রাজকৃষ্ণ ঠনঠনিয়া অঞ্চলে তদানীন্তন ৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোডে বীণা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ঐ পথ কেশব সেন স্ট্রীট নামে অভিহিত এবং বীণা থিয়েটার নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এখন 'জওহর' সিনেমায় পরিণত হয়েছে। রাজকৃষ্ণ স্থির করেছিলেন, নাটকে স্ত্রীলোকদের চরিত্র বালকদের দিয়ে অভিনয় করাবেন। তিনি ভেবেছিলেন এতে নতুনত্ব আসবে। কিন্তু তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পণ্যানারীর মঞ্চাবতরণ বন্ধ করা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সুহৃদ-শুভার্থীরা তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন রমণীর নৃত্যগীতবিহীন অভিনয় সাধারণ দর্শক দেখবে না। কিন্তু রাজকৃষ্ণ কারো কোনো মতামত শুনলেন না, স্বীয় সিদ্ধান্তে অবিচল থাকলেন।

১৮৮৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর, বীণা-রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের শুভ সূচনা হলো: রাজকৃষ্ণের লেখা পৌরাণিক নাটক 'চন্দ্রহাস' প্রথম এখানে অভিনীত হয়। 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় অভিনয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়—"বীণা-রঙ্গভূমি।— কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় বীণা-রঙ্গভূমির একমাত্র অধিকারী ও পরিচালক। সাধারণ থিয়েটারে যে যে কুরুচি আছে, তাহাই দূর করা তাঁহার উদ্দেশ্য; সুতরাং এ থিয়েটারে বারাঙ্গনা নাই,—পুরুষ দ্বারা স্ত্রী-অংশ অভিনীত হয়। আর, ইহাই এ থিয়েটারের নূতনত্ব। সম্প্রতি 'চন্দ্রহাস' নামক একখানি হরিভক্তিময় নাটক ইহাতে অভিনীত হইতেছে। অভিনয় দোষশূন্য না হইলেও, [ অনুসন্ধান ] সমিতির অনেক মেম্বর অভিনয় দেখিয়া বিশেষ তুষ্ট হইয়াছেন।"[৩২]

বীণা রঙ্গমঞ্চের প্রথম পর্যায়ে রাজকৃষ্ণের পরিচালনায় ছয়টি নাটকের অভিনয় হয়েছিল। চন্দ্রহাস ছাড়া প্রহ্লাদ-চরিত্র (প্রথম অভিনয় ১৮ ডিসেম্বর ১৮৮৭, হরধনুর্ভঙ্গ, দুর্গেশনন্দিনী, ঘোড়ার ডিম, (প্রথম অভিনয় ১ জানুয়ারি ১৮৮৮) এবং ভণ্ড দলপতির দণ্ড (প্রথম অভিনয় ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮)। সমসাময়িক পত্রিকায় রাজকৃষ্ণের প্রচেষ্টা প্রশংসিত হয় (দ্রষ্টব্য, *The Statesman*, December 20 and 28, 1887, *The Indian Mirror*, February 21, 1888, অনুসন্ধান ১৫ মাঘ ১২৯৪)। কিন্তু নানাকারণে রাজকৃষ্ণ প্রত্যাশিত আর্থিক সাফল্য লাভ করেননি।

রাজকৃষ্ণের রঙ্গমঞ্চে অভিনেতারা অর্থগ্রহণ করতেন না ঠিকই, তবে তাদের আপ্যায়নে, আতিথেয়তায় যে পরিমাণ অর্থব্যয় হতো, তাতে রাজকৃষ্ণ ঋণগ্রস্ত হতে বাধ্য হন। এ সম্পর্কে শরচ্চন্দ্র দেবের রচনায় জানতে পারি—"প্রথম অভিনীত

হইল 'চন্দ্রহাস', খবরের কাগজে প্রশংসা অনেক হইল, কিন্তু অর্থাগম তাদৃশ হইল না। তবে সুবিধা এই, অভিনেতাগণ অবৈতনিক। হইলে কি হয় তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনার ব্যয় নিতান্ত অল্প নয়।"৩৩

এ অবস্থায় বেশিদিন রঙ্গমঞ্চ চালানো সম্ভব নয়। মাস ছয়েক পরে অবশেষে ঋণগ্রস্ত হয়ে রাজকৃষ্ণকে অভিনয় স্থগিত রাখতে হয়। অত্যন্ত ক্ষোভে ও দুঃখে তিনি 'দুঃখের কথা' লিখলেন—"অনেক কাল চেষ্টা করিয়া, বড় সাধের আশায় মজিয়া বীণা রঙ্গভূমি স্থাপন করি। একা, কেহই সহায় নাই। মুখের কথায় অনেকে আমাকে হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গে তুলিয়াছিল; কিন্তু কাজের কথার বেলায় সবাই বোবা। কি করিয়া জানিব যে, তোমরা আমার সাধের চারা গাছটির কীট—আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইবে—প্রথমে কুটিল স্বার্থপরতাবারুদ ও গোলা গোপনে গোপনে মন-কামানে ঠাসিয়া শেষে আমার প্রাণে দাগিবে? নটের হাটে কি কেবল 'সর্পাদপি ভয়ঙ্করো' জীব?...৫ শ্রাবণ ১২৯৫।"৩৪ রাজকৃষ্ণ কতখানি অভিমান নিয়ে এ কথাগুলি লিখেছেন, তা আমরা সকলেই অনুভব করতে পারি।

ঋণ-পরিশোধের জন্য রাজকৃষ্ণ আর্য-নাট্য-সমাজের হাতে রঙ্গভূমি তুলে দেন। এখান থেকে বলা যায় বীণা রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা। এই নাট্যদল প্রথমে 'চৈতন্যলীলা' ও 'চন্দ্রহাস' অভিনয় করেন। পরে বীণা মঞ্চে রাজকৃষ্ণের নতুন নাটক 'হরিদাস ঠাকুর', 'বৈশাখী চাঁপা', 'দশরথের মৃগয়া ও সিন্ধুবধ' এবং বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর নাট্যরূপের অভিনয় হয়। আর্য-নাট্য-সমাজ রাজকৃষ্ণের নাটক শুধু গ্রহণ করেনি, তাঁর 'মহৎ উদ্দেশ্যে'র প্রতিও আনুগত্য দেখিয়েছে। কিন্তু নারীবর্জিত এ অভিনয়ে দর্শক-সমাগম আশানুরূপ হচ্ছিল না।

আয-নাট্য-সমাজের পরবর্তী নাটক 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের জন্য প্রশংসা লাভ করেছিল। ১৮৮৮ সালের ৯ নভেম্বর 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' পত্রে প্রকাশিত হয়—"সম্প্রতি আমরা বীণা রঙ্গভূমিতে আর্য্য-নাট্য-সমাজ কর্তৃক সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বীণা রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠাতা বাবু রাজকৃষ্ণ রায় স্বয়ং এখন অভিনয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। রঙ্গভূমিতে তাঁহার ন্যায় একজন খ্যাতনামা অভিনেতার অভাব বিশেষ ক্ষতিজনক; কিন্তু আর্য্য-নাট্য-সমাজ যেরূপ সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিতেছেন তাহাতে অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে তাঁহারা যে রাজকৃষ্ণ বাবুর মহৎ উদ্দেশ্যও পূর্ণ করিতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকাল সহরে বেশ্যা সংযুক্ত থিয়েটার সকলের পশার ও প্রতিপত্তি যেরূপ, তাহাতে কেবল পুরুষ অভিনেতা লইয়া স্থায়ী থিয়েটার স্থাপন করা অনেক সাহস ও বলের কার্য্য; তাহার পথে বিস্তর বিঘ্নবাধা। কিন্তু

এ সকলের মধ্যেও আর্য্য-নাট্য-সমাজ যে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা আমরা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না।...বিখ্যাত অভিনেতা বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি আর্য্যনাট্য-সমাজে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় নীলদর্পণের অভিনয় যে বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।"—এই সমালোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' বীণা রঙ্গমঞ্চে বালকদের অভিনয়ে যথেষ্ট প্রীত হয়েছিল।

এই মাসেই ( নভেম্বর ১৮৮৮ ) আর্য-নাট্য-সমাজ বীণা ত্যাগ করলেন। বীণা রঙ্গমঞ্চের তৃতীয় পর্যায়ের এখানে সূচনা। মহাজনের ঋণশোধের জন্য মহিলা অভিনেত্রী সহযোগে অভিনয়ের জন্য উপেন্দ্রনাথ দাসের নিউ ন্যাশনাল থিয়েটারকে বীণা রঙ্গভূমি রাজকৃষ্ণ ভাড়া দিলেন। রাজকৃষ্ণ বাধ্য হয়ে এ-কাজ করেছিলেন। অনেকেই এজন্য ক্ষুব্ধ হন। 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' ১৮৮৮ সালের ৭ ডিসেম্বর এ সম্পর্কে লেখে—"বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ইহা কম ঘৃণা এবং লজ্জার কথা নহে, যে বাঙ্গালীরা আজিও সন্নীতির পোষকতা করিতে শিখে নাই। তাহা না হইলে এক কলিকাতা সহরেই 'বেঙ্গল' 'ষ্টার' 'এমারেল্ড' বেশ্যা অভিনেত্রী মিশ্রিত এই তিনটী রঙ্গভূমি বহুকাল হইতে নির্ব্বিবাদে চলিয়া কি প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে?" তখন স্ত্রীলোক-সহ অভিনয় বহুস্থানে নিন্দনীয় ছিল। কলিকাতার স্টার থিয়েটার মহিলা অভিনেত্রী-সহ ঢাকায় অভিনয় করতে যায়। কিন্তু সেখানের মানুষ অভিনয় করতে দেয়নি। অভিনয় দল ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে'র ভূতপূর্ব কার্যাধ্যক্ষ উপেন্দ্রনাথ দাস বিলাত প্রত্যাগত হয়ে 'নিউ ন্যাশনাল থিয়েটারে'র প্রবর্তন করেন। তিনি বীণা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা স্থির করেন এবং অভিনেত্রী-সহ দল গঠন করেন। রাজকৃষ্ণকে উদ্দেশ করে 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' লেখে—"তবে কি রাজকৃষ্ণ বাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন।"[৩৫]

রাজকৃষ্ণ মর্মাহত হয়ে সম্পাদককে জানান, "...আমি কেবল অত্যন্ত ঋণের দায়ে আমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছি।...এক বৎসরের মধ্যেই আমার সাধের আশা, সাধের যত্ন, সাধের চেষ্টা মরিয়া গেল—আমাকেও মারিয়া গেল। এখন ঋণ ও সুদের বিভীষিকায় আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি।" ঋণের দায়েই নিছক টাকার প্রয়োজনে রাজকৃষ্ণ বীণা থিয়েটার ভাড়া দিলেন। রাজকৃষ্ণ আরও জানান, "...ঋণ যে বিষের অপেক্ষাও অতি তীব্র, তা যে ঋণ-বিপন্ন, সেই বুঝিতে পারে।...'সামান্য ভাড়ার খাতিরে' নয়, আমার পক্ষে অসামান্য ঋণের যন্ত্রণায় এই কার্য্য হইয়াছে। আপনি ত জানেন 'Debt is the worst kind of poverty'. ভগবান যদি দিন দেন, তবে এই ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, ইচ্ছামত কার্য্য করিব।" শেষে লিখেছেন, "আমি এক বীণা থিয়েটার করিয়া

মানব-চরিত্রের কত রকম ভোজবাজী ভেল্কিবাজী দেখিলাম, তাহার সীমা নাই। বীণা থিয়েটার না হইলে বোধহয় সংসার থিয়েটারের এই সকল সং রং দেখিতে পাইতাম না।"[৩৬]

উপেন্দ্রনাথ দাসের নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার বীণা মঞ্চে 'দাদা ও আমি' (প্রথম অভিনয় ৮ ডিসেম্বর ১৮৮৮), 'শরৎ সরোজিনী' (১৬ ডিসেম্বর ১৮৮৮), 'সধবার একাদশী' (২৫ ডিসেম্বর ১৮৮৮), এবং 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (২৭ জানুয়ারি ১৮৮৯) অভিনয় করে। পরবর্তী ছয় মাসে 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'হিরণ্ময়ী', 'নবীন তপস্বিনী' অভিনীত হয়। কিন্তু উপেন্দ্রনাথও বীণা রঙ্গমঞ্চে আর্থিক সাফল্য লাভ করতে পারেননি। ফলে নিউ ন্যাশনাল বীণা পরিত্যাগ করে।

উপেন্দ্রনাথ বীণা ছেড়ে গেলে ঋণের দায়ে জর্জরিত রাজকৃষ্ণ অভিনেত্রী দ্বারা অভিনয় করানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রঙ্গমঞ্চে পুনর্বার অবতীর্ণ হন পরিচালক-প্রযোজক রূপে। বীণা রঙ্গমঞ্চের চতুর্থ পর্যায়ের দ্বারোদ্ঘাটন হয় রাজকৃষ্ণের নতুন নাটক 'মীরাবাই'-এর অভিনয় দিয়ে, ২০শে জুলাই ১৮৮৯ সালে। 'স্টেটসম্যান'-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে আমরা জানি,—

Grand Re-opening Night

**VINA THEATRE**

Saturday, 20th July at 9 p.m.

Baboo Rajkrishna Roy's New Drama

MIRABAI[৩৭]

রাজকৃষ্ণকে বরাবর 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' উৎসাহ প্রদান করে এসেছে, কিন্তু বর্তমানে অভিনেত্রী-সহ অভিনয় দেখে তাঁরা যথেষ্ট দুঃখ পান, বিচলিত হয়ে লেখেন—"...আমরা কখনই আশা করি নাই যে, রাজকৃষ্ণ বাবুর মত লোক এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর এই কার্য্যে আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। বীণা থিয়েটারের ঋণ শোধের কি তিনি আর কোন সদ্‌উপায় বাহির করিতে পারিলেন না?"[৩৮]

অভিনেত্রী দিয়ে অভিনয় করাবেন না—ঋণগ্রস্ত হয়ে, রাজকৃষ্ণ এই মত পরিবর্তন করলেন। তবু লক্ষ্মীর কৃপালাভ করতে পারলেন না। মীরাবাই, লীলাবতী, সধবার একাদশী, ভ্রান্তিবিলাস, শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা, চমৎকার, চতুরালী, চন্দ্রাবলী, জগা পাগলা, ঘোষের পো, রুক্মিণী হরণ, খোকা বাবু, হরধনুর্ভঙ্গ, লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র, জটিল, দাতা কর্ণ, হীরা মালিনী—কত নতুন নাটক লিখে অভিনেত্রী গ্রহণ করে অভিনয় করালেন—তবু ঋণ বেড়েই চললো। স্ত্রীপুত্রের অলংকার, রঙ্গমঞ্চ,—মহাজনের দেনা শোধ করতে সর্বস্ব বিক্রয় হয়ে গেল। অবশেষে সাধারণ মানুষের কৃপাপ্রার্থী হলেন।[৩৯] ১৮৯০ সালের ২৯ ডিসেম্বর

( ১২৯৭ সালের ১৫ পৌষ ) 'অনুসন্ধানে' বিজ্ঞাপিত হলো—

"শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়

এই হতভাগ্য বাঙ্গালা দেশের একজন কবি। দুর্ভাগ্যক্রমে কি এক কুক্ষণে তিনি কবিতা-কানন ছাড়িয়া, দেশীয় রঙ্গভূমির সংস্কার করিতে যান। আজ তাই তিনি সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া বিপন্ন অবস্থায় পতিত। এমন কি, এখন যদি দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে কিছু কিছু সাহায্য না করেন, তবে আর তাঁহার কোন আশাই নাই। তাই আজ তিনি সাধারণের নিকট কৃপাপ্রার্থী। এখন সকলেই যাহার যেমন সাধ্য, রাজকৃষ্ণ বাবুকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া তাঁহাকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করেন, সাধারণের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ। রাজকৃষ্ণ বাবুর ঠিকানা ৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা।"

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। রাজকৃষ্ণ রঙ্গভূমির ঋণের দায়ে সর্বস্বান্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত ১২৯৭ সালের শেষের দিকে তাঁর সাধের বীণা রঙ্গভূমি হস্তান্তরিত হয়ে গেল।

শেষ জীবন

গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলালের সমকালে বা তার কিছু পরে যে সব নাট্যকারেরা রঙ্গালয়ে যোগদান করেছিলেন, রাজকৃষ্ণ রায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রাজকৃষ্ণের নাটক-রচনা ও অভিনয় সম্বন্ধে শুধু যথেষ্ট জ্ঞান ছিল যে তা নয়, নাটক ও নাট্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। রাজকৃষ্ণ বয়সে গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা ছোট এবং অমৃতলাল অপেক্ষা বড় ছিলেন। কিন্তু নাট্যকার হিসাবে অমৃতলালের মতো তিনিও গিরিশচন্দ্রের আগেই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সুপরিচিতি লাভ করেন।

রাজকৃষ্ণ কিন্তু নাট্যজগতে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। 'বীণা রঙ্গভূমি' তাঁর জীবনের মর্মান্তিক পরিণতির কারণ। তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে, নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত সাধারণের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী হয়েছিলেন। এই বিশেষ বিপদগ্রস্ত অবস্থায় অমৃতলালই তাঁকে স্টারে নাট্যকাররূপে আশ্রয় দেন। কারণ দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় রাজকৃষ্ণ আত্মহননের পথই বেছে নেওয়া স্থির করেছিলেন। রাজকৃষ্ণের তৎকালীন ভয়াবহ মানসিক যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত হয়েছে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে—"সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করিবার সংকল্পও তিনি কখন কখন করিতে লাগিলেন।...ঠিক এই সময় ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় রাজকৃষ্ণের সহায় হইলেন। সেই সহায়তার ফলে ষ্টার থিয়েটারে তাঁহার আশ্রয় মিলিল।"[৪০]

১৮৯১ ( ১২৯৮ ) সালে স্টার থিয়েটারে তাঁকে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে

গ্রন্থকার রূপে অমৃতলাল নিয়োগ করলেন। তিনি 'নরমেধ যজ্ঞ', 'লয়লা-মজনু', 'বনবীর', 'ঋষ্যশৃঙ্গ', 'বেনজীর-বদরেমুনির' প্রভৃতি নাটক রচনা করলেন। স্টারে এই নাটকগুলি অভিনীত হলো।

রাজকৃষ্ণের জীবনের শেষ দিনগুলি বড়ই দুঃখ-দুর্দশায় কেটেছে। অমৃতলালের সহায়তার কথা কৃতজ্ঞ রাজকৃষ্ণ আমৃত্যু স্মরণে রেখেছিলেন—"তিনি কথায় কথায় বলিতেন, '...অমৃতবাবুর ( স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ বাবু অমৃতলাল বসুর ) ঋণ আমি কখনই ভুলিতে পারিব না।' মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও তিনি আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন, আর কাঁদিয়াছেন।"[৪১]

মৃত্যু

রাজকৃষ্ণ বাল্যকাল থেকেই অসুস্থ ছিলেন। অল্পবয়সে নানা কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হয়। ভবিষ্যৎ জীবনেও তাঁর রোগমুক্তি ঘটেনি। অভাবের জীবনে রোগ আরও ভালোভাবে আশ্রয় পেয়েছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি নানা ব্যাধি জর্জরিত হয়ে পড়েন। বিশেষত যে রোগ তাঁকে অসহনীয় যন্ত্রণা দিত তা হলো অর্শভগন্দর। তাঁর কষ্টভাগের কথা আমরা জানতে পারি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে। তিনি নবকৃষ্ণ বাবুকে ১৮৯০ সালের ২রা নভেম্বর লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছেন, "আমি এখনও রোগ ভোগ করিতেছি, তবে কিছু যেন উপশম হইতেছে। মান্দ্রাজী ডাক্তার শেষটুকু অস্ত্র করিয়াছে। ঘায়ের ঔষধ দিতেছে। ঘাও শুখাইতেছে, কিন্তু এখনও ভিতরে ঘা আছে। উহা শুখাইলে তবে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবার কথা।"[৪২]

আরোগ্যলাভের আশায় রাজকৃষ্ণ একসময় দেওঘর গিয়েছিলেন। সেখানে ব্রজলাল দত্তের বাড়ি থেকে ১৩০০ সালের ৯ই মাঘ নবকৃষ্ণ বাবুকে একটি পত্রে লেখেন—" অদ্য আমি স্থির হইয়া পত্র লিখিতে সময় পাইলাম। ভারি কষ্ট ভুগিয়াছি, তবু সেদিন আপনি আচম্বিতে আসিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম। রওনার দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আমার জ্বর হয় নাই। কিন্তু অর্শভগন্দরের কষ্ট বাড়িয়াছে অত্যাচারে। হোমিও ঔষধ খাইতেছি।"[৪২]

নবকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে রাজকৃষ্ণের যে ঘনিষ্ঠ একটি সম্পর্ক ছিল, তা চিঠিগুলি পড়লে বোঝা যায়। রাজকৃষ্ণ তাঁর দুঃখের দিনে নবকৃষ্ণ বাবুকেই কষ্টের কথা বার বার জানিয়েছেন,—"...মাসিক ৪০ টাকায় শিশির বাবুর বাঙ্গলো ভাড়া করিয়া উঠিয়া আসিয়াছি। আমার আবার বড় জ্বর হইয়াছিল, কল্য হইতে কমিতেছে। অর্শ ভগন্দর বড় কষ্টকর।"[৪২] ১৮৯৪ সালের ২২শে জানুয়ারির এই চিঠির পর ১৮৯৪

সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি রাজকৃষ্ণের আর একটি পত্র নবকৃষ্ণ পেয়েছিলেন। তাতে রাজকৃষ্ণ জানিয়েছেন, "...আমি এখানে ১ মাসের মধ্যে অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছি—নিত্য নূতন নূতন রোগ দেখা দিতেছে—অতএব কল্য বৃহস্পতিবার প্রাতে ৯টার ট্রেনে কলিকাতায় রওনা হইতেছি।"[৪২]

সম্ভবত এটিই নবকৃষ্ণকে লেখা রাজকৃষ্ণের শেষ পত্র। কারণ এই পত্রলেখার অল্পদিন পরেই ১৮৯৪ সালের ১১ মার্চ (১৩০০ সালের ২৮ ফাল্গুন) সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ রায় জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে, ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ফাল্গুন মাসের তিরিশ তারিখে 'অনুসন্ধান' পত্রে এক কোশ প্রস্তাব প্রকাশিত হয়—

"...বঙ্গভাষা একটি রত্নহীন হইল—কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় আর নাই। গত ২৮ এ ফাল্গুন রবিবার, দ্বি-প্রহরের সময়, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া—পুত্র-পরিবারকে কাঁদাইয়া, তিনি দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।

"অন্তরে যেন শেল বিঁধিয়াছে। এমন সুহৃদ, এমন অকপট বন্ধু, এমন হিতৈষী—এমন ভাবে এত শীঘ্র আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন, এ যে আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই।"[৮৩]

১৮৯৪ সালের ১৭ মার্চ তারিখের *Reis and Rayyet* পত্রিকায় লেখা হয়—
The Bengali poet and playwright, Raj Krishna Roy, died last Sunday at the age ot 44. He was a sweet versifier. His metrical translations of the Ramayana and Mahabharata are much admired by those that have read them. No Bengali writer can hope to supplant the immortal works of Krittibasa and Kasidasa however unfaithful they may be as translations of Valmiki and Vyasa. For all that, the deceased by setting himselt to produce accurate metrical versions, in Bengali of those epics of ancient India, achieved a measure of success by no means inconsiderable. Although he attempted several species of poetry, his strength lay in the Lyrical line. Himself a good comic actor, he had started in this city a theatre on his own account called the Vina. Partial to his own gender, he wanted to prove that the established theatres of the city had committed a mistake by introducing genuine actresses on their boards, but he not only failed there but failed in his venture also. He next

led, for a season, a peripatic operatic company giving performances in the Dacca country. Latterly, he joined the Star Theatre as its dramatist. The members of the Company showed their appreciation of the deceased by following his remains to the Burning Ghat.[৪৮]

রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনাবসানে স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং ১৪ মার্চ তারিখে তাঁর স্মৃতিপালনের জন্য নিয়মিত অভিনয় বন্ধ রাখেন। OBITUARY NOTICE / STAR THEATRE /As a tribute to the memory of our poet / Boboo Rajkrishna Roy, who breathed his / last on Sunday, the 11th instant, there will be / no performance to night / AMRITALAL BOSE, MANAGER.[৪৫]

রাজকৃষ্ণের মৃত্যুতে বাঙালি পাঠকসমাজ নিদারুণ শোকাহত হয়েছিল। কবিকে স্মরণ করার জন্য এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে একাধিক শোকসভার সংবাদ পাওয়া যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সিটি থিয়েটারে ১৩০১ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার যে সভার আয়োজন করা হয় তাতে রজনীকান্ত গুপ্ত, দামোদর মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর পাঁড়ে, অমৃতলাল বসু, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি শোক প্রকাশ করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন নাট্যকার মনোমোহন বসু।[৪৬]

রাজকৃষ্ণ শুধু কবি, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক ছিলেন না, রাজকৃষ্ণ আরও নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। অভিনয়-দক্ষ এবং সেতারবাদনে নিপুণ ছিলেন। কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর শিল্পীসত্তার বিকাশ সম্যকরূপে হতে পারেনি নানা কারণে। অকালে রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে যায়।

১. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, "জন্মবৎসর আনুমানিক। নিভৃতনিবাসের পঞ্চম সর্গে কবি লিখিয়াছেন, বড়াবংশ বর্ষ আমার চলিয়া যায়।" সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭৭, পৃ ৪১৬।
২. দ্র. সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯১৭, পৃ ৮৮১।
৩. দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় ( সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৫০ ) ১৩৫৫, পৃ ৫।
৪. শরচ্চন্দ্র দেব, রাজকৃষ্ণ জীবনী, রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯১৫ পৃ /০

৫. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে, "অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ইহার পিতারও দেহান্তর হয়।"—বঙ্গভাষার লেখক, প্রথমভাগ, ১৩১১, পৃ ৮৪৪।
৬. কবিবর ৺রাজকৃষ্ণ রায়, অনুসন্ধান, সপ্তম বর্ষ, একবিংশ সংখ্যা, ৩০ ফাল্গুন, ১৩০০, পৃ ১০০০।
৭. দ্র. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, প্রজ্ঞাভারতী সংস্করণ, ১৩৮৯, পৃ ৬২।
৮. 'উপহারপত্র' ,কল্কিপুরাণ, ১২৯৯;
৯. দ্র. শরচ্চন্দ্র দেব, রাজকৃষ্ণ জীবনী, পৃ ।/০।
১০. দ্র. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, পৃ ৮৪৬।
১১. সুলভ সমাচার ও কুশদহ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮, ১৩ ফাল্গুন ১২৯৪।
১২. পুরাতন পত্র : নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে লেখা অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ, পুরশ্রী, ১৩ কার্তিক, ১৩৮৬, ১০ নভেম্বর, ১৯৭৯, পৃ ৮৯৭।
১৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬, পৃ ২৭২।
১৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, পৃ ৫২।
১৫. ভূমিকা, রাজকৃষ্ণ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বেঙ্গল মেডিকেল, ১২ পৌষ ১২৯২।
১৬. শরচ্চন্দ্র দেব, রাজকৃষ্ণ জীবনী, পৃ ।।.
১৭. কবিবর ৺ রাজকৃষ্ণ রায়, অনুসন্ধান, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১, পৃ ১৫৩।
১৮. দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, পৃ ৩৬।
১৯. যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়, প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃ ৭৪।
২০. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, ১৯৭১, পৃ ৫৯৫।
২১. গোপালচন্দ্র রায়, অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র ( চিঠিপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ), ১৯৭৯, পৃ ১৭২।
২২. সুশীল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ১৯৬৩, পৃ ৭৩।
২৩. সংক্ষিপ্ত সমালোচন, বঙ্গদর্শন, ১০২ সংখ্যা, চৈত্র ১২৮৯, পৃ ৫৭৬।
২৪. দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িকপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৮৪, পৃ ১০।
২৫. তদেব, পৃ ২৫।
২৬. দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, পৃ ১৩।
২৭. শরচ্চন্দ্র দেব, রাজকৃষ্ণ জীবনী, পৃ ।/০।
২৮. অনুসন্ধান, ১৫ কার্তিক ১২৯৪, ৩১ অকটোবর ১৮৮৭, পৃ ৯২।

২৯. শরচ্চন্দ্র দেব, রাজকৃষ্ণ জীবনী, পৃ ।/০ ।
৩০. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, পৃ ৮৪৭ ।
৩১. দ্র. তদেব, পৃ ৮৪৭ ।
৩২. অনুসন্ধান, ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৪, ১৪ ডিসেম্বর ১৮৮৭, পৃ ১৪১ ।
৩৩. শরচ্চন্দ্র দেব, রাজকৃষ্ণ জীবনী পৃ ৭ ।
৩৪. 'দুঃখের কথা', হরিদাস ঠাকুর, শ্রাবণ ১২৯৫ ।
৩৫. সুলভ সমাচার ও কুশদহ, ৭ ডিসেম্বর ১৮৮৮ ।
৩৬. সুলভ সমাচার ও কুশদহ, ১৪ ডিসেম্বর ১৮৮৮ ।
৩৭. *The Statesman*, Saturday, July 20, 1889.
৩৮. সুলভ সমাচার ও কুশদহ, ২৬ জুলাই ১৮৮৯ ।
৩৯. 'Last Sunday Evening this theatre was filled with an apppeciated and sympathetic audience who had come to bid Baboo Rajkisto Roy a hearty farewell. The Baboo has not been financially successful in his enterprise, though he deserves success, being a man of talent and integrity, and he was unable to meet his financial engagements. No doubt the required aid will be forthcoming as he has many friends and admirers." *The Statesman*, Wednesday, December 17, 1890.
৪০. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, পৃ ৮৪৭-৪৮ ।
৪১. হরনাথ বসু, ভূমিকা, মহারাষ্ট্র গৌরব । দ্র. অরুণকুমার মিত্র, অমৃতলাল বসু জীবনী ও সাহিত্য, ১৯৭০, পৃ ১১১ ।
৪২. পুরাতন পত্র, পুরশ্রী, ২৩ কার্ত্তিক ১৩৮৬, পৃ ৮৯৮ ।
৪৩. অনুসন্ধান, ৩০ ফাল্গুন ১৩০০ ।
৪৪. *Reis and Rayyet*, March 17, 1894.
৪৫. *Indian Daily News*, March 14, 1894.
৪৬. দ্র. অনুসন্ধান, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১, পৃ ১২৫ ।

## নাট্যধারা

### ।। পৌরাণিক ও পুরাণাশ্রয়ী নাটক ।।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি যুগ থেকেই পুরাণকাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। সাধারণভাবে 'পুরাভবম্ ইতি পুরাণম্' এবং 'আজ্ঞাসিদ্ধ' শাস্ত্রকে বলে পুরাণ। পুরাণ বলতে অষ্টাদশ পুরাণ বা অন্য কয়েকটি উপপুরাণ বোঝানো হলেও, বাংলায় রামায়ণ এবং মহাভারতকেও ব্যাপক অর্থে পুরাণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পুরাণে দেবদেবীর কাহিনী যেমন আছে, তেমনই আছে মানবমানবীর কাহিনী। এত অসংখ্য কাহিনী, এমন তার বৈচিত্র্য এবং আকর্ষণীয়তা যে, বাঙালি কবি ও নাট্যকারদের তা চিরকালের আকর্ষণের বস্তু। তবে আদিযুগে পুরাণকাহিনীর মধ্যে মানবরসেরই সন্ধান করেছেন নাট্যকারেরা। 'ভদ্রার্জ্জুন' ( ১৮৫২ ) বা 'শর্মিষ্ঠা'র ( ১৮৫৯ ) কাহিনীর উৎস পুরাণ ( মহাভারতীয় পুরাণ বলাই সংগত )—তাই এগুলি পৌরাণিক নাটক আখ্যা লাভ করেছে, ইউরোপে যেমন গ্রীক-রোমক পুরাণ অবলম্বনে লেখা নাটককে বলা হয় মিথলজিক্যাল ড্রামা। অবশ্য পরবর্তীকালে বাংলায় 'পৌরাণিক নাটক' শব্দটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য লাভ করায় এই ধরনের নাটককে 'পুরাণাশ্রয়ী' নাটকনামে অভিহিত করতে পারি— সাধারণত এখানেই ঘটে পুরাণের নবজন্ম। 'পৌরাণিক নাটক' শব্দের স্বতন্ত্র তাৎপর্য উনিশ শতকের শেষপাদে প্রকট হয়ে ওঠে অর্থাৎ পুরাণের গল্প থাকলেই তাকে পৌরাণিক নাটক বলতে আমাদের মনে সংশয় জাগে। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের ভূমিকা এর মধ্যে থাকা সম্ভব, অসাম্প্রদায়িক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়া হতে পারে, আবার বাঙালির জাতিগত ধর্মোন্মাদনার প্রকাশ মনে করাও অসংগত নয়—সব মিলিয়ে পৌরাণিক নাটক হয়ে উঠলো ভক্তিমূলক নাটকের আর এক নাম। মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায় যখন নাটক লিখছেন তখন পুরাণকাহিনীর মধ্যে দেবমাহাত্ম্যের সন্ধান নাট্যকারের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। গিরিশচন্দ্রের মনে হয়েছে, "যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়-স্রোত,—তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে।"[১] কিন্তু পুরাণাশ্রয়ী অন্য নাটকে মানবরস পরিবেশনের সম্ভাবনা থাকায় নাটক হিসাবে তা যতটা উৎকর্ষ লাভ করেছে, ভক্তিরসাশ্রয়ী পৌরাণিক নাটকের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। ইউরোপেও গ্রীক এবং রোমক 'মিথ্' অবলম্বনে প্রচুর নাটক লেখা হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের কোনো যোগ না থাকায় প্রাচীন কাহিনীকে

নাট্যকারেরা নিজেদের প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেছেন।[২] কিন্তু ভারতবর্ষে পুরাণ কাহিনী, বিশেষত দেবদেবীর বৃত্তান্তকে 'সিদ্ধরস'-কাহিনী রূপে গ্রহণ করার ফলে সেখানে পরিবর্তন বা রূপান্তর নিষিদ্ধ—

সন্তি সিদ্ধরসপ্রখ্যা যে চ রামায়ণাদয়ঃ।
কথাশ্রয়া ন তৈর্যোজ্যা স্বেচ্ছারসবিরোধিনী ॥[৩]

ফলে নাট্যকারের স্বাধীনতা শুধু ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাই নয়, পুরাণের যাবতীয় লক্ষণ, তথা অলৌকিকতা, দেবদেবীর মর্ত্যাবতরণ, স্বর্গ-নরক-দৃশ্য প্রভৃতি নাটকে স্থান দিতে গিয়ে নাটকের অনেক লক্ষণই বিসর্জন দিতে হয়েছে। আসলে পুরাণের ধর্ম আর নাটকের ধর্মকে মেলানো দূরে থাক, একই আধারে পরিবেশন করাও দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের ভাষায়—"Hundreds of plays bear witness to the fatal nature of this conflict, either evading the religious experience which they profess to make their subject, or if faithful to their subject, ceasing to be drama at all."[৪] নাটকের কার্যকারণ শৃঙ্খলা, ঘটনাধারার অনিবার্য পরিণাম, চরিত্রবিকাশ,—কোনো কিছুই পুরাণ কাহিনীতে প্রত্যাশিত নয়। ফলে পৌরাণিক নাটকের পক্ষে বিয়োগান্ত পরিণাম রচনা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রয়োজনে 'ক্রোড় অঙ্ক' সংযোজনের মধ্য দিয়ে 'মিলন দৃশ্যে'র অবতারণা করতে হয়।[৫] ইউরোপে যাকে 'রিলিজিয়াস ড্রামা' বলা হয়, সেখানেও এই একই সমস্যা দেখা দিয়েছে,—"by justifying the ways of God to man he leaves no room for tragic ecstasy and substitutes an ecstasy of another kind"[৬] ফলে ধর্মীয় বা ভক্তিমূলক নাটকের বিচারকালে প্রচলিত নাট্যাদর্শের কঠোর অনুসরণ কাম্য বা সম্ভব নয়। বাংলা 'পৌরাণিক নাটক' এক হিসাবে গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টি—এই ধারার তিনি সবশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। রাজকৃষ্ণ রায় বা পরবর্তীকালে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এই ক্ষেত্রে কমবেশি পরিমাণে গিরিশ-অনুসারী নাট্যকার।

পতিব্রতা ॥ 'পতিব্রতা' নাটকটি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় এবং ঐ বছরই "৩রা ডিসেম্বর তারিখে ইহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।"[৭] তবে সে কালের কোনো বিখ্যাত মঞ্চে সম্ভবত 'পতিব্রতা'র অভিনয় হয়নি। "পাণ্ডুয়া ষ্টেশনের নিকটবর্তী সরাইগ্রামে, তাঁহার যত্নে এক অভিনয়-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে তিনি নিজে অভিনয় করিতেন।"[৮] সেখানে "তাঁহার পতিব্রতা পরিবর্তিত করিয়া 'সাবিত্রী' নামে একখানি গীতাভিনয়"[৮] অভিনীত হয়। নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত তথ্যই জানা যায়।

মহর্ষি বেদব্যাসের মহাভারতের বনপর্বে ২৯৫ এবং ২৯৬ অধ্যায়ে বর্ণিত

সাবিত্রী-সত্যবান কাহিনী অবলম্বনে রাজকৃষ্ণ রায় তিন অঙ্কের গীতিনাট্য 'পতিব্রতা' রচনা করেন।

দৈব-দুর্বিপাকে রাজা দ্যুমৎসেন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে, রাজ্যচ্যুত হয়ে স্ত্রী শৈব্যা, পুত্র সত্যবানকে নিয়ে বনবাসী হন। বনবাসকালে সত্যবানের সঙ্গে অশ্বপতি-মালবীর একমাত্র কন্যা সাবিত্রীর বিবাহ হয়। দেবর্ষি নারদ সে সময় সত্যবান সম্বন্ধে জানান, "অদ্যাবধি সংবৎসর পরিপূর্ণ হইলে অকালে কালকবলে নিপতিত হইবে।"[৯] সব কিছু জেনেও অদ্ভুত মানসিক দৃঢ়তায় সাবিত্রী সত্যবানকেই পতিরূপে গ্রহণ করেন। বৎসরান্তে কন্যা সাবিত্রীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অশ্বপতি-মালবীর মনোবেদনা প্রকাশের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনীর সূচনা। নারদ তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন—স্বকৃত পুণ্যবলে কন্যা বিপন্মুক্ত হবে। সাবিত্রীর সখীরা তার দুঃখের কারণ জানতে চাইলে সাবিত্রী মনে ভাবে—"এ ব্যথা যে কা'রে কহিবার নয়, / বিপরীত হবে কহিলে অপরে, / কাজ নাই, চাপা রহুক অন্তরে।"[১০] তাই মুখে বলে যে তার ব্যথা বিধাতা ছাড়া কাউকে বলা যাবে না, সময় এলে সকলে জানতে পারবে। দ্যুমৎসেন-শৈব্যাও তাঁদের পুত্রবধূ সাবিত্রীর বেদনায় আর্ত, তাদের প্রার্থনা—"সাবিত্রী বিপদে যেন পতিত না হয়; / শিব-সতী-সম চির-পতিব্রতা রয়।"[১০] সাবিত্রী শুধু বেদনার্ত নয়, সে নিজেও আসন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত। তাই দেবী দুর্গার আরাধনা করে সাশ্রুনয়নে—"সতী-মাতা সতি বাঁচাও মোরে,"[১১] যেন সিঁথির সিঁদুর মুছতে না হয়।

সত্যবান প্রথমাবধি সাবিত্রীর পতিভক্তিতে বিস্মিত, তৃপ্ত। কিন্তু বনগমনকালে যখন সে তাকে সঙ্গ দিতে চেয়ে বলে, "আমিও তোমার সনে, যাব বন-দরশনে, / বাসনা হয়েছে আজি মনে।"[১২] তখন সত্যবান বাধা দিয়ে জানায়—"কোমল শরীর তব, কোমল চরণ প্রিয়ে / বনভূমি বড়ই কঠিন। / বাজিবে চরণে তব, / গেলে বনভূমি দিয়ে / রোদে মুখ হইবে মলিন।"[১২] মহাভারতেও অনুরূপ চিত্র পাই—বনগমনকালে সাবিত্রী স্বামীকে বলেন, "আমি অদ্য তোমায় পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তোমার সহিত গমন করিব।...সত্যবান কহিলেন, ভাবিনি! তুমি কখন বনে গমন কর নাই, অতএব বনের পথ তোমার নিতান্ত ক্লেশকর হইবে...।"[১৩] বনে বৃক্ষের শাখাচ্ছেদনকালে সত্যবানের শিরঃপীড়া শুরু হয়—"সহসা মাথায় / বিঁধিছে অযুত শূল।—দাঁড়ান না যায়।"[১৪] ফলে অন্তিম কাল ঘনিয়ে আসে। সাবিত্রী উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে, "কেন নাথ, হেন হ'ল?"[১৪]

পুরাণে নারীদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, "...রমণী তদ্রূপ সর্ব্বদা পতির অনুগামিনী হইবে।"[১৫] অতএব সত্যবানের মৃত্যু হলে সাবিত্রী শোকাতুরা হয়ে লতাবন্ধনে প্রাণত্যাগের চেষ্টা করে—তবে বনদেবীর বাধাদানে জীবনরক্ষা পায়। অনেকসময় সতীও পতিকে যমদূতদের হাত থেকে মুক্ত করে স্বর্গে নিয়ে যান। "যমদূতগণ

সতীকে দর্শন করিবামাত্র, সতীর পতি দুষ্কর্ম্মকারী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরে পলায়ন করে।"[১৫] তাদের বক্তব্য, "আমরা যমদূত; পতিব্রতাকে আসিতে দেখিয়া যেরূপ ভয় পাই, বহ্নি বা বিদ্যুৎ হইতেও আমাদের সেরূপ ভয় হয় না।"[১৫] এর সমর্থন মেলে রাজকৃষ্ণের 'পতিব্রতা'য়। সেখানেও যমদূতেরা সত্যবানকে নিতে এসে ভীত হয়ে ফিরে যায়, আবির্ভাব হয় স্বয়ং কৃতান্তের। তিনি সাবিত্রীর পতিভক্তিতে প্রীত হয়ে চারটি বর প্রদান করেন। দ্যুমৎসেনের হৃত রাজ্যপ্রাপ্তি, তাঁর দৃষ্টিশক্তি লাভ, অশ্বপতির শত সুকুমার এবং চতুর্থ বরে সত্যবানের শত সুত। পরিশেষে দেবারণ্যে তাদের উভয়কে যম আশিস্ দান করেন। নাট্যকার রাজকৃষ্ণ সংক্ষেপে কাহিনী বিবৃত করেছেন। মূলে এ-অংশ আরও বিস্তৃতভাবে বিন্যস্ত। সত্যবানের মৃত্যুর জন্য মহাভারতীয় সাবিত্রীর মানসিক প্রস্তুতি ছিল। আকস্মিক বিপদে সে বিচলিত হয়নি, লতাবন্ধনে প্রাণ বিসর্জনের চেষ্টাও করেনি। সেখানে কালান্তক যম স্বয়ং এসেছেন সত্যবানকে যমালয়ে নিয়ে যেতে। যমরাজ সত্যবানের প্রাণ নিয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলে সাবিত্রীও সেই দীর্ঘপথ তাঁকে অনুগমন করতে থাকেন। যম তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে বিফল হন—সাবিত্রীও সত্যবাক্যের সাহায্যে যমদেবের স্তব করে বরলাভ করেন। সাবিত্রী জানান, "ভগবান্ কৃতান্ত প্রসন্ন হইয়া আমার শ্বশুরের রাজ্য ও চক্ষুঃপ্রাপ্তি, পিতার একশত পুত্র, আপনার শত পুত্র এবং সত্যবানের চারিশত বৎসর আয়ু—এই পাঁচটি বর প্রদান করিলেন।"[১৬] সত্যবানের পুনর্জীবন লাভের পর যমের আবির্ভাব তাঁর স্মরণে এসেছে। তাঁরা উভয়ে একত্রে আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করেছেন। কারণ "প্রতাপবান ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে এইরূপ বর প্রদানপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।"[১৭] নাটকে কিন্তু যমরাজ তাঁদের দেবারণ্যে মিলিত হতে বলেছেন। নাটকে বনদেবী, যমদূত, বাসন্তিকা তরলিকা চরিত্রগুলি রাজকৃষ্ণের সংযোজন।

যেহেতু 'পতিব্রতা' গীতিনাট্য, তাই গানেই কাহিনীর মালা গাঁথা হয়েছে। নাটকের শেষে দেবারণ্যে নারদের গানে পাই—"ধরণীবাসিনী নারী শিরোমণি / পতিরতা সতী সাবিত্রী রমণী।"[১৮] বনদেবীর গানেও সতীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে—"ভারতভূমে ধন্য তুমি পুণ্যবতী পতিব্রতা।"[১৮] নাটকের প্রারম্ভে 'প্রস্তাবনা' অংশে নাটকের মূল বক্তব্য, 'পতিব্রতা-সাবিত্রী চারুকাহিনী' বর্ণনের উল্লেখ আছে। বাংলা দেশ ধর্মাচরণের দেশ, দময়ন্তী-সীতা-সাবিত্রী প্রমুখ ধর্মনিষ্ঠ, পুণ্যবতী রমণীর চরণস্পর্শে পবিত্রভূমিতে পরিণত। স্বভাবতই তাঁদের পুণ্যকথা লোকসমাজে আদৃত ছিল। রাজকৃষ্ণও তাই পতিব্রতারমণী সাবিত্রীর উপাখ্যান অবলম্বনে নাটক রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। সাবিত্রীর ভাবনায়, পতির পদ-ভজ যেন অমল-কমল। তাঁর মনে হয়েছে, "সতীর জীবন পতি, হৃদয়ভূষণ! / পতির

সেবায় সুখী সতীর জীবন। / কি ছার ত্রিদিব-পদ, যে পদ পতির পদ, / রমণীর সতী নাম / পতির কারণ।"[১৯] কিভাবে মৃত্যুর দুয়ার থেকে সত্যবানের জীবন সাবিত্রী ফিরিয়ে আনলেন, সে কথা জানাতে গিয়ে নানা কথায় ও সুরে তাঁরই মহিমা কীর্তিত হয়েছে। জীবনের এই দুঃখপূর্ণ আকস্মিক ঘটনায় শোকের ছায়া বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না, বরং পাতিব্রত্যের আলোকে তা আবৃত থেকে গিয়েছে।

নাটকের 'পরিশিষ্ট' থেকে জানা যায়, 'কোনো অবৈতনিক গীতাভিনয়-সমাজের অনুরোধে' গল্পটি বর্ধিতাকারে 'মৃত সঞ্জীবনী' নামে গদ্যাকারে রচিত হয়। গানের প্রাচুর্য নাটকটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

অনলে বিজলী ।। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত 'অনলে বিজলী' (প্রকাশকাল ৭ই এপ্রিল ১৮৭৮) রাজকৃষ্ণের প্রথম পঞ্চমাঙ্ক পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক রচনার প্রয়াস। সীতার অগ্নিপরীক্ষার কাহিনী নিয়ে পরবর্তীকালেও নাটক লেখা হয়েছে। বাঙালি দর্শকের কাছে এই কাহিনীর পরিণাম পূর্বপরিচিত হলেও তার আকর্ষণীয়তা কমে না। রাজকৃষ্ণের 'অনলে বিজলী' প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাট্যপ্রয়াস হিসাবে কিছুটা অপরিণত ও ত্রুটিপূর্ণ রচনা। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা ও ছন্দের অনুকরণ করেছেন নাট্যকার, কিন্তু সে ভাষা ও ছন্দ তিনি তখনও আয়ত্ত করতে পারেননি। ফলে সংলাপের ভাষা শুধু কৃত্রিম নয়, মাঝে মাঝে বক্তৃতার মতো শোনায়। ছন্দের মধ্যে প্রবাহ না থাকায় এবং সর্বদা চোদ্দ মাত্রার দৈর্ঘ্য রক্ষা করতে গিয়ে এমন এক অদ্ভুত কবি-ভাষা এখানে তৈরি করা হয়েছে, যা নাট্যসংলাপের পক্ষে ক্ষতিকর, যেমন নাটকের সূচনায় রামচন্দ্রের প্রথম উক্তি—

লঙ্কেশ রক্ষের, হায়, এ দশা নেহারি / রে লক্ষ্মণ, হর্ষ সহ বিষাদ-মুরতি / আজি নেত্র-পথে মোর অচলা হইয়া / দাঁড়ায়েছে ; ধ্রুব সহ তমস্বিনী, যথা।[২০]

অন্যদিকে রাজকৃষ্ণের পৌরাণিক নাটকের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 'অনলে বিজলী'র মধ্যেই দেখা গেল, যেমন মাঝে মাঝে স্বর্গ বা পাতাল দৃশ্যের অবতারণা (বরুণের জলপুরী বা স্বর্গে অগ্নিলোক ও সরস্বতীলোকের কল্পনায় মেঘনাদবধ কাব্যের প্রভাব থাকতে পারে), অলৌকিক ঘটনাবলীর সঙ্গে নাট্যকাহিনীর যোগসাধন, স্থূল হাস্যরসকে কমিক রিলিফ হিসাবে ব্যবহার যা অনেক সময় হয়ে উঠেছে গ্রাম্যতা-লক্ষণাক্রান্ত।

পৌরাণিক কাহিনীর নাট্যরূপ দেওয়ার সময় রাজকৃষ্ণ সাধারণভাবে মূল কাহিনীর বড়ো রকম পরিবর্তন ঘটান না, তবে নাটকের প্রয়োজনেই সিদ্ধরূপ অপরিবর্তিত রেখে সংযোজনের আশ্রয় নেন। রামায়ণ থেকে যেখানে তিনি কাহিনী গ্রহণ করেছেন সেখানে বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের প্রমাণ নাটকে থাকলেও, তাঁর প্রধান অবলম্বন কৃত্তিবাসী রামায়ণ। বলাবাহুল্য

বাল্মীকি-রামায়ণের অনেক কাহিনী লোকায়ত সংস্কারের প্রভাবে কৃত্তিবাসী-রামায়ণে পরিবর্তিত হয়ে গেছে,—রাজকৃষ্ণ সেই পরিবর্তনকে নাটকের পক্ষে অধিকতর উপযোগী বিবেচনা করেছেন। রাবণবধের পর বাল্মীকি-রামায়ণে বিভীষণের বিলাপ বর্ণিত হলেও রামচন্দ্রের বিলাপের উল্লেখ নেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণে শুধু বলা হয়েছে "বিভীষণ রোদনে শ্রীরাম দুঃখমন।"[২১] কিন্তু রাজকৃষ্ণের নাটকে প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে রামের দীর্ঘ বিলাপ সম্ভবত পরবর্তী দুঃখবহ ঘটনার পূর্বাভাস হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছে। বাল্মীকি-রামায়ণে মন্দোদরীর বিলাপ থাকলেও সীতাকে মন্দোদরীর অভিশাপের কথা নেই। রাজকৃষ্ণ এখানে কৃত্তিবাসের অনুসরণ করেছেন—"মন্দোদরী বলে শুন জনকনন্দিনী / তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী / পুরীসহ রাজারে বিনাশি কোপাগুণে / আনন্দে চলেছ তুমি রাম সম্ভাষণে / এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ / বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ।"[২২] শুধু মন্দোদরী নয়, লঙ্কার রাক্ষসরমণীরাও অভিশাপ দিয়েছে, "সুখেতে চলেছ তুমি রাম সম্ভাষণে / এককালে বিধবা হইনু সর্বজনে / অশুভ নয়নে রাম তোমারে দেখিবে / আমাদের বাক্য কভু খণ্ডন না হবে।"[২৩] রাজকৃষ্ণ এই অভিশাপের সঙ্গে যশোদেব, বরুণ, সরস্বতী ও অগ্নিদেবের পরিকল্পনাকে যুক্ত করেছেন, অর্থাৎ রামচন্দ্র যে সীতাকে অসতী বলে পরিত্যাগ করলেন, তার পিছনে সরস্বতীর প্রভাবে মন্দোদরীর মুখোচ্চারিত বাণী—"যার রূপ স্মরি, আপনা ভুলিলে / সে ও আজ সীতে! ভুলিবে তোমায় / অসতী-অসতী নির্ঘাত কথায়।"[২৪] আসলে রামচন্দ্রের নির্মম ব্যবহারের সমর্থনে রাজকৃষ্ণকে দেবদেবীর পরিকল্পনা এবং দৈববাণী সংযোজন করতে হয়েছে। বাল্মীকি-রামায়ণে রামচন্দ্রের অনেক কাজই আধুনিক দর্শকের কাছে আকস্মিক ও বিস্ময়কর মনে হবে। সীতার অগ্নিপরীক্ষার পূর্বে বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্র যে ভাষায় সীতাকে সম্ভাষণ করেন এবং সীতাকে পরিত্যাগ করেন তার একমাত্র কারণ বলা হয়েছে 'লোকাপবাদভয়'। কিন্তু এই লোকাপবাদের উদ্ভব কিভাবে কোথায় ঘটলো তা জানা যায় না। রাজকৃষ্ণের নাটকে রামচন্দ্রের মুখে অনুরূপ পরুষ বাক্য শোনা না গেলেও মূল বক্তব্য একই থেকেছে—"যাও ত্বরা হেথা হতে / যথা ইচ্ছা, তথা যাও—অবারিত পথ।"[২৫] অন্যদিকে রামচন্দ্র যেন আত্মবিস্মৃত অবস্থায় 'সীতারে অসতী' বলেছিলেন, পরে চৈতন্যলাভ করে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে চান। সব মিলিয়ে ঘটনার চমৎকারিত্ব নিশ্চয় দর্শককে বিস্মিত বিচলিত করতো, কিন্তু পুরাণ কাহিনী এখানে অনেকটা শ্রুতিতোষিণী লোকায়ত রূপ ধারণ করেছে। বলাবাহুল্য এর বীজ কৃত্তিবাসের মধ্যে ছিল, তবে রাজকৃষ্ণের পরিবর্ধন যেমন তাঁর মৌলিকতার পরিচয় তেমনি পুরাণ-কাহিনীর গাম্ভীর্য রক্ষায় অক্ষমতার নিদর্শন।

তারক-সংহার ॥ রাজকৃষ্ণের প্রথম দিকের পৌরাণিক নাটকগুলির কাহিনী পুরাণ থেকে গ্রহণ করা হলেও সেখানে ভক্তিরস পরিবেশনের কোনো চেষ্টা নেই। অন্যদিকে রাজকৃষ্ণের প্রায় সবগুলি পুরাণাশ্রয়ী নাটক ভাঙা-অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা বা গদ্য-পদ্য মিশ্রভাষায় লেখা, একমাত্র ব্যতিক্রম 'তারক-সংহার' (১৮৮০), যেখানে আগাগোড়া গদ্যসংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয়, 'হরধনুর্ভঙ্গ' লেখার আগে পর্যন্ত নাট্যসংলাপ ঠিক কি রকম হবে সে সম্বন্ধে তাঁর সংশয় ছিল। মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গদ্যে নাটক লিখেছেন, যদিও মধুসূদনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল গদ্যের পরিবর্তে পদ্যেই নাটক লেখা কাম্য।[২৬] রাজকৃষ্ণ যখন 'তারক-সংহার' লিখছেন তখনকার অন্যান্য নাটকের সংলাপের ভাষার সঙ্গে তার তুলনা করলে প্রশংসাই করতে হয়—

সকলে। আজ আর নিস্তার নেই, কোথায় পালাব। হায়, হায়, অমরাবতীতে আজ মৃত্যু স্বয়ং প্রবেশ করেচে। ভগবান্ রুদ্রদেব! রক্ষা কর! রক্ষা কর! ঐ এল—ঐ এল—পালা-পালা।...

তারক। এতক্ষণে বুঝলেম, বিধাতা তোমাকেই আমার মৃত্যুস্বরূপ করে সৃষ্টি করেচেন! ওঃ, বড় যন্ত্রণা! আমি ত চিরকালের জন্য চললেম! ওঃ, হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেছে! এই মৃত্যু-সময় আমি তোমার পরিচয় জেনে শেষ আশা—ওঃ ওঃ! নিদারুণ অস্ত্রপ্রহার—কে তুমি?[২৭]

প্রয়োজনমতো লঘু দৃশ্য রচনায় গদ্য-সংলাপের সহযোগিতা সে কালের অধিকাংশ নাটকে দেখা যায় (রাজকৃষ্ণের অন্যান্য নাটকের তুলনায় 'তারক-সংহারে' প্রগল্‌ভ লঘু কৌতুকের অবতারণা কম), কিন্তু গভীর ও গম্ভীর ভাব প্রকাশের জন্য গদ্যকে অনেক বেশি প্রকাশক্ষম হতে হয়। 'তারক-সংহারে'র মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাস ভালো জানা যায় না, ফলে গদ্যসংলাপের অভিনয়োপযোগিতা সম্বন্ধে আজকের দিনে মন্তব্য করা কঠিন। তবে নাটকের ঘটনাধারা দ্রুত অগ্রসর হয়েছে, চরিত্রগুলিও সজীব সপ্রাণ,—গদ্যসংলাপ মনে হয় নাটকটির মঞ্চসাফল্যের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করেনি।

তারকাসুরের কাহিনী মহাভারতে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।[২৮] বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় মৎস্যপুরাণে, শিবপুরাণে ও দেবী ভাগবতে। রাজকৃষ্ণ বিভিন্ন পুরাণ থেকে তারকবধের কাহিনী গ্রহণ করেছেন, তবে সেই সঙ্গে তাঁর স্বকীয় কল্পনার সংযোজনও লক্ষণীয়।[২৯] অন্যান্য পুরাণাশ্রয়ী নাটককে তিনি সাধারণত 'পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক নাটক' নামে অভিহিত করেছেন, 'তারক-বধ' কিন্তু তাঁর কাছে শুধুই 'নাটক'। অথচ 'নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ' প্রায় সকলেই পৌরাণিক চরিত্র, যথা—ইন্দ্র, কার্ত্তিকেয়, যম, পবন, অগ্নি, বরুণ, কুবের, নারদ, তারকাসুর, পার্বতী, দেবসেনা, শচী। ব্রহ্মার কাছ থেকে বরলাভের পর অপরাজেয়

তারকাসুর স্বর্গ অধিকার করে, এবং স্বর্গের দেবতারা সকলেই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়। তখন কার্ত্তিকেয়র সেনাপতিপদ গ্রহণ এবং "অনন্তর কুমার-কর নিক্ষিপ্ত তদীয় কেয়ূর-বরানুসারিণী সেই ভীষণ শক্তি দৈত্যের বজ্র ও শৈলেন্দ্রবৎ কর্কশ হৃদয় বিদ্ধ করিল। দৈত্যেন্দ্র গতাসু হইয়া প্রলয় কালীন ভূধরের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। দেহস্থ সমস্ত ভূষণ চতুর্দিকে বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। সেই দৈত্য নিহত হইলে, দেবগণ মধ্যে মহোৎসব প্রবৃত্ত হইল।"৩০ নাটকেও আমরা দেখি, কুবের, পবন, বরুণ, যম, অগ্নি ও ইন্দ্র অসুর-বিক্রমে ভীত ও সন্ত্রস্ত, অবশেষে কার্ত্তিকেয়র সাহায্যে তারকবধ। তবে 'তারক-সংহার' নাটকে দৈত্যসেনাপতি চণ্ডবিক্রমের ভূমিকা পৌরাণিক কাহিনীর সম্প্রসারণ। চণ্ডবিক্রমের দৈত্যরাজ-কন্যার প্রতি ভালোবাসা এবং নারদের চক্রান্তে চণ্ডবিক্রমের শোচনীয় পরিণতি তারকবধের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না। মনে হয় তারকাসুর যেন নাটকে যথেষ্ট প্রাধান্য পায়নি, ফলে শিবভক্ত তারকের শিবপুত্র কার্ত্তিকেয়র হাতে মৃত্যুবরণ যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে পারতো তা ঘটেনি। অন্যদিকে সুরমা ও শোভনাকে নিয়ে তারক যেন এক মধ্যবিত্ত গৃহকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ,—তারকাসুরের দৃঢ়তা ও পৌরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে দৈত্যসেনাপতি চণ্ডবিক্রম। তাই চণ্ডবিক্রমের পরিণাম যতটুকু ট্রাজিক সংবিদ্ জাগায় তারকাসুরের পরিণাম তা জাগায় না। নাট্যকার নাটকের সূচনায় শেক্সপীয়ারের ষষ্ঠ হেনরী নাটক থেকে দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন—

What is pomp, rule, reign, but earth and dust ?
And live we how we can, yet die we must.'৩১

তারকাসুর সম্বন্ধে সম্ভবত উক্তিটি প্রযোজ্য মনে হয়েছে তাঁর, কিন্তু এমন ধরনের আত্মচৈতন্যলাভের সুযোগ বা সম্ভাবনা দৈত্যাধিপতির মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।

বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থে ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদের নানা কার্যকুশলতার পরিচয় মেলে। তারকাসুরবধে নারদের ভূমিকা ছিল, কিন্তু রাজকৃষ্ণ যে-ভাবে নাটকের যাবতীয় ঘটনার নিয়ামকরূপে নারদের অবতারণা করেছেন তা অপৌরাণিক শুধু নয়, কিছুটা আপত্তিকরও বটে। নারদের গতিবিধি ও চক্রান্ত চমকপ্রদ সন্দেহ নেই, কিন্তু নারদকে এতটা গুরুত্ব দিলে কার্ত্তিকেয়র আর কোন প্রয়োজন থাকে না। তাছাড়া চক্রান্তপ্রিয় নীতিহীন চরিত্র হিসাবে যে ভাবে নারদকে উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে তাকে প্রায় দুর্বৃত্ত চরিত্র বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য এখানে নাটকের দুর্বলতা।

হরধনুর্ভঙ্গ ॥ রাজকৃষ্ণ রায় 'হরধনুর্ভঙ্গ' (প্রকাশকাল ১৮৮২ সালের ২৮শে জুলাই) নাটকটির ভূমিকায় জানিয়েছেন, "দুই-তিনজন সুদক্ষ অভিনেতার

অনুরোধে পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে এই 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকখানি লিখিত হইল।" 'হরধনুর্ভঙ্গ' গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনতিপূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। পরবর্তীকালে 'বীণা রঙ্গভূমি'তেও নাটকটির অভিনয়ের সংবাদ মেলে। ১৮৮৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর এবং ১৮৯০ সালের ১৫ই মার্চ 'হরধনুর্ভঙ্গ' বীণায় যথেষ্ট মঞ্চসাফল্য লাভ করে। যদিও তখন বীণার বিপর্যয় শুরু হয়ে গেছে, ফলে 'হরধনুর্ভঙ্গ' রাজকৃষ্ণ রায়ের সৌভাগ্যোদয় ঘটাতে সক্ষম হয়নি।

'পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক' রূপে চিহ্নিত 'হরধনুর্ভঙ্গ'-র কাহিনী আমাদের খুবই পরিচিত। নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলি পৌরাণিক। রাজকৃষ্ণ বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনী কোনো কোনো নাটকে গ্রহণ করলেও এক্ষেত্রে তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণেরই অনুসারী হয়েছেন। আদিকাণ্ডের কাহিনী অনুসরণে দশরথের রাজসভায় বিশ্বামিত্রের আগমন, যজ্ঞপণ্ডকারী রাক্ষসবধের উদ্দেশ্যে দশদিনের জন্য রামকে প্রার্থনা, দশরথের অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুত্রদান, পথে বিশ্বামিত্রের রাম-লক্ষ্মণকে মন্ত্রদান, সিদ্ধাশ্রমে যাত্রাকালে তাড়কা-বধ, মারীচকে শরাহত করে সমুদ্রগর্ভে ক্ষেপণ, মিথিলারাজ জনকের যজ্ঞ-দর্শনে গমন, যাত্রাপথে গঙ্গা অতিক্রম, গৌতমমুনির আশ্রমে পাষাণী অহল্যাকে রামের পদস্পর্শে শাপমুক্ত করা, মিথিলানগরীতে ধনুর্যজ্ঞ সভার বিস্তারিত বর্ণনা, রামের হরধনুর্ভঙ্গে সমর্থ হওয়া, রাম-সীতাকে লগ্নভ্রষ্ট করা, মিথিলার রাজান্তঃপুরে দশরথের চারপুত্রের বিবাহ, ক্রুদ্ধ পরশুরামের আগমন এবং অবশেষে রামের চরণে আত্মসমর্পণ—এভাবেই নাট্যকাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে।

তবে কিছু ক্ষেত্রে রাজকৃষ্ণ কৃত্তিবাসী কাহিনীর পরিবর্জন, পরিবর্তন, এমনকি কোনো স্থানে বা নতুন কাহিনী সংযোজন করেছেন। যেমন, লঙ্কেশ্বরের নিধনের কারণে রাম-সীতার বিচ্ছেদ প্রয়োজন, তাই বিবাহকালে তাদের লগ্নভ্রষ্ট করতে দেবতারা যুক্তি করে চন্দ্রকে জনকের ঘরে পাঠান—"নর্ত্তক হইয়া তবে যাও শশধর।"[৩২] কৃত্তিবাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে রাজকৃষ্ণ নাটকে ইন্দ্রের অনুরোধে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে পাঠিয়েছেন রাম-সীতাকে লগ্নভ্রষ্ট করতে—"নাহি হবে রাবণ সংহার; / নাহি রবে ইন্দ্রত্ব আমার। / যাও ত্বরা, বিবাহের লগ্নভ্রষ্ট কর সুকৌশলে।"[৩৩] এবং বিশ্বকর্মা 'ষড়্-ঋতু-প্রতিমূর্তি' দেখিয়ে সকলকে বিস্ময়বিমূঢ় করে নিজ উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। প্রস্তরীভূতা অহল্যাকে চরণস্পর্শে পাষাণমুক্ত করার কালে রামের মনে ভস্মীভূত হওয়ার যে শঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে, তা একান্তই নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনা। পরশুরামের কাহিনীকে রাজকৃষ্ণ অনেকটা বিস্তৃত করেছেন নাট্যপ্রয়োজনে। রামের প্রতি পরশুরামের আত্মনিবেদনের পূর্বে অনেক তর্ক-বিতর্ক, বাগ্‌যুদ্ধ হয়েছে নাটকে—যা কৃত্তিবাসে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

নাটকে বেশ কিছু কাহিনীতে রাজকৃষ্ণ স্বকীয় চিন্তা-কল্পনারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কৃত্তিবাসের অনুসরণ না করে এই কাহিনীগুলি সংযোজিত হয়েছে।

সিদ্ধাশ্রমে যাত্রাকালে অনঙ্গাশ্রম দর্শন, সুবাহু বধ, মারীচকে শরাহত করে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপণ, গঙ্গার রামস্তুতি, বিশালাধিপতি সুমতির গৃহে আতিথ্যগ্রহণ—সব কিছুই নাট্যকারের স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। কিন্তু নাটক রচনাকালে রাজকৃষ্ণ কোনো কোনো স্থানে কৃত্তিবাসের আক্ষরিক অনুসরণ করেছেন।

সরযূর তটে বিশ্বামিত্র যখন রাম-লক্ষ্মণকে ক্ষুধাতৃষ্ণাহারী মন্ত্রদান করলেন, তখন কৃত্তিবাসের বিশ্বামিত্র তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—"তোমারে সুমন্ত্র দীক্ষা করাইব আমি। / শোক দুঃখ কখন না পাইবা অন্তরে। / ক্ষুধা তৃষ্ণা না হইবে সহস্র বৎসরে॥ / করিলেন রামচন্দ্র সে মন্ত্র গ্রহণ। / রামেরে কহিতে তাহা শিখিল লক্ষ্মণ॥"[৩৪] রাজকৃষ্ণের বিশ্বামিত্র বলেন—"বলা-অতি-বলা মন্ত্র করহে গ্রহণ। / এ দুই মন্ত্রের তেজে / বহু পর্য্যটনে নাহি হবে শ্রমবোধ, / নাহি হ'বে রূপবিপর্য্যয়, / নাহি হ'বে জ্বর বা যন্ত্রণা, / নাহি হ'বে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লেশ ; / নিদ্রিত অথবা কোন কার্য্যের সময় / অসতর্ক থাকিলেও, / নিশাচরগণ না পারিবে অনিষ্ট সাধিতে।"[৩৫] অথবা, তাড়কা-বধের পূর্বে সিদ্ধাশ্রমে যাওয়ার পথ-নির্বাচন কালে কৃত্তিবাসের বিশ্বামিত্র রামকে বলেন—"এই পথে যাই ঘর তৃতীয় প্রহরে। / এই পথে তিনদিনে যাই মম ঘরে॥ / তিন প্রহরের পথে কিন্তু ভয় করি। / তাড়কা রাক্ষসী আছে মহা ভয়ঙ্করী॥"[৩৬] রাজকৃষ্ণে পাই—"এই পথ দিয়া যদি যাই, রঘুবর! / তিন দিবসের পথে সিদ্ধাশ্রম মম, / ওই পথ দিয়া যদি যাই, / কালি প্রাতে পাইব আশ্রম। / কিন্তু বড় ভয় ভাবি ও পথে যাইতে। /...তাড়কা নামেতে এক দুষ্টা নিশাচরী / কণ্টক ও পথিমাঝে!"[৩৭] রামের শিবধনু ভঙ্গ করার অপরাধে ক্রুদ্ধ পরশুরামের আবির্ভাবে ভীত রাম ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বলেন, "দোষ ক্ষমা কর প্রভু তপস্বী ব্রাহ্মণ,"[৩৮] তখন নাট্যকারের রাম একইভাবে ক্ষমাভিক্ষা করেন, "দোষী আমি, ক্ষমা কর মোরে, ক্ষমা কর।"[৩৯] শেষে রামের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে কৃত্তিবাসের পরশুরাম বলেন, "চিনিলাম তোমারে যে তুমি নারায়ণ।"[৪০] আর রাজকৃষ্ণের পরশুরাম বলেন, "গুরুবাক্য হইল স্মরণ,—/ তুমি দেব বিষ্ণু-নারায়ণ বৈকুণ্ঠের পতি!"

কৃত্তিবাস কাহিনীকে প্রলম্বিত করে পুত্র-পুত্রবধূ-সহ দশরথের অযোধ্যা-প্রত্যাবর্তনে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। রাজকৃষ্ণ কিন্তু নাটকীয় মুহূর্তটি ধরে রাখার জন্য পরশুরামের রামপদে আত্মনিবেদন এবং রাম-সীতার সমবেত জয়গানের মধ্য দিয়ে নাটক শেষ করেছেন।

'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের গঠন-আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন—কাহিনীগ্রন্থনে ত্রুটি আছে। একটি কেন্দ্রীয় নাট্যদ্বন্দ্বকে আশ্রয় করেই নাটক রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে-কাহিনীর প্রয়োজনে বা স্পষ্টতার জন্য সংক্ষিপ্ত নানা ঘটনা সংযোজিত হতে পারে। কিন্তু নাটকের মূল কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে একাধিক

স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী কখনই থাকতে পারে না। জনকরাজার সভায় রামের হরধনুর্ভঙ্গের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে আরও বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র কাহিনী সেই সূত্রে নাটকের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছেন নাট্যকার। তাড়কা বধ, অহল্যার শাপমুক্তি বা পরশুরামের ক্রোধ প্রত্যেকটি কাহিনী নিয়েই স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করা সম্ভব ছিল। একই নাটকে একাধিক নাট্যকাহিনীর বীজ নিহিত হওয়ার ফলে নাট্য-ঐক্য ব্যাহত হয়েছে। অতিকথন দোষে দুষ্ট হয়েছে নাটক। সর্বোপরি মনে রাখা প্রয়োজন নাটকের নামকরণ করা হয়েছে—'হরধনুর্ভঙ্গ', কিন্তু পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটকে প্রথম তিনটি অঙ্কের সঙ্গে হরধনুর্ভঙ্গের কোনো সম্পর্ক নেই।

শুধুমাত্র ধনুর্ভঙ্গের কাহিনীই মঞ্চোপরি যথেষ্ট চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল। তবে নাট্যকারের সম্ভবত মনে হয়েছে, এই সুযোগে রাম-কাহিনীর আরও কিছু অংশ বিবৃত করলে নাটকের আকর্ষণীয়তা বাড়বে। সে কালের দর্শক-মনোরঞ্জনের কথা ভেবে একই সঙ্গে একাধিক পৌরাণিক কাহিনীকে রঙ্গমঞ্চে তুলে ধরতে চেয়েছেন—নাট্যচমক, বিস্ময়, নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করার লোভটুকু সংবরণ করতে পারেননি। পরিমিতিবোধের অভাব এখানে দেখা যাবে।

রাম শৈবধনু অনায়াসে ভেঙে ফেলে যে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাতে শুধু যে রামের দৈহিক বলবীর্যেরই পরিচয় মিলেছে তা নয়, সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অলৌকিক ঐশীশক্তি। রাম যে মানবরূপী নারায়ণ, সে সত্য বিশ্বাস-যোগ্য করাতে গিয়ে রাজকৃষ্ণ হরধনুর্ভঙ্গের সূত্র ধরে রামের আরও নানা বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এবং এভাবেই দর্শক-পাঠকের মনে ভক্তিরস সঞ্চারিত করেছেন। স্ত্রীহত্যার ভয়ে ভয়ঙ্করী তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করতে প্রথমে রাম সম্মত না হলেও শেষপর্যন্ত রামের শরাঘাতে তার মৃত্যু, পাষাণী অহল্যার রামের চরণস্পর্শে নবজীবন লাভ, রুদ্রমূর্তি ভার্গবের চাঞ্চল্যের অবসান, অথবা রামের শরক্ষেপণে পরশুরামের স্বর্গের গতিপথরোধ—সে কালের দর্শকের কাছে রামকে মহামানবে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করেছে।

নাট্যকাহিনীর কেন্দ্রচ্যুতি ত্রুটি বলে পরিগণিত হলেও রাজকৃষ্ণের পৌরাণিক নাট্যরচনার যে মুখ্য উদ্দেশ্য—ভক্তিরস পরিবেশন, তাতে তিনি সাফল্য লাভ করেছেন। 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকে রাজকৃষ্ণ প্রথম 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ' ব্যবহার করেন—বাংলা নাট্যসংলাপের ক্ষেত্রে এই ছন্দের বিশিষ্ট ভূমিকা অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।[৪১]

রামের বনবাস ।। বাল্মীকি-রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথম ৬৫টি সর্গে বর্ণিত হয়েছে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের প্রস্তুতি, কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামের বনবাস, পরিণামে দশরথের মৃত্যু। রাজকৃষ্ণ রায় 'রামের বনবাস' (১৮৮২ সালের ১৫ই

আগস্ট প্রকাশিত) নাটকটি রচনাকালে শুধু কাহিনী পরিকল্পনায় নয়, বর্ণনা ও সংলাপেও অধিকাংশস্থলে বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণ করেছেন। ছাব্বিশটি দৃশ্যে পরিব্যাপ্ত পঞ্চাঙ্ক নাটকে দশরথ-কৌশল্যা, কৈকেয়ী-সুমিত্রা, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা -উর্মিলা, বশিষ্ঠ-বামদেব-সুমন্ত্র, মন্থরা প্রভৃতি চরিত্রগুলি পাই। এ ছাড়া ইন্দ্রাদি দেবতা, ঋষি, সভাসদ্, প্রজা, ভৃত্য, চিত্রপট-বিক্রেতা, বাদ্যকার, বালক, সরস্বতী, গন্ধর্বকন্যা, অযোধ্যাবাসী, দাসী প্রভৃতি পার্শ্বচরিত্রগুলির দেখা মেলে।

'রামের বনবাস' নাটকে দেখি দশরথ রামকে জানান—"দেব-ঋষি-পিতৃ-বিপ্র-আত্মঋণ হ'তে / করিয়াছি মুক্তিলাভ ; / একটি কর্ত্তব্য কার্য্য বাকী আছে মোর ; / এবে সে কর্ত্তব্য আমি ইচ্ছি করিবারে / মম রাজ্যে অভিষেক করিয়া তোমারে।"[৪২] কিন্তু তাঁর এই অভিলাষ অপূর্ণ থাকে কৈকেয়ীর বিরূপতায়। কৈকেয়ী চরিত্র-পরিকল্পনায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একদা পিতৃগৃহে ব্রাহ্মণকে ব্যঙ্গ করায় কৈকেয়ীকে ব্রহ্মশাপ স্পর্শ করে।[৪৩]—"ত্রিভুবনে কৈকেয়ীর গাহিবে অযশ।"[৪৪] তবে সেই 'ব্রহ্মবাক্য সিদ্ধ' করতে 'অসাধে সাধিতে হেন কাজ' দেবতাদের অনুরোধে সরস্বতীকে কৈকেয়ীর জিহ্বায় অবস্থান করার বর্ণনা আধুনিক নাট্যকারের সংযোজন।

কৈকেয়ীর আচরণে নীচতা প্রকাশ পেলেও তার প্রতি নাট্যকারের কোনও বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায়নি। রামের বনবাসের পর কৈকেয়ীর অনুতাপ এবং দশরথের তার প্রতি ক্রুদ্ধ ব্যবহার কৃত্তিবাস থেকে নেওয়া (৫/৩)। কৈকেয়ী রাজকৃষ্ণের নাটকে দৈবচালিত ভাগ্য-লাঞ্ছিতারূপে চিত্রিত ; সম্ভবত শেকস্পীয়রের ট্রাজেডি নাটকের নায়ক-নায়িকার আদর্শে মনোবিকার তাকে কল্পিত ভীতিদৃশ্যের সম্মুখীন করেছে (৫/২)। বাংলা পৌরাণিক নাটকে পরিচিত চরিত্রের এই রকম রূপান্তর শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, সিদ্ধরসের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে চরিত্রকে নবজন্মদান নাট্যকারের সৃষ্টিনৈপুণ্যের পরিচয়।

পৌরাণিক নাটকে প্রধান চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে মৌলিকতা প্রদর্শনের সুযোগ কম, রাজকৃষ্ণ তাই পার্শ্বচরিত্রের উপর কিছুটা বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। 'রামের বনবাস' নাটকে এদিক থেকে সবচেয়ে স্মরণীয় চরিত্র লক্ষ্মণপত্নী উর্মিলা। চিরকালের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' উর্মিলার জীবনের আনন্দ-বেদনা, পতি-প্রীতি, ভক্তি-বাৎসল্য রাজকৃষ্ণের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি নিজে তা উপলব্ধি করেছেন, পাঠক-দর্শকেরও সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। বনবাস-যাত্রাকালে উর্মিলা লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করে জানায়, "সীতারামে বনবাসে তুমিত সেবিবে কে সেবিবে তোমারে, প্রাণেশ, / দাসী যদি নাহি রহে পাশে ?"[৪৫] লক্ষ্মণ এ-প্রস্তাবের অসম্ভাব্যতার কথা বললে, উর্মিলা তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে নিজ সমস্যা স্মরণ করেছে—"একদিকে পতি বনবাসী, / অন্যদিকে শ্বশ্রূ দোঁহে ভাসে অশ্রু নীরে,

/ এ অভাগী মধ্যে পড়ি, আকুল পরাণ। / কেন বিধি সাধিল এ বাদ নাথ!"[৪৫] সীতা-সহোদরা তথা জায়া-উর্মিলার অন্তরচিত্র রাজকৃষ্ণ-লেখনীতে দক্ষতার সঙ্গে ধরা পড়েছে।

'রামের বনবাস' পৌরাণিক নাটক হলেও ভক্তিরস পরিবেশনের কোনো প্রয়াস এখানে দেখা যায় না। রাজকৃষ্ণ পৌরাণিক নাটক রচনার প্রথম পর্যায়ে পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে অন্তত অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে মানবরস সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। রামের বনবাস-ঘটনা দর্শককে অভিভূত করে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেখানেই নাটকের সমাপ্তি ঘটেনি—কিছু পরের ঘটনা 'দশরথের মৃত্যু' অন্তিম দৃশ্যে চরম নাট্যমুহূর্ত রচনা করেছে। রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে 'শৃঙ্গবের পুরী'তে রেখে সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের পর দশরথের শোক, অন্ধমুনির অভিশাপ স্মরণ এবং মৃত্যুবরণের কাহিনী বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস প্রায় একইভাবে বিবৃত করেছেন, তবে বাল্মীকি-রামায়ণে অন্ধমুনির পুত্রবধের কাহিনী কিছু সবিস্তারে বর্ণিত। বাল্মীকি-রামায়ণে দশরথের মৃত্যু ঘটনা-ধারার অনিবার্য পরিণাম হলেও অত্যন্ত সংযতভাবে স্বল্পকথায় তথ্য হিসাবে তা পরিবেশিত—"রাজা দশরথ কৌশল্যা ও সুমিত্রার সমক্ষে এইরূপ পরিতাপ করিয়া, রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইলে প্রাণত্যাগ করিলেন।"[৪৬] কৃত্তিবাসী রামায়ণে মৃত দশরথকে নিদ্রিত মনে করায় নাটকীয়তা সৃষ্টি হলেও মৃত্যুর ভাবগাম্ভীর্য সেখানে রক্ষিত হয়নি। "হা রাম বলিয়া ত্যজিল জীবন / নিদ্রা যায় দশরথ হেন লয় মন /... দুই দণ্ড বেলা হয় সূর্যের উদয় / এতক্ষণ নিদ্রা যায় রাজা মহাশয় / অনন্তর রাজারে করিল মৃতজ্ঞান / নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহি তাঁর প্রাণ।"[৪৭] তুলনায় রাজকৃষ্ণ দশরথের মৃত্যুবর্ণনায় একই সঙ্গে সংযমরক্ষা ও তীব্রতা সঞ্চারে সক্ষম হয়েছেন— "দেবি! / প্রাণ যায়—প্রাণ যায়! অহো! / বাক্য নাহি সরে আর, / অন্ধকার—অন্ধকার! যাই যাই! / অন্ধক মুনির শাপ / সহস্র ভুজঙ্গ-দেহ ধরি' / দংশি'ছে হৃদয়! / অদোষে বধিনু পুত্র তাঁ'র, / তেঁই পুত্রশোকে অন্ধ তপোধন / মরিবার কালে দিলা মর্মান্তিক অভিশাপ,—/'মোর মত পুত্রশোকে / তুমিও মরিবে, দশরথ!' / অব্যর্থ ব্রাহ্মণ-বাণী, / মরিনু মরিনু পুত্রশোকে, / ওঃ! অসহ্য শোকের ব্যথা! / গেল—গেল! ওঃ! প্রাণ গেল রে! / রাম নাম শুনা রে আমায়, / হা রাম! হা রাম! হা-রা-ম!"[৪৮]

যদুবংশধ্বংস ।। 'যদুবংশধ্বংস' (১৮৮৪) রাজকৃষ্ণের 'পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক নাটক'গুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দাবি করতে পারে। এখানে পূর্ণাঙ্গ পঞ্চমাঙ্ক নাটকের কাহিনী-বিস্তার যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনি নাট্যবস্তু অনেক পরিমাণে একমুখী হওয়ায় ঘটনাগত ঐক্য রক্ষা করা গেছে। অন্যদিকে ভক্তিরসের প্লাবনে নাটকের ভরাডুবি হয়নি, অথচ নাট্যকারের কৃষ্ণমহিমা প্রচারের উদ্দেশ্য

সফল হয়েছে। স্বর্গ ও মর্ত্যের যোগসাধনের জন্য অন্তিম দৃশ্যে অর্জুন সাময়িক-ভাবে 'দিব্যচক্ষু' লাভ করে গোলোকধামে কৃষ্ণদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু তারপর বেদব্যাসের 'ঐন্দ্রজাল-লীলা'র অবসানে মর্ত্যে আবার ফিরে এসেছেন। তবু পৌরাণিক নাটকে "না পারি বুঝিতে / স্বর্গ মর্ত্য ভেদাভেদ কিবা"[৪৯]—এ কথা এমনই সত্য যে, শুধু কালপুরুষের সক্রিয় ভূমিকা নয়,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, বরুণ, পবন, কুবের, যম প্রভৃতি 'দেবগণ' এবং লক্ষ্মী, মায়া প্রভৃতি দেবীদের মঞ্চে উপস্থিতি কখনো খুব অবাস্তব বলে মনে হয় না। আসলে নাট্যকার পৌরাণিক আবহাওয়া সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন, এবং সেখানেই 'যদুবংশধ্বংসে'র সবিশেষ গুরুত্ব।

'যদুবংশধ্বংসে'র কাহিনী মহাভারতের 'মৌসলপর্ব' থেকে নেওয়া হয়েছে। মহাভারতীয় বৃত্তান্ত অনুসরণে নাট্যকার দ্বিতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে দেখিয়েছেন, যাদবেরা "দৈবদুর্বিপাকবশতঃ শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের [মহাভারতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও তপোধন নারদ। নাটকে দুর্বাসা] নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, 'হে মহর্ষিগণ! ইনি অমিতপরাক্রম বভ্রুর পত্নী। মহাত্মা বভ্রু পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব আপনারা বলুন, ইনি কি প্রসব করিবেন?' সারণ প্রভৃতি বীরগণ এই কথা কহিলে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ আপনাদিগকে প্রতারিত বিবেচনা করিয়া রোষভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'দুর্বৃত্তগণ! এই বাসুদেবতনয় শাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশবিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুসল প্রসব করিবে। ঐ মুসলপ্রভাবে মহাত্মা বলদেব ও জনার্দন ভিন্ন যদুবংশের আর সকলেই এককালেই উৎসন্ন হইবে।"[৫০] মুসল চূর্ণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার কথা মহাভারতে বলেছেন নরপতি উগ্রসেন; নাটকে দেখি কৃষ্ণ বলেছেন, "এ মুসল লয়ে যাও প্রভাসের তীরে / শিলায় ঘষিয়া ফেল রে ধুইয়া / ঘরষিত রেণুরাশি। / প্রভাসতীর্থের মহিমায় / হয় তো ব্রাহ্মণশাপ মোচন হইবে।"[৫১]

'যদুবংশধ্বংস' নাটকে কালপুরুষ ধ্বংসের প্রতিমূর্তি রূপে উপস্থিত। নাটকের সূচনাতেই কাহিনীর পরিণাম আভাসিত হয়েছে—"বালুকার কণা নাহি যায় গণা / যদুবংশ বাড়িল তেমন; / শ্রীকৃষ্ণের বংশ কিসে করি ধ্বংস?"[৫২] মহাভারতে দেখি, মুসল প্রসবের পর "বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ এইরূপে সাবধান হইয়া অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলে, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ মুণ্ডিতশিরা বিকটাকার কালপুরুষ প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের গৃহে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কোন কোন সময়ে ঐ পুরুষকে দেখিতে পাইতেন এবং কখন কখন তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতেন। ঐ পুরুষ দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই তাঁহারা তাঁহার প্রতি অসংখ্য শরনিক্ষেপ করিতেন; কিন্তু কোন রূপেই তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারিতেন না।"[৫৩]

তবে নাটকে কৃষ্ণমহিমা বাড়ানোর জন্য কালপুরুষকে কৃষ্ণের আজ্ঞাবহ করা হয়েছে, তা না হলে কালপুরুষের কার্যকলাপ মহাভারতানুসারী। 'যাদব-নরনারীর দুর্লক্ষণ দুঃস্বপ্ন-দর্শন'-এর মহাভারতীয় ইঙ্গিতকে নাট্যকার সুকৌশলে রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতির আশঙ্কা-ভীতি প্রকাশে কাজে লাগিয়েছেন। প্রভাসযাত্রা ও মদ্যপানমত্ততা মহাভারতেও বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে কৃষ্ণ নিজে যদুবংশ ধ্বংসে হাতে অস্ত্র গ্রহণ করেছেন, "ঐ সময় মহাত্মা মধুসূদন কালের গতি পরিজ্ঞাত হইয়া মুষলীভূত এরকা গ্রহণপূর্ব্বক সেই ঘোরতর হত্যাকাণ্ড দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমক্ষেই এরকাঘাতে শাম্ব, চারুদেষ্ণ, অনিরুদ্ধ ও গদের প্রাণবিয়োগ হইল। তখন তিনি স্বচক্ষে তাঁহাদের মৃত্যু দর্শন করিয়া কোপাবিষ্টচিত্তে তত্রত্য সমুদয় বীরের প্রাণসংহার করিলেন। ঐ সময় মহাত্মা বভ্রু ও দারুকমহামতি মধুসূদনের সমীপে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা সেই বীরসমুদয়কে নিহত দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'জনার্দন! এক্ষণে ত আপনি অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন। অনন্তর চলুন, আমরা তিন জনে মহাত্মা বলভদ্রের নিকট গমন করি।"[৫৪] বিষ্ণুপুরাণেও দেখি, "ক্রমেতে বিষম কাণ্ড হইয়া উঠিল / কেহ বা কাহার পরে প্রহার করিল / যেই কালে ঘোর কাণ্ড হইল ঘটন / আপনিই কৃষ্ণচন্দ্র হরে ক্রোধমন / এক মুষ্টি কর়কার বৃক্ষ হস্তে লৈয়া / মারিলা সবার পরে হেলন করিয়া / দৈবের যে কার্য তাহা কে করে খণ্ডন / তাহাতেই সর্ব যদু হইল নিধন।"[৫৫] নাটকে শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র, যাদবদের আত্মঘাতী ধ্বংসোন্মাদনা দেখে তিনি শুধু মন্তব্য করেন, "পুত্রগণ রুষিল সহসা, উচিত না হয় মোর হেথা অবস্থান।" (৪/১) এবং তারপর সেখান থেকে প্রস্থান করেন।

বলরাম চরিত্রটিকে নাট্যকার নিজের প্রয়োজনে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন। মহাভারতে বা ভাগবতে বলরামের দেহত্যাগের বর্ণনা থাকলেও যদুবংশধ্বংসকালে তাঁর অস্থিরতা বা উত্তেজনার কথা পাই না। নাটকে শ্রীকৃষ্ণের আত্মসমাহিত সংযত মূর্তির পাশে বলরামের দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ চিত্তচাঞ্চল্য শুধু বৈপরীত্য সৃষ্টি করেনি, নাটকীয় চরিত্র হিসাবে বলরামকে আকর্ষণীয়তা দান করেছে।

যদুবংশধ্বংস এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের কাহিনী ভাগবতেও (প্রথম ও একাদশ স্কন্ধ) বর্ণিত হয়েছে। নাট্যকার শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান-দৃশ্য-কল্পনায় ভাগবতের অনুসরণ করেছেন—"বলরাম মনুষ্যলোক ছেড়ে নিজধামে চলে গিয়েছেন দেখে দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শোকে মগ্ন হয়ে একটি অশ্বত্থগাছে হেলান দিয়ে নীরবে বসে রইলেন। ...পদ্মের মত রক্তিম বাম পাখানি ডান উরুর উপরে রেখে শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষমূলে বসে-ছিলেন। সেই সময় জরা নামে এক ব্যাধ মুষলের ক্ষয়ে যাওয়া লোহার টুকরো দিয়ে বাণ তৈরী করে[৫৬] হরিণ মারবার আশায় ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে ঐ বনে এসে উপস্থিত হল। দূর থেকে দেখে সে শ্রীভগবানের পাদপদ্মকে হরিণ বলে ভুল করল

এবং তার তীরে সেই চরণ বিদ্ধ করল।"[৫৭] জরা নামে ব্যাধকে শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস এবং আশীর্বাদ, ব্যাধের বিমানে চড়ে স্বর্গযাত্রা ইত্যাদি নাটকেও বর্ণিত হয়েছে। 'দেবকী, রোহিণী আদি বসুদেব-পত্নীচতুষ্টয়ের পতির চিতায়' প্রাণ দান, রুক্মিণীর মৃত্যুবরণ, সত্যভামার সন্ন্যাসগ্রহণ—সবই পুরাণ কাহিনীর অনুসরণ করেছে।

তবে উনিশ শতকের নাট্যকার, নবীনচন্দ্র সেনের মতো 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' রচনা না করলেও, আধুনিক চিন্তাভাবনার প্রক্ষেপ সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেননি। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলরামকে যদুবংশ-ধ্বংসের প্রয়োজনের কথা বোঝান, তখন তাঁর কথায় যেন টমাস রবার্ট মালথাসের (১৭৬৬-১৮৩৪) ***Essay on Population*** (১৭৯৮) গ্রন্থের প্রতিধ্বনি শোনা যায়—[৫৮] "যত দূর প্রয়োজন, / তার চেয়ে বেশি ভাল নয়, / বেশি হলে কর তারে ক্ষয়,—/ শাস্ত্রের বচন। / আধার আধেয় যদি সমান না হয়, / বিভ্রাট ঘটয়। / পৃথিবীর অবস্থা বুঝিয়া জীব থাকা চাই ; / লোকাধিক্যে ঘটয় উৎপাত / দুর্ভিক্ষ সঞ্জাত, গৃহবিসম্বাদ, / দারিদ্র্য-পীড়ন, যন্ত্রণা-ভীষণ, / নানাবিধ দুর্বিপাক ঘটে ; / নিয়মের শৃঙ্খলার পটে / বিশৃঙ্খলা-জ্বালা বড় বাড়ে।"[৫৯] কারো মনে হতে পারে রাজকৃষ্ণ পৌরাণিক নাটককে আধুনিক তাৎপর্যদানের প্রয়োজনেই 'যদুবংশধ্বংস' রচনা করেন এবং এখানেই নাটকটির সার্থকতা।

তরণীসেন বধ ।। 'তরণীসেন বধ' নাটক মঞ্চে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে। ১৮৮৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগেই নাটকটির একাধিক অভিনয়ের খবর মেলে। তবে প্রথম অভিনয় কবে কোথায় হয়েছে জানা যাচ্ছে না। বীডন স্ট্রীটে ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৮২ সালে 'তরণীসেন বধ' অভিনীত হয়েছিল এমন কথা জানিয়েছেন সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়।[৬০] শরচ্চন্দ্র দেব যখন লেখেন, "তিনি গ্রেট ন্যাশানালে 'তরণীসেন' দিলে উহার অভিনয় এরূপ সুন্দর হইয়াছিল যে শুনিয়াছি দুদিন বঙ্গরঙ্গভূমিকে দর্শকাভাবে অভিনয় বন্ধ করিতে হইয়াছিল।"[৬১] তখন মনে হয় ন্যাশনাল থিয়েটারকেই তিনি গ্রেট ন্যাশনাল বলে অভিহিত করেছেন কারণ ১৮৭৭ সালের পর গ্রেট ন্যাশনালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। তবে ১৮৭৭ সালের আগে যদি 'তরণীসেন বধে'র অভিনয় হয়ে থাকে তাহলে শরচ্চন্দ্র দেবের উক্তির সত্যতা স্বীকার করতে হয়। গিরিশচন্দ্রের ন্যাশনাল থিয়েটার ত্যাগের পর ১৮৮৩ সালে সেখানে 'তরণীসেন বধে'র অভিনয় হয়েছিল এমন কথাও আমরা জানতে পারি—"সশিষ্য গিরিশচন্দ্রের প্রস্থানের পর অবশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে এখানে রাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত 'তরণীসেন বধ' অভিনয় হয়েছে। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) সাজলেন তরণীসেন। মহেন্দ্রলাল বসু ও মতিলাল সুর যথাক্রমে রাম এবং রাবণের ভূমিকা গ্রহণ করলেন।"[৬২]

পৌরাণিক চরিত্রাশ্রয়ী ভক্তিমূলক নাটক রাজকৃষ্ণ রায় সংখ্যায় অনেক লিখলেও সর্বত্র ভক্তিভাবের যথার্থ প্রকাশ ঘটেনি। কিন্তু তাঁর 'তরণীসেন বধ' নাটকে তরণী এবং তার সহধর্মী চরিত্রগুলির মাধ্যমে রামের মাহাত্ম্য প্রচারে তিনি সফলতা অর্জন করেছেন।

বাল্মীকি-রামায়ণে অনুপস্থিত ঘটনাকে কৃত্তিবাস কবিকল্পনার সাহায্যে রূপদান করেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত 'তরণীসেনের যুদ্ধ ও পতন' কাহিনী আশ্রয়ী নাটক রাজকৃষ্ণের 'তরণীসেন বধ'। রক্ষঃবংশীয় হয়েও রামের প্রতি অবিচল ভক্তি ও নিষ্ঠা তরণীকে স্বতন্ত্র মহিমা দান করেছে। বৈকুণ্ঠ লাভের আকাঙ্ক্ষায় তরণীর চিত্ত রামের শরে মৃত্যুবরণে ব্যাকুল। তার জীবনের অন্তিম প্রহর কিভাবে ঘনিয়ে এল, সে-কথাই এ কাহিনীতে জানতে পারা যায়।

রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে মকরাক্ষের মৃত্যু হলে তরণীসেনকে সৈনাপত্যদানের প্রশ্ন ওঠে। কৃত্তিবাসের রাবণ তরণীকে বলেন, "রাখহ রাক্ষসকুল বৈরিগণে মারি।"[৬৩] তরণী যুদ্ধযাত্রায় সম্মত হলে "রণসাজে সাজাইয়া দিল দশানন।"[৬৩] নাটকে তরণীর প্রতি জ্যেষ্ঠতাত রাবণের স্নেহ-উৎকণ্ঠা প্রকাশিত। কিন্তু সেইসঙ্গে তরণীসেনের প্রতি ইন্দ্রজিতের বিদ্বেষবুদ্ধি নাট্যদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সাময়িক উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে। রাবণ নিজে যুদ্ধযাত্রায় উদ্যোগী হলে ইন্দ্রজিৎ নিবেদন করেন, "নরবানরের রণে / পাঠাও তরণীসেনে।"[৬৪] কারণ "তরণী দুর্বলশিশু যুদ্ধ নীতিহীন" নন, আর 'বীরের বীরত্ব' সংকটসময়ে পরীক্ষা করাই কর্তব্য। রাবণ অসম্মতি প্রকাশ করে বলেন, "কনিষ্ঠ সোদর বিভীষণ / একমাত্র পুত্র তার কুমার তরণী, / সরমার অঞ্চলের নিধি ; / ইচ্ছা নাহি হয় / পাঠাতে তরণীসেনে রণে। / মোহবলে বিভীষণে পদাঘাত করি / লজ্জিত দুঃখিত আমি এবে, / আবার তাহার পুত্রে পাঠাইলে রণে / লোকে কি বলিবে মোরে ? / নিন্দার উপরে নিন্দা হইবে প্রচার, / তেঁই ইচ্ছা নাহি মোর / পাঠাইতে তরণীরে রণে।"[৬৪] শেষে ইন্দ্রজিৎ লঙ্কাত্যাগের ভয় দেখালে দ্বিধাগ্রস্ত রাবণ তরণীকে যুদ্ধে পাঠাতে রাজি হন। মনে মনে স্থির করেন, "ইঙ্গিতে কহিয়া দিব নামমাত্র / যুদ্ধ করি শ্রীরামের সনে / ভঙ্গ দিতে রণে।"[৬৪] পরে সাবধানবাণী উচ্চারণকালে বলেন,—"যদি ভুলে যাস / এই হেতু গিয়া আমি প্রাসাদের চূড়ে / তুলিব লোহিত ধ্বজা নিজে।"[৬৫] এখানে যেন রাবণ স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে ইন্দ্রজিতের প্ররোচনায় তরণীকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। রাবণের অসহায়তা, স্নেহ-বাৎসল্য, ব্যথিত চিত্তের প্রকাশ, রাজকৃষ্ণের লেখনীতে ফুটে উঠেছে।

যুদ্ধযাত্রার প্রাক্‌কালে কৃত্তিবাসের তরণী সরমার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে স্পষ্টই জানিয়েছে, "মরিলে রামের হাতে গোলোকে নিবাস"[৬৬]—তাই তার যুদ্ধযাত্রা। রাজকৃষ্ণের তরণী "গুরু-করে ত্যজিব-জীবন, / পাইব নির্বাণ-পদ ও পদপঙ্কজে।"[৬৭]

মনের এই একান্ত বাসনাকে মায়ের কাছে গোপন রেখে শুধু রাম-সন্দর্শনের অভিলাষই প্রকাশ করেছেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে "ব্রহ্ম অস্ত্রে হইবেক ইহার মরণ"[৬৮]—বিভীষণের এই পরামর্শ শুনে রাম তরণীর প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। পুত্রের মৃত্যুর পর তরণী তাঁর আত্মজ, সে কথা রামকে জানাতে রাম শোকাকুল হয়েছেন, রামানুগত সকলেই হয়েছে ব্যথাকাতর। শেষে 'অনিত্য দেহের' জন্য বৃথা ক্রন্দন করতে নিষেধ করে বলেছেন—"যেই তুমি সেই আমি ইথে নাহি আন। / সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান।"[৬৮] বিভীষণ পুত্রের পুণ্যমৃত্যুতে গর্ববোধ করেছেন।

রাজকৃষ্ণ এ-স্থলে মূলানুসরণ করলেও তিনি দীর্ঘ সময় ধরে বিভীষণের মনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। বিশ্বপতি ব্রহ্মার আদেশে মোহ-মায়া পুত্র-স্নেহ মুক্ত করেছে বিভীষণকে, তবু বিভীষণ পুত্রকে নিরস্ত হতে বলেছেন, রণবেশ পরিত্যাগ করতে বারংবার অনুরোধ করেছেন। যুদ্ধকালে সরমার প্রেরিত রক্ষালিপি অনুসারে রাম তরণীর প্রকৃত পরিচয় জেনেছেন। তরণীর 'দয়াযুদ্ধে' রাম অবতীর্ণ হতে চাননি। শেষ পর্যন্ত দৈববাণী শুনে তরণীর শরে বিদ্ধ রক্তাক্ত চরণে রাম ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন—"পূর্ণ হোক বিধাতার মনোরথ / পূর্ণ হোক মনোরথ ভক্তের আমার / পূর্ণ হোক ভাগ্যলিপি।"[৬৯] বিভীষণ কিন্তু শেষাবধি পুত্রশোকে কাতর হয়েছেন।

রাজকৃষ্ণের পৌরাণিক নাটকে অলৌকিক প্রসঙ্গ কখনও এসেছে কাহিনীর প্রয়োজনে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে পৌরাণিক চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রদর্শনের জন্যই এই ধরনের ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। কাহিনী মধ্যে রামের উদ্দেশে সীতার ফুলের মালা শূন্যে প্রেরণ নিতান্তই অবাস্তব ঘটনা।

রামের প্রতি তরণীর অচলা ভক্তির ফলেই তার দশাবতার দর্শন হয়েছে, সে যাত্রা করেছে গোলোকধামে। এ-নাটকে শুধু তরণী নয়,—তার পিতা-মাতা বিভীষণ-সরমা, স্ত্রী কলা, ভগিনী শোভা—সব চরিত্র রামভক্তরূপে চিত্রিত।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে তরণীর প্রতি রামের অস্ত্র-নিক্ষেপে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটলেও রাজকৃষ্ণ কাহিনীশেষে অতিনাটকীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন—তরণীর ছিন্ন-মুণ্ড দীর্ঘ সংলাপ উচ্চারণ করেছে। 'রাম নাম মহাতপ'-এর মাহাত্ম্য প্রচার করেছে, পিতার শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে—"জন্মমৃত্যু নাই / স্থূল সূক্ষ্ম-ভেদাভেদ শুধু / স্থূল ছিনু, সূক্ষ্ম এবে আমি।"[৬৯]

প্রহ্লাদ-চরিত্র ।। রাজকৃষ্ণের সবচেয়ে মঞ্চসফল ও জনপ্রিয় নাটক 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'।[৭০] কারও মনে হয়েছে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলায়' অভাবিত জনপ্রিয়তা দেখে রাজকৃষ্ণ সেই আদর্শে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' লেখেন।[৭১] কিন্তু গিরিশচন্দ্র ও

রাজকৃষ্ণ উভয়েই পৌরাণিক নাটক রচনাকালে বঙ্গীয় দর্শকের ভক্তিপ্রাণতার সুযোগ গ্রহণ করলেও দু'জনের নাট্যাদর্শ ছিল স্বতন্ত্র। রাজকৃষ্ণ প্রথমে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' রচনা করেন, পরে তার মঞ্চসাফল্য দেখে গিরিশচন্দ্র লেখেন 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'। গিরিশচন্দ্রের নাটক স্টার রঙ্গমঞ্চে ( ২২. ১১. ১৮৮৪ ) এবং রাজকৃষ্ণের নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে ( ১১. ১০. ১৮৮৪ ) প্রায় একই সময়ে অভিনীত হয়েছে। পরে বীণা রঙ্গমঞ্চেও লক্ষাধিক দর্শক সমাবেশে বহু রজনী অভিনীত হয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র অন্যান্য নাটকে যে মঞ্চসাফল্য লাভ করেন 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে' তা লাভ করতে পারেন নি; হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, রাজকৃষ্ণের "প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকের এতই সমাদর হইয়াছিল যে যাত্রাওয়ালারা তাঁহার অনুকরণে প্রহ্লাদচরিত্র পালার অভিনয় আরম্ভ করে। এই যাত্রাভিনয় তৎকালে ঢাকা ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 'নূতন যাত্রা' নামে অভিহিত হইত। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' অপেক্ষাও অধিকতর যশ ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।"[৭২] গিরিশচন্দ্রের অসামান্য নাট্যপ্রতিভা ও জনমনোরঞ্জনের ক্ষমতা অন্তত এই একটি নাটকের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়নি। গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার নানাভাবে রাজকৃষ্ণের সাফল্যের কারণ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেন, যেমন— "বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত প্রহ্লাদচরিত্রে প্রচুর সংকীর্তন, প্রহ্লাদের মুখে সহজ কথা ও ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতে—বঙ্গের নর-নারীসাধারণের সংস্কারগত ভক্তির উৎস মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আবার যণ্ড ও অমার্কের [ ভাগবতে আমরা 'অমর্ক' পাই, গিরিশচন্দ্র তাকে 'অমার্ক' করেছেন ] নিম্নশ্রেণীর হাস্যরসের অবতারণায় এবং সাপুড়িয়া প্রভৃতি গীতে রঙ্গালয়ে হাসির তরঙ্গ ছুটিতে থাকে। কুসুমকুমারী নামে এক অভিনেত্রী বেঙ্গল থিয়েটারে প্রহ্লাদের ভূমিকা অভিনয় করিতেন—তাঁহার সুমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণের কর্ণে যেন সুধাবর্ষণ করিত। সেই হইতে 'প্রহ্লাদকুশী' নামে তিনি সাধারণের নিকট পরিচিতা হইয়াছিলেন। শ্রীমতী বিনোদিনী [ স্টারে প্রহ্লাদ ] প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী হইলেও সেইরূপ গায়িকা ছিলেন না। যাহাই হউক প্রহ্লাদচরিত্র অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারই সাধারণের অধিক প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল।"[৭৩] কিন্তু শুধু প্রচুর সংকীর্তন বা সংগীতের জন্য নাটক মঞ্চসাফল্য লাভ করে না। নিম্নশ্রেণীর হাস্যরস হয়তো অল্প কিছু সংখ্যক দর্শককে তুষ্ট করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন সকল শ্রেণীর দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারে না। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সেই সঙ্গে আরও জানিয়েছেন, "গিরিশচন্দ্রের উচ্চ নাট্যকলা শিক্ষিতসমাজে সমাদৃত হইলেও সাধারণ দর্শক তাহাতে তেমন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না।" গিরিশচন্দ্র কিন্তু 'সাধারণ দর্শকে'র কথা ভেবেই নাটক লিখতেন, শুধু 'শিক্ষিত সমাজে'র দিকে তাকিয়ে উচ্চ নাট্যকলা সৃষ্টি করেননি। আসলে গিরিশচন্দ্র 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' রচনাকালে ঘটনার বিস্তার ও চমৎকারিত্ব সাধ্য

মতো পরিহার করেছিলেন ; 'চৈতন্যলীলা'র সাফল্য দেখে তিনি ভেবেছিলেন ভক্তি রসের প্লাবন 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'কেও অনুরূপ জনসমাদর দান করবে।' অন্যদিকে গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে' ভক্তিতত্ত্বের ভালো ব্যাখ্যা আছে, যেমন 'হর-হরি কেন কর ভেদ ?' 'আমি ভক্ত বিনে রইতে নারি / ভক্ত আমার প্রাণের সার।' 'ভক্তিমাত্র হরির প্রমাণ' ইত্যাদি, কিন্তু গিরিশভক্তদের প্রশস্তি সত্ত্বেও, হিরণ্যকশিপু বা প্রহ্লাদ কেউই মানবরসপুষ্ট চরিত্র নয়।

রাজকৃষ্ণের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' ভাগবত কাহিনীর অনুসরণে লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটক। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের প্রথম দশটি অধ্যায়ে প্রহ্লাদ চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। নাট্যকার পুরাণকাহিনীর অনুসরণে সতর্ক, যদিও নাটকের প্রয়োজনে কাহিনী বিস্তার অনিবার্য হয়েছে। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের পূর্বে 'সূচনা' নামে একটি দৃশ্যের সংযোজন আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও 'পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটকে' এর প্রয়োজন ছিল। হিরণ্যকশিপু যে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, এবং তাঁর বিষ্ণু-বিদ্বেষ যে সনকের অভিশাপের ফল একথা জানা থাকলে পরবর্তী কাহিনী অনুসরণ সহজ হয় (ভাগবতে বর্ণিত সনন্দাদি মহর্ষিগণের অভিশাপ নাটকে ঈষৎ পরিবর্তিত)। আধুনিক সমালোচক যখন বলেন, "বিষ্ণুর প্রতি হিরণ্যকশিপুর আক্রোশের কারণ এই নাটকের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই…বিষ্ণুর প্রতি হিরণ্যকশিপুর এই তীব্র আক্রোশের সঙ্গত কারণ যদি নির্দেশ করা যাইত, তবে হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদের প্রতি আচরণও কতকটা সঙ্গত বোধ হইত।"[৭৪] তখন সে অভিমত পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। বিষ্ণুকে শুধু শত্রুভাবে পাওয়া হিরণ্যকশিপুর ভাগ্যলিখন ছিল তাই নয়, হিরণ্যকশিপুকে উপলক্ষ করে নারায়ণ মর্ত্যে হরিনাম স্রোত বইয়ে দিতে চেয়েছেন ("ভক্তময়ী ভক্তিময়ী হইবে ধরণী / হরিনাম স্রোত বহিবে সংসারে।"[৭৫]) হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুবিদ্বেষের প্রত্যক্ষ কারণ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের বিষ্ণুর হাতে মৃত্যু—সে ঘটনাও ভাগবতের অনুসরণে নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে—"তস্মিন্ কূটেঽহিতে নষ্টে কৃত্তমূলে বনস্পতৌ। / বিটপা ইব শুষ্যন্তি বিষ্ণুপ্রাণা দিবৌকসঃ।" (৭/২/৭)—"অহে! ঐ দুষ্ট অতিশয় কপট ও আমার প্রতিপক্ষ, ঐ দুরাত্মা বিনষ্ট হইলেই দেবগণ ছিন্নমূল বৃক্ষের শাখা যেমন শুষ্ক হয়, তাহার ন্যায় উৎসন্ন হইয়া যাইবে। কারণ ঐ ব্যক্তিই দেবতাদের প্রাণ।"[৭৬] "না শুনিব মানা কার / বিষ্ণুর সংহার মূলমন্ত্র মোর। / প্রতিজ্ঞা আমার—/ বিষ্ণুশূন্য-বিষ্ণুশূন্য করিব ভুবন।" (১/১)। শুধু হিরণ্যকশিপু নয়, প্রহ্লাদ চরিত্রাঙ্কনেও রাজকৃষ্ণের কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটকে অতিপ্রাকৃত উপাদান বর্জন করা সম্ভব নয়, বরং ভগবৎ-মহিমা প্রকাশের জন্য এমন কিছু দৃশ্য সংযোজন করা হয় যা অবাস্তব মনে হতে পারে। রাজকৃষ্ণের 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে'ও শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত

হয়েছে, কিন্তু তাতে নাটক মানবরসবঞ্চিত হয়নি। 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে'র গৌণ চরিত্রগুলি নিতান্ত রক্তমাংসের নর-নারী। কয়াধুকে গৌণচরিত্র বলা না গেলেও ভাগবত কাহিনীতে তার বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না, গিরিশচন্দ্রের নাটকে কয়াধুর ভূমিকা যৎসামান্য, কিন্তু রাজকৃষ্ণ এই চরিত্রটির নাট্যসম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করেছেন। তবে যণ্ড ও অমর্কের মুখে হরিনাম-কীর্তন নাটকের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না—এ যেন জগাই-মাধাইয়ের রূপান্তর।

বামন-ভিক্ষা ।। "ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন পদনখনীরজনিতপাবন। কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥"[৭৭]—হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে! অদ্ভুত বামনরূপে তুমি (ত্রিপাদভূমির প্রার্থনায়) দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা করেছিলে। তোমার পদনখস্পৃষ্ট নীর লোকসমূহের পবিত্রতা বিধান করছে। বামনরূপধারী, তোমার জয় হোক। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এবং বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থে বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম বামনাবতারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রাজকৃষ্ণ সেই বামনাবতারের কাহিনী অবলম্বনে লেখেন 'বামন-ভিক্ষা' (১৮৮৫)। নাট্যকাহিনীতে নাটকীয়তা যৎসামান্য; দেবমাহাত্ম্যের প্রকাশ ঘটলেও ঘটনাবিরল এই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত নিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখা সহজ ছিল না। রাজকৃষ্ণ তাই নাটকের প্রারম্ভে একটি 'সূচনা' অঙ্ক সংযোজন করেছেন, যেখানে তিনটি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে বামনাবতারের পূর্বেতিহাস বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুর মুখে সেখানে নাট্যকাহিনীর পরিণাম একটি ছত্রে আভাসিত—"বামন হইব বলিরে ছলিব / ইন্দ্রে পুন লব ত্রিদিবধামে।"[৭৮] তবে সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে বিষ্ণুর আর একটি অদ্ভুত বাসনা, অদিতিকে তিনি বলেন, "মা গো, আমার পিতা মাতা নাই / পিতা মাতা মোরে সবাই বলে /…মা বলা সাধ জাগিছে মনে, / পুরাব সে সাধ এত দিনে। / ধরাবাসী কোটি কোটি প্রাণী—ও মা—/ ধরাবাসী কোটি কোটি প্রাণী / যখন আমায় ডাকে মা বলে / তখন মাতৃস্নেহে আমার প্রাণ গলে। / আমিও ভাবি, আহা এম্নি করে, / মা বলে ডাকি, মা! কারে। / আজ সে আশা পূরিল—ও মা! / তোর ছেলে হয়ে তোরে বলবো মা।"[৭৮] বাৎসল্যরস পরিবেশনের এই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাঙালি সমাজমনের ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষণীয়। ভাগবতে আমরা শুধু পাই, "কশ্যপের তপস্যা আশ্রয় করে আমি নিজের অংশে তোমার পুত্রত্ব গ্রহণ করব এবং তোমার পুত্রদের রক্ষা ও পালন করব।"[৭৯]

'বামন-ভিক্ষা' নাটকে বামনের শৈশবলীলা তথা ঋষিবালকদের সঙ্গে খেলা এবং বামনের উপনয়ন প্রসঙ্গটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এমনও মনে হয়, বামনের উপনয়ন বুঝি নাটকের প্রধান ঘটনাবস্তু, যদিও এর সঙ্গে ভাগবত কাহিনীর সম্পর্ক নেই। রাজকৃষ্ণ সম্ভবত পুরাণবৃত্ত অবলম্বনে লেখা নাটকের মধ্যে এইভাবে মানব-

রস সঞ্চার করতে চেয়েছেন। যদিও তাঁর অধিকাংশ নাটকের মতো এখানেও পরিহাসরসিকতা সর্বদা মাত্রা রক্ষা করতে পারেনি (আহ্লাদে এবং আহ্লাদীর মতো কাল্পনিক চরিত্র সংযোজনের সঙ্গে চিরাচরিত নারদের যাত্রাভিনয়• নাট্যকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে।)

'বামন-ভিক্ষা' অবশ্যই ভক্তিমূলক নাটক। এখানে ভগবান বিষ্ণু ভাগবতের অনুসরণেই শ্রীহরিতে পরিণত। উপনয়ন-শেষে ধ্রুবপদের মতো বারবার উচ্চারিত হয়েছে 'ভবন্ ভিক্ষাং দেহি' বা 'ভবন্তো ভিক্ষাং দত্ত'। সেখানে শিব, ব্রহ্মা, দুর্গাও শ্রীহরির ভিক্ষা-প্রার্থনা চরিতার্থ করেছেন, এবং স্পষ্টই বোঝা যায় উপনয়ন-অন্তে ভিক্ষাগ্রহণের সঙ্গে বলির নিকট পরবর্তী ভিক্ষা গ্রহণের যোগ আছে। আর তাই নাটকের নাম 'বামন-ভিক্ষা'। (ব্রহ্মা ভিক্ষাদানকালে যে কথা বলেন তার উৎস ভাগবত—"আমাকে তুমি / তোমার নাভিপদ্ম হ'তে সৃজন করেচ, / লোকসৃষ্টির ক্ষমতা দিয়েচ, / আজ তজ্জনিত কৃতজ্ঞতা / তোমার পাদপদ্মে অর্পণ কল্লেম।" (৩/১)। তুলনীয়, "বেদসকল আপনার গর্ভে অবস্থান করে। বিধাতা, লোকত্রয় আপনার নাভিস্থল। আপনি ত্রিলোকের উপরিভাগে অধিষ্ঠিত, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার।" ৭৯

বলির নিকট বামনের ভিক্ষা নাটকের চতুর্থ অঙ্কের বিষয়। সেদিক থেকে নাটকের শীর্ষমুহূর্ত এবং গর্ভসন্ধির অনতিপরে এসেছে পরিণাম বা উপসংহৃতি। বলির যজ্ঞশালায় বামনদেবের আবির্ভাব, বলির নিকট বামনদেবের ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা, বিশ্বরূপদর্শন, বিষ্ণু কর্তৃক বলির বন্ধন, সত্যনিষ্ঠ বলির বন্ধনমুক্তি ও বরলাভ—এই ঘটনাগুলি শ্রীমদ্‌ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের আঠারো থেকে বাইশ অধ্যায়ের মধ্যে বর্ণিত। নাট্যকার অধিকাংশ স্থানে আক্ষরিকভাবে ভাগবতের অনুসরণ করেছেন, যদিও শুক্রাচার্যের অনুতাপ কিংবা বিন্ধ্যাবলীর পরামর্শদান পুরাণ কাহিনীর সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার বা সম্প্রসারণ। অন্যদিকে অন্তিমদৃশ্যে পাতালপুরীর কল্পনা—"সুবর্ণ সিংহাসনোপরি বলি ও বিন্ধ্যাবলী উপবিষ্ট। বিন্ধ্যাবলীর ক্রোড়ে বাণ উপবিষ্ট। দূরে গদাস্কন্ধে দ্বারী হইয়া চতুর্ভুজমূর্তি বিষ্ণু দণ্ডায়মান"৮০—শুধু হরিভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যেই নাটকে স্থান পেয়েছে—"হরিও তব দ্বারে / বাঁধা আজি সেই ধারে / জয় হরি বলির দুয়ারী।"৮০

'বামন-ভিক্ষা' ১৮৮৫ সালের ১৩ জুন বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন—"New play New play / Bengal Theatre / Saturday, the 13th June, at 9 p. m. / Baboo Rajkrishna Roy's New Drama / BAMAN VIKSHA / Merry Dancing of Krishna on Lotus Throne / BAMAN / A Jewel among Hindoo mythology / Plenty Melodious Song."৮১

দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ ।। তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র নাটকটির কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণ ( অযোধ্যাকাণ্ড ৬৩-৬৪ সর্গ ) থেকে নেওয়া। তবে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করা হলেও এখানে ভক্তিরসের প্রাবল্য ঘটেনি, আধুনিক নাট্যকার বালক-সিন্ধুবধ আখ্যানে মানবরসেরই সন্ধান করেছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে অন্ধ- মুনি-দম্পতির একমাত্র সন্তান দশরথের শব্দভেদী বাণে নিহত হয়েছে। তবে সেখানে দশরথ বলেছেন, "আমি যখন কৌমারাবস্থায় ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করি, তৎকালে শব্দমাত্র শুনিয়া লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে পারিতাম, এইজন্য লোকে আমায় শব্দবেধী বলিত। ঐ সময়েই আমি এই পাপের অনুষ্ঠান করি।"[৮২] কিন্তু নাটকে অপুত্রক দশরথ-পুত্র শোকের অভিশাপকে 'শাপে বর' বলে অভিহিত করেছেন। আসলে কাহিনী পরিকল্পনায় মনে হয় রাজকৃষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ড অনুসরণ করেছেন। শুধু মুনিপুত্রের 'সিন্ধু' নামকরণে নয়, দশরথের ভবিষ্যৎ পুত্র রামচন্দ্রের বর্ণনায়, সর্বোপরি রামনাম উচ্চারণে পাপ থেকে মুক্তিলাভ ( যদিও সেখানে বশিষ্ঠপুত্র বামদেবের নির্দেশে দশরথ রাম-নাম উচ্চারণ করেছেন ) ইত্যাদি বর্ণনায় কৃত্তিবাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ' ঠিক ভক্তিরসাত্মক নাটক না হলেও নাটকের শেষাংশে রাম-নাম উচ্চারণের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক ভক্তিরস পরিবেশন করা হয়েছে— "মহারাজ। নাহি ভয় ; পৃথিবীতে সুখী না হইবে তুমি বটে, / কিন্তু না যাবে নরকে ; / নিজে ভগবান্ হরি / রামরূপে অবতীর্ণ হয়ে / পিতা বলি ডাকিবে তোমায় ; / তাঁহার কৃপায় / হবে তব বৈকুণ্ঠে নিবাস। / এবে তুমি, রাজা, / আমাদের অন্তিম সময়ে / হরি নাম—রাম-নাম কর উচ্চারণ। / দশরথ—হরে রাম —হরে রাম—হরে রাম ! / অন্ধমুনি—হরে রাম—হরে রাম—হরে রাম।"[৮৩] এই অংশ সিন্ধুবধ কাহিনীতে অভিনব সংযোজন। নাটকের দিক থেকে এর প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু উনিশ শতকের বাঙালি দর্শক নামগানের মাহাত্ম্যের জন্যই নাটকটি পছন্দ করেছে। অন্ধমুনি ও মুনিপত্নীর মৃত্যুও নাটকে যে-ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে মঞ্চে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির ইচ্ছা কাজ করেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখি— "এতেক বলিয়া মুনি নারায়ণে ডাকে। / নারায়ণ মন্ত্র জপি মরে পুত্রশোকে। / পতিব্রতা নাহি জীয়ে পতির মরণে। / অন্ধকী ছাড়িল প্রাণ অন্ধকের সনে॥"[৮৪] রাজকৃষ্ণের নাটকে দশরথ চিতা প্রস্তুত করেছেন, চিতায় আরোহণ করার আগে অন্ধমুনিপত্নী সাময়িকভাবে মূর্ছিত হয়েছেন, তারপর 'সিন্ধুর মৃতদেহ লইয়া অন্ধমুনি ও তদীয় পত্নীর জলচ্চিতায় প্রবেশ।' মঞ্চে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করা হয়েছে, তাতে ঝাঁপ দেবেন অন্ধমুনি ও মুনিপত্নী। এর মধ্যে নাট্যোৎকণ্ঠা ও নাট্যচমক বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তবে চিতারচনায় পরিকল্পনা বাল্মীকি থেকেই নেওয়া—"মুনি আমায় এইরূপ অভিশাপ দিয়া ভার্যার বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করত চিতায়

আরোহণ ও স্বর্গে গমন করিলেন।”[৮৫]

নাটকটি ১৮৮৫ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালের ৭ই জানুয়ারি বেঙ্গল থিয়েটারে নাটকটি অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়, তবে ১৮৮৪ সালে সম্ভবত প্রথম অভিনয় হয়।[৮৬]

গঙ্গা-মহিমা ॥ পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটক রাজকৃষ্ণ রায় সংখ্যায় অনেক লিখলেও, সর্বত্র ভক্তিভাব নাটককে রসসিক্ত করতে পারেনি। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য লিখিত ( ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ) 'গঙ্গা-মহিমা' নাটকে গঙ্গার ধারাস্রোতে মিশে একাত্ম হয়েছে ভক্তিরসের স্বতঃপ্রবাহ। ভাগবতের নবম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে 'সগরবংশের উপাখ্যান' এবং নবম অধ্যায়ে 'গঙ্গাবতরণ-কথা'য় সগর বংশ এবং গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের কথা জানা যায়। 'বিষ্ণুপুরাণে'—'সগর রাজার উপাখ্যান' অংশে গঙ্গামহিমার বর্ণনা পাই। বাল্মীকি-রামায়ণের বালকাণ্ডের ৩৯-৪৪ অধ্যায় পর্যন্ত এ কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণেও এই চিত্তাকর্ষক ঘটনা-বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। রাজকৃষ্ণ বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে—তার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে চিত্রিত করেছেন গঙ্গাবতরণ-কাহিনী।

চারটি অঙ্কে, বাইশটি দৃশ্যে বিন্যস্ত কাহিনীর 'সূচনা' শিবলোকে। মহাদেব জানান, মানুষ নিজ কর্মফলে কষ্ট পায়। বলেন, “শিব ছাড়ি ভজিয়া অশিব / নরকে মরিস ডুবি ?”[৮৭] অজ্ঞানজ পাপ থেকে পাপীদের ত্রাণকর্তা তিনি—কিন্তু “জ্ঞানপাপী কিসে ত্রাণ পায়”[৮৭]—তা তাঁর অজ্ঞাত। শেষে ব্রহ্মলোকে দেবতাদের সম্মিলিত আলোচনাসভায় ব্রহ্মার জিজ্ঞাসার উত্তরে মহাদেব জানান—বিষ্ণুর চরণ আশ্রয় করে 'হরিসঙ্কীর্তন' করলে 'পাপীদের পাপ বিমোচন' সম্ভব। এরপর বিষ্ণুলোকে দেব-আহ্বানে বিষ্ণুর পাদপদ্মোদ্ভূত জলধারা দেখে মহাদেব ঘোষণা করেন—“শুন সবে, / শ্রীহরির শ্রীপদ-উদ্ভূত / এই মহাজলধারা নিত্য পুণ্যধারা / গঙ্গা নামে হৈল অভিহিত।”[৮৮] এ বারি অগতির গতি, পাপীর ত্রাতা, শমন ভয়-নাশিনী। এমন কি যে জ্ঞানপাপী—যার পরিণাম অনন্ত নরক, সেও অনুতপ্তচিত্তে গঙ্গাজল স্পর্শ করে ভীতি প্রকাশ করলে পরিত্রাণ পাবে। দেবতাদের সৃষ্ট গঙ্গা-উৎপত্তির এই কাহিনী কৃত্তিবাসের রচনায় বীজাকারে পাওয়া যায়—রাজকৃষ্ণের কল্পনা এর পরিবর্ধন ঘটিয়েছে।

নাটকের মূল কাহিনী সগর বংশের উপাখ্যান অবলম্বনে পরিকল্পিত। বশিষ্ঠের পৌরোহিত্যে আয়োজিত ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ নারদের প্ররোচনায় রজনী-নিদ্রার সহায়তায় ইন্দ্রের দ্বারা কিভাবে পণ্ড হলো, অপহৃত যজ্ঞাশ্ব-সন্ধানী সগরের যাটহাজার পুত্র কিভাবে কপিলাশ্রমে তাঁর ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত

হলো, তাদের উদ্ধারের প্রচেষ্টায় সগর-অংশুমান-দিলীপের জীবন অতিবাহিত হয়ে গেলো, অবশেষে দিলীপনন্দন ভগীরথের ঐকান্তিক সাধনায় গঙ্গা মর্ত্যে অবতীর্ণা হয়ে সগর সন্তানদের পাপমুক্ত করলেন কিভাবে—সে কাহিনীই এ-নাটকের উপজীব্য।

নাটকে ইন্দ্রত্ব লাভের বাসনায় সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে, সগরের দুর্বৃত্ত-স্বভাব-পুত্রেরা যজ্ঞাদি লোপ করায় দেবতারা চিন্তান্বিত হয়ে কপিলের শরণাপন্ন হন। কপিল আশ্বাস দেন, "অতি অল্পকালে তারা হইবে নিধন"।[৮৯] ফলে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করলেন সগর।

ভগীরথের জন্মের পূর্বে নারদের প্রশ্নের উত্তরে কপিল জানান,—"সাক্ষাৎ তপস্যা মোর মানব-আকারে / জনমিবে ধরার মাঝারে / সূর্য্যবংশে ভগীরথ নামে / মুনি! / সেই শিশু ধরাধামে / আনিবে গঙ্গারে তপস্যায়।"[৯০] বিষ্ণুপুরাণে অংশুমানকে কপিল বলেন—"তোমার পৌত্র যেই জন্মিবে এ ভবে / সেই আনিবেক গঙ্গা পরম উৎসবে।"[৯১] এবং গঙ্গাজলেই সগরসন্তানেরা উদ্ধার পাবে। এ-ধরনের সাদৃশ্য ঘটনার ক্ষেত্রে অন্যত্রও লক্ষ্য করা যায়।

'গঙ্গা-মহিমা' নাটকে গঙ্গার অবতরণ প্রসঙ্গে কপিলের মন্তব্য নারদের স্মরণে এসেছে—"ব্রহ্মলোক ছাড়িয়া যখন / উত্তাল-তরঙ্গ গঙ্গা আসিবে ধরায় / থাকিবে কোথায়? / জলাধার না হইলে—কোথা রবে জল?"[৯২] পরে জানা যায় মহাদেব সমস্যার সমাধান করে ভগীরথকে বলেছেন, "গঙ্গার পতন-বেগ মস্তকে ধরিব।"[৯৩]

রাজকৃষ্ণের এই বর্ণনার সমর্থন মেলে ভাগবতে। ভগীরথকে গঙ্গাদেবী বললেন, "মহারাজ, আমি যখন পৃথিবীতে নামব, তখন কে আমার বেগ ধারণ করবে?"[৯৪] —সেখানেও জানতে পারি, শিব "শ্রীহরির চরণস্পর্শে পবিত্র গঙ্গাকে নিজের মাথায় ধারণ করেন।"[৯৪]

বাল্মীকির রচনায় জহ্নুমুনি উদরস্থ গঙ্গাকে কর্ণ-বিবর দিয়ে নিষ্ক্রমণ করেছেন যাতে মুখবিবরের স্পর্শে আমৃষ্ট না হয়। রাজকৃষ্ণ এক্ষেত্রে কৃত্তিবাসকেই অনুসরণ-যোগ্য মনে করেছেন। জহ্নু তাঁর জানু চিরে গঙ্গাকে মুক্তি দিয়েছেন।

প্রধানত কৃত্তিবাসের অনুসারী হলেও বাল্মীকি-রামায়ণের কিছু চরিত্র রাজকৃষ্ণ তাঁর নাটকে গ্রহণ করেছেন। যেমন, গরুড়ের কোনো ভূমিকা কৃত্তিবাসে নেই, আছে বাল্মীকিতে। পিতৃব্যদের অনুসন্ধানকালে অংশুমানের সঙ্গে গরুড়ের সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে গরুড় অংশুমানকে পাতালপুরীতে কপিলাশ্রমের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। জানিয়েছেন সগরসন্তানদের সন্ধান এবং পরিণতি। পরবর্তীকালে হিমালয়ের গোকর্ণতীর্থে ভগীরথের তপস্যায় বসার পূর্বে পশুপাখি, ভুজঙ্গ-কীটদের ভগীরথের প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়ে সাবধান করেছেন।

ভগীরথের গঙ্গাপ্রাপ্তি এবং সে-গঙ্গাকে মর্ত্যে অবতরণের ক্ষেত্রে গরুড়ের সহায়তা এবং নারদের পরিচালনা সমগ্র নাটক জুড়ে ছায়া ফেলেছে, বড় বেশি লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

নাটকে নতুন সংযোজন যম চরিত্র। পৃথিবীতে গঙ্গার আগমনে তিনি সকাতরে বলেন—"গঙ্গাদেবী আইলা নরলোকে, / ঘটিল আমার সর্ব্বনাশ।"[৯৫] মহাদেবকে প্রশ্ন করেন,—"দেব! / পাপিনিস্তারিণী গঙ্গা আইলা ভূলোকে, / কে বা আর পাপী রবে?"[৯৫] মহাদেব তাঁকে আশ্বস্ত করে জানান, গঙ্গানামে পাপী পাপমুক্ত হবে ঠিকই, কিন্তু "যেই পাপী গঙ্গাভক্তিহীন, / সেই তব শাসন-অধীন, / মুক্তি তার নাহি কোন দিন, / চিরদিন নরক-যন্ত্রণা ভাগ্যে তার।"[৯৫]

শুধু চরিত্র নয়, নাটকে নতুনত্ব আনতে রাজকৃষ্ণ নানা ঘটনারও আশ্রয় নিয়েছেন। গঙ্গার মর্ত্যে আগমনকালে শিব তাকে জটায় ধারণ করেন, পুরাণের এ কাহিনীর সঙ্গে কবিকল্পনা মিশিয়ে রাজকৃষ্ণ শিব-গঙ্গার মিলন ঘটিয়েছেন বিবাহ বন্ধনে। নারদের মধ্যস্থতায় হিমালয়-কন্যা বলে গঙ্গাকে গ্রহণ করেছেন, মহাদেব-কে বলেছেন—"গঙ্গা কন্যা মোর / তব করে কৈনু সম্প্রদান।"[৯৬] মহাদেব সানন্দে জানান—"হৃদয় ভাণ্ডারে একটি উজ্জ্বল মণি জ্বলে, / তার পাশে শোভিল অপর মণি। / আহা, দুই মণি একত্রে মিশিল।"[৯৬] মহাদেবের অন্তরের এই দুই মণিকে নারদ হিমালয়ের কাছে নিগূঢ় তত্ত্বকথায় স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"রাজা! জানিও নিশ্চয়, / প্রকৃতি দ্বিভাগে এবে বিভক্ত হইল, / একভাগ উমা কন্যা তব, / অন্যভাগ গঙ্গা সুরধুনী। / আধ্যাত্মিকা মূল প্রকৃতিই / পার্থিবা প্রকৃতি ভাবে রাজে; / পার্থিবা প্রকৃতি এই—স্থল আর জল। / স্থলরূপা উমা কন্যা তব, / গঙ্গা কন্যা তব, জলরূপা।"[৯৭] নাট্যকারের এ-ভাবনা নিঃসন্দেহে নাটকে চমক সৃষ্টি করে।

নাট্যকার রাজকৃষ্ণের 'গঙ্গা-মহিমা' নাট্যরচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগীরথের ভক্তির গভীরতার সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করানো। ঐকান্তিক সাধনা, নিষ্ঠা সেই সঙ্গে প্রগাঢ় দেবভক্তি ভগীরথের সমস্ত সাফল্যের মূলে। মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দেবগণকে তুষ্ট করে ভগীরথ গঙ্গাকে ব্রহ্মলোক থেকে মর্ত্যে আনয়ন করলেন। সুমেরু পর্বত, ঐরাবত ও শিবের সহায়তায় হরিদ্বার-ত্রিবেণী-বারাণসী হয়ে জহ্নুর উদর থেকে মুক্ত করে দীর্ঘ পথ পরিক্রমণের পর গঙ্গাকে গঙ্গাসাগরে এনে মিলিত করলেন, সগর সন্তানরা উদ্ধার পেল, পাপীরা পেল ত্রাণ।

নাটকটির চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের পরে 'ক্রোড়াঙ্ক' সংযোজিত হয়েছে—পরবর্তী তিনটি দৃশ্য ক্রোড়াঙ্কের অন্তর্ভুক্ত। চতুর্থ দৃশ্যের সূচনায় Panorama বা 'ক্রমিক পটপরিবর্ত্তন' দেখানো হয়েছে। ষষ্ঠ দৃশ্যের শেষে 'পট পরিবর্ত্তন' করে গঙ্গসাগরসঙ্গম-দৃশ্য দর্শন করিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

চন্দ্রহাস ।। হরিভক্তিমূলক নাটক 'চন্দ্রহাস' ( ১৮৮৮ ) বীণা রঙ্গমঞ্চে ১৮৮৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্রথম অভিনীত হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারি—

Vina Theatre : This Theatre opens tonight at 9' o clock at 38 Machuabazar Road, Thanthania. Babu Rajkrishno Roy's Mythological drama 'Chandrahasa' or the second Prahlad, will be played on the stage. The proprietor we are told have spared no trouble or expense to render this place a scene of attraction to playgoers.[১৮]

পরবর্তী ১১, ১৭, ২৫ ডিসেম্বরেও এই নাটকের অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। ১৪ জুলাই ১৮৮৮ সালের 'অনুসন্ধান' পত্রিকা থেকে জানা যায় তখনও নাটকটি সগৌরবে অভিনীত হচ্ছে। 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকের মতো জনপ্রিয় না হলেও ভক্তিরসাত্মক 'চন্দ্রহাস' নাটক সে কালের দর্শক মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়েছিল। নামভূমিকায় বালক শরৎ কর্মকারের অভিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কুলিন্দ, মেধাবতীর অভিনয় সুন্দর, তবে ধৃষ্টবুদ্ধির সাবলীল বাচনভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা দর্শকদের আকর্ষণ করেছিল। পোশাক, দৃশ্যপটের ব্যবহার যথাযথ ছিল। ১৮৮৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর স্টেটসম্যান পত্রিকা জানায় যে নাট্যকার নিজে একটি হাস্য-রসাত্মক ভূমিকা 'ভদ্র' চরিত্রে অভিনয় করেন।[১৯]

কেরলপতির মৃত্যু হলে রাণী তাঁর সঙ্গে সহমৃতা হন। তাঁদের একমাত্র শিশুপুত্র চন্দ্রহাসকে নিয়ে ধাত্রীমাতা পালিয়ে আসে কুন্তলপুরের রাজা কৌন্তলকের আশ্রয়ে দাসীবৃত্তি নিয়ে। রোগশয্যায় চন্দ্রহাসকে ধাত্রী জানিয়ে যায়, তার শয্যাতলে মাটিতে এক কৌটোয় আছে শিশুর পরিচয়। শিশু চন্দ্রহাসের হরিভক্তি দেখে, সেইসঙ্গে ধৃষ্টবুদ্ধিকে কথিত ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যৎ-বাণীতে ভীত হয়ে কুন্তলপুরের সেই মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি তাকে হত্যার জন্য ঘাতকদের হাতে তুলে দেয়। চণ্ডালরা চন্দ্রহাসের সুমিষ্ট ব্যবহারে সদয় হয়ে তাকে মুক্তি দেয়। অপত্যস্নেহে সে আশ্রয় পায় চন্দনাবতীর বনবিভাগের কর্তা কুলিন্দের গৃহে। কুলিন্দ, তার স্ত্রী মেধাবতী এবং চন্দনাবতীর সকলেই চন্দ্রহাসের প্রভাবে হরির সেবক হয়ে পড়ে। ধৃষ্টবুদ্ধি হঠাৎই কুলিন্দের গৃহে চন্দ্রহাসের সন্ধান পায়। তাকে কৌশলে কুন্তলপুরে পুত্র মদনের কাছে পাঠায় পত্রপ্রেরকরূপে। পত্রে মদনকে নির্দেশ দেয় চন্দ্রহাসকে বিষপ্রয়োগে হত্যার। ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যা বিষয়া ঘুমন্ত চন্দ্রহাসের কাছ থেকে চিঠি উদ্ধার করে, তার রূপে মুগ্ধ হয়ে 'বিষদান'-কে 'বিষয়াদান' করে চোখের কাজল দিয়ে—পরিণামে তাদের পরিণয়। ধৃষ্টবুদ্ধি জানতে পেরে ক্ষুব্ধ হয়, চণ্ডীমন্দিরে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। পুত্র মদনকে চন্দ্রহাস ভেবে ঘাতকরা হত্যা করে।

ধৃষ্টবুদ্ধি ঘটনার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে আত্মহত্যা করে। চন্দ্রহাস দেবীর দেউলে পৌঁছে পিতাপুত্রকে নিহত দেখে চণ্ডীর খড়্‌গের আঘাতে নিজের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। কিন্তু হঠাৎ দেবী জাগ্রত হয়ে বাধা দেন এবং জানান হরিগতপ্রাণ চন্দ্রহাসের এভাবে জীবনের বিনষ্টি কোনোমতেই কাম্য নয়। চন্দ্রহাসকে দেবী আরও বলেন, পিতাপুত্রের কানে হরিনামগান করলেই তারা জীবন ফিরে পাবে। চন্দ্রহাস তাদের পুনর্জীবিত করে তুললে তারাও হরিভক্ত তথা চন্দ্রহাসের ভক্ত হয়ে পড়ে।

চন্দ্রহাস এ নাটকের নায়ক। তার সাহায্যেই নাট্যকার ভক্তিরসের পরিবেশন করেছেন। নাটকটির শুরু থেকে শেষাবধি চন্দ্রহাস তার গুরুর মহিমা প্রচার করেছে। তার গুরু স্বয়ং হরি মোক্ষকরী বিদ্যা শেখান। তার সঙ্গে সর্বদা একটি কালো নুড়ি থাকে, সেটি তার হরিঠাকুর। তার মতে,—"হরি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ এই নাম / সমগ্র শাস্ত্রের প্রাণ / সমগ্র শাস্ত্রের বীজ।"[১০০] চন্দ্রহাসের গানে তার অন্তর-পরিচয় সুস্পষ্ট—"বোল্লে হরি দুঃখ যাবে অন্তকালে মোক্ষ হবে, / জীবনকালে শান্তি পাবে থাকবে সুখে অবিরাম।"[১০১]

চন্দ্রহাস শৈশবকালে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে ফিরে আসে হরির নাম স্মরণ করে, ঘাতকরা তাকে অরণ্যে নিয়ে গিয়েও হত্যা করতে পারে না। হরির একনিষ্ঠ সেবক বলে কুলিন্দ তাকে আত্মজসম আশ্রয় দেয়। হরির প্রসাদেই বিষয়ার সহায়তায় তার প্রাণরক্ষা পায় এবং পরিশেষে দেবী চণ্ডিকাও এই হরিভক্ত-প্রাণকে আত্মহনন বিমুখ করেন।

চারটি অঙ্ক সতেরোটি দৃশ্যে বিন্যস্ত রাজকৃষ্ণের এই নাটকটির আগাগোড়া বৈষ্ণবধর্ম তথা হরির জয়গান গীত হলেও নাটকের অন্তিমে শক্তি-রূপিণী-দেবী চণ্ডীর আরাধনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। ফলে নাটকের শেষাংশে দুই বিপরীত ধর্মমতের সম্মিলনে ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে। বৈষ্ণব এবং শাক্ত দু'টি মতাদর্শ একত্রিত হয়েছে।

গর্গসংহিতায় অশ্বমেধখণ্ডে ৫১-৫২ অধ্যায়ে চন্দ্রহাসের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু চন্দ্রহাসের কাহিনী 'জৈমিনী ভারত'-এ বিস্তারিতভাবে আছে। রাজকৃষ্ণ মূলত সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই চন্দ্রহাস নাটক লিখেছেন। দু'টি উৎসেরই নানা ঘটনার সঙ্গে নাটকের ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

চন্দ্রহাসের ষষ্ঠ পদাঙ্গুলি ছেদন করে ঘাতকদের মন্ত্রীকে ছলনা, চন্দ্রহাসকে সংহারের প্রচেষ্টা, কেরল-পুত্রের কুলিন্দের গৃহে প্রতিপালিত হওয়া, গুরুগৃহে চন্দ্রহাসের 'হরি' নামকীর্তন, চন্দনাবতীর সকলের একাদশীব্রত পালন, একাদশীতে কিঙ্করদের ধৃষ্টবুদ্ধির গৃহে প্রেরণ, কুলিন্দের গৃহে মন্ত্রীর আগমন, চন্দ্রহাসকে মদনের কাছে পত্রদ্বারা প্রেরণ, বিষয়ার পত্রপরিবর্তন, কুলিন্দকে ধৃষ্টবুদ্ধির দণ্ডদান, বিষয়ার

সঙ্গে চন্দ্রহাসের বিবাহ, বিষয়ার বৈধব্যকামনা করে মন্ত্রীর চন্দ্রহাসের প্রতি আক্রোশ, তাকে হত্যার পরিকল্পনা, রাজা কুন্তলকের কন্যা চম্পকমালিনীকে চন্দ্রহাসকে সম্প্রদান, চণ্ডীপূজার আয়োজন, মন্ত্রী-মন্ত্রীপুত্রের আত্মহনন, দেবীর আবির্ভাব, চন্দ্রহাসকে রক্ষা, সকলের জীবন ফিরে পাওয়া-সমস্ত ঘটনাই মূলানুসরণে বর্ণিত। নাটকের শুরুতে ধাত্রীর কথায় জানা যায়—"আমার প্রতিপালক কেরলপতি / প্রাণত্যাগ কল্লেন! / প্রভুপত্নী রাজমহিষীও পতির সহিত / জলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন দিলেন।"[১০২] 'জৈমিনী ভারতে' রাণীর সহমরণের চিত্রে পাই, "পরম ধার্ম্মিক কেরলরাজ ঐ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মহিষী সাতিশয় পতিব্রতা। স্বামীর পরলোক সংবাদ শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহমৃতা হইলেন।"[১০৩]

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ব্রাহ্মণোক্ত ভবিষ্যৎ-বাণীতে জানা যায় চন্দ্রহাস ধৃষ্টবুদ্ধির সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।—"ঐ বালক-বড় ভাগ্যবান, / সময়ে / আপনার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হবে।" মূলে আছে—"এই বালক যেরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত, তাহাতে রাজ্যধর হইবে বলিয়া সুপ্রতীতি হইতেছে। ধৃষ্টবুদ্ধি তুমি ইহাকে পালন কর। পরিণামে এই বালকই তোমার সমস্ত সম্পদ অধিকার করিবে, সন্দেহ নাই।"[১০৪]

কুলিন্দের গৃহে ধৃষ্টবুদ্ধি পুত্র জন্মের কথা জানতে চাইলে কুলিন্দ জানায়—"এই পুত্র আমার ঔরস নহে, স্বয়ংপ্রাপ্ত মনোরম পুত্র।"[১০৫] রাজকৃষ্ণ এর অনুসরণে লেখেন—"সে পুত্রটি আমার ঔরসপুত্র নয়, / স্বয়ংপ্রাপ্ত পুত্র।"[১০৬]

মদনের নিকট পত্রপ্রেরণকালে মন্ত্রী সাবধান করে দিয়ে লেখেন, "কোন মতেই ইহার রূপ, গুণ, বয়স, কুল, শীল, পদক্রম, কোনো বিষয়েই দৃষ্টি না করিয়া, ইহাকে নিপাত করিবে।"[১০৭] রাজকৃষ্ণেও তার সমর্থন মেলে, "জাতি, কুল, বিদ্যা, বিত্ত, পদ, বয়স, / পরাক্রম, শীল, গুণ বা সৌন্দর্য্য / কিছুই গণনা না করিয়া / অবিলম্বে ইহাকে বিষ দান করিবে।"[১০৮]

রাজকৃষ্ণ মূলানুসরণ করলেও কোথাও কোথাও নাট্যঘটনাকে অকারণ প্রলম্বিত করেছেন। যেমন ধৃষ্টবুদ্ধির বাড়ি থেকে ব্রাহ্মণদের বহির্গমনকালে কথোপকথনে মন্থরতা এসে নাট্যগতি ব্যাহত হয়েছে। তবে ব্রাহ্মণদের ভোজন-লোলুপতা নাটকে 'কমিক রিলিফ' সৃষ্টি করেছে।

নবসংযোজন হিসাবে এসেছে কুন্তলপুরের রাণী, সহচরীসহ বনদেবী, কুলিন্দপত্নী মেধাবতী চরিত্র। নাটকে এরা কিছুটা গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন, চন্দ্রহাস নিরুদ্দেশ হলে রাণী রাজাকে অনুরোধ করেন, "ঘোষণা করিয়া দাও / চন্দ্রহাসে যে আনিয়ে দিবে, / লক্ষ মুদ্রা, শতগ্রাম পাবে।"[১০৯] মেধাবতী চরিত্রের মধ্য দিয়ে চন্দ্রহাসের প্রতি অপত্যস্নেহ প্রকাশিত হয়েছে। রাজকৃষ্ণ চণ্ডালদের মনে মোহের

সৃষ্টি করে হরিভক্ত করে তুলেছেন, মূলে যা ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

দুর্বাসার পারণ ।। মহাভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে লেখা 'দুর্বাসার পারণ' ( ১৮৮৮ ) আসলে দু'টি নাটকের একত্র সমাবেশ। মহাভারতের বনপর্বে ২৩৫ অধ্যায় থেকে ২৪৭ অধ্যায় পর্যন্ত 'ঘোষযাত্রা পর্বাধ্যায়'। পাণ্ডবেরা তখন দ্বৈতবনে নিঃসম্বল নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন। শকুনির মন্ত্রণায় দুর্যোধনাদি দ্বৈতবন-সন্নিহিত ঘোষপল্লী যাত্রা করেছেন—"পুত্র, ধন ও রাজ্য লাভ করিলে যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, শত্রুদিগের দুঃখদর্শনে তদপেক্ষা সমধিক প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। তুমি সফলকাম হইয়া বল্কলাজিনধারী ধনঞ্জয়কে আশ্রমস্থ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে এবং দিব্যাম্বর বিভূষিত তোমার প্রিয়তমাসকল বল্কলাজিন সম্বৃতা একান্ত দুঃখিতা দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে ইহাদিগকে দেখিয়া নিতান্ত নির্বেদগ্রস্ত হইয়া ধনহীন জীবন ও আপনার নিন্দা করিবে।"[১১০] তারপর সেখানে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে বিরোধ, গন্ধর্বদের কাছে শোচনীয় পরাজয় ও বন্দীদশা গ্রহণ এবং অবশেষে যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে অর্জুন কর্তৃক দুর্যোধনাদির বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ,—মহাভারতীয় এই কাহিনী রাজকৃষ্ণ মোটের উপর অপরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করেছেন।

এই অংশে শকুনি, বিদূষক ও বিদূষকপত্নীকে নিয়ে যে কৌতুকরসের অবতারণা করা হয়েছে, তা কখনও কিছুটা বাড়াবাড়ি মনে হলেও সে কালে বাংলা পৌরাণিক নাটকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়। গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ বর্ণনায় কিংবা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকুটিরে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের কথোপকথনে পৌরাণিক কাহিনীর ঈষৎ রূপান্তর ঘটলেও নাট্যকার এমন কিছু বেশি স্বাধীনতা গ্রহণ করেননি। ভীম চরিত্রটি একটু বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, তবে তার আচরণ চরিত্রোপযোগী ও ঘটনাসংস্থানের অনুকূল। যুধিষ্ঠির যে কখনও তাঁর কৌরব-ভ্রাতাকে দুর্যোধন নামে অভিহিত করেন না, তাকে সুযোধন বলেন, তার মধ্যে একটি সুন্দর নাট্যশ্লেষ লুকিয়ে আছে।

তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে প্রথম নাটকটির সমাপ্তি ঘটেছে, অর্থাৎ দুর্যোধনাদি অপমানিত ও পরাজিত হয়ে হস্তিনায় ফিরে গেলেন—এখানেই নাট্য কাহিনীর সমাপ্তি। কিন্তু এই অংশের সঙ্গে নাটকের 'দুর্বাসার পারণ' নামকরণের কোনো সংগতি নেই। মহাভারতের বনপর্বে ২৩৮ অধ্যায়ের পর দুর্যোধনের প্রতি কর্ণের সান্ত্বনা, দুর্যোধনকে শকুনির সান্ত্বনা, দানব-বান্ধবগণ কর্তৃক দুর্যোধনের প্রতি সান্ত্বনা, পাণ্ডবপরাভবার্থ কর্ণের কূটমন্ত্রণা, পাণ্ডবগণের রাজসূয়ানুকরণে দুর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞ, স্বপ্নদৃষ্ট মৃগবাক্যে যুধিষ্ঠিরের দ্বৈতবন ত্যাগ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। এই অংশ নাট্যকাহিনীতে গ্রহণ করা হয়নি। ২৬১ অধ্যায় থেকে দুর্বাসার কাহিনীর

অবতারণা। দুর্বাসার কাহিনী একটি স্বতন্ত্র নাটকের বিষয়, কিন্তু রাজকৃষ্ণ কৌশলে এই দু'টি কাহিনীকে সম্মিলিত করেছেন। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথোপকথনকালেই দুর্বাসার কথা দুর্যোধনের মনে জেগেছে। তিনি দুর্বাসার সাহায্যে পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর প্রতিহিংসাবৃত্তি পূর্ণ করতে চেয়েছেন। মহাভারতে আছে, "মহাযশাঃ দুর্ব্বাসা দশসহস্র শিষ্য-সমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় [হস্তিনাপুরে] সমুপস্থিত হইলেন।"[১১১] নাটকে দেখি দুর্যোধন নিজে দুর্বাসার আশ্রমে গেছেন, তাঁকে হস্তিনাপুরে আমন্ত্রণের উদ্দেশ্যে। তারপর দুর্যোধনের প্ররোচনায় তিনি দ্বৈতবনে পাণ্ডবদের আশ্রমে অপরাহ্নে আতিথ্য গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়েছেন এবং পাণ্ডবদের বিপন্ন করে তুলেছেন। মহাভারতে ২৬২ অধ্যায়ে 'যুধিষ্ঠির সমীপে সশিষ্য দুর্ব্বাসার আতিথ্য প্রার্থনা' সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

রাজকৃষ্ণ এই কাহিনীকে নাটকের প্রয়োজনে বিস্তারিত করেছেন। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর বিচলিত অবস্থা, অন্যদিকে দুর্বাসার দ্বিধা বেশ কিছুটা নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে। দুর্বাসার দ্বিধা রাজকৃষ্ণের মৌলিক কল্পনার ফল হলেও চরিত্রটি এর দ্বারা অনেকটা মানবলক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে—"যুধিষ্ঠির ধর্ম্মশীল, আমিও ধর্ম্মপ্রতিপালক / ধর্ম্মই এক্ষণে / আমাদের উভয়ের কার্য্য সিদ্ধির মূল। / আজ নূতন ঘটনা—ধর্ম্ম সংঘর্ষণ।" (৪/৩)

তবে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটেছে দুর্বাসার পারণ-কল্পনায়। মহাভারতে "মহর্ষি দুর্ব্বাসা পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীকে কৃত ভোজন এবং সুখাসীন জানিয়া দশসহস্র শিষ্যে পরিবৃত হইয়া তাহাদিগের বসতি-বনে উপস্থিত হইলেন।"[১১২] রাজকৃষ্ণের নাটকে আমরা দেখি দুর্বাসা এসে বলেন, "গতকল্য শিষ্যগণ সনে / করিয়াছি একাদশী উপবাস / অদ্য তোমার নিকটে করিব পারণ।" (৪/২) অন্যদিকে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের লীলায় যখন দুর্বাসাদির ক্ষুধা নিবৃত্তি ঘটে, তখন তাঁরা অপরাধবোধ চালিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের আশ্রম থেকে দ্রুত পলায়ন করেন। রাজকৃষ্ণের নাটকে শুধু নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য নয়, কৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রদর্শনের জন্য চিতাপ্রজ্বলিত করা হয়েছে, যেখানে যুধিষ্ঠির আত্মবিসর্জন দেবেন। এখান থেকেই পুরাণকাহিনী আধুনিক ভক্তিমূলক নাটকে পরিণত হয়, কৃষ্ণের মুখে শোনা যায়, "ব্যথা পাই ভক্তের ব্যথায়" (৪/৫) এবং "ভক্ত প্রভু মোর, / ভক্তের কিঙ্কর আমি।" (৪/৫) এখানে যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিতত্ত্ব এবং হরিনামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ("হরিই যে ভক্ত—ভক্তই যে হরি") তা প্রাচীন পুরাণের অনুসরণ তো নয়ই, এমন কি পৌরাণিক ভাবানুষঙ্গকে কিছুটা ব্যাহত করে। নাটকের অন্তিম দৃশ্যটি চমৎকারিত্ব সৃষ্টির দিক থেকে অসামান্য। দুর্বাসা অন্যায় করেছিলেন, এখন তিনি ভীত, সন্ত্রস্ত এবং কাতর। তারপর সেখানে বংশীবদন কিশোর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দুর্বাসার মিলন তথা অভিন্নত্ব ঘোষণার

মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক আর এক ভক্তিতত্ত্বের অবতারণা ঘটে—"আজ দেখুক জগৎ নয়ন মেলে / হরিহর-রূপ একাধারে।" (৪/৬) এরপর 'পটপরিবর্তন' এবং ক্রোড় অঙ্কের মতো একত্র অর্ধবৈকুণ্ঠ ও অর্ধকৈলাশে হরি ও হরের "মিলনদৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। দুর্বাসার শিষ্যদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ভক্তি বিগলিত দেবস্তোত্র —"আধ দেবহরি, আধ দেবহর, হরিহর জীব-জীবন।" (৪/৬)

১৮৮৫ সালের ২১শে নভেম্বর রাজকৃষ্ণের 'দুর্বাসার পারণ'" বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়।

ভীষ্মের শরশয্যা ॥ যদিও নাটকের নাম 'ভীষ্মের শরশয্যা' (১৮৮৮), কিন্তু নাটকে ভীষ্মের জীবনান্ত বা পরিণামী ঘটনাবলী যথেষ্ট প্রাধান্য পায়নি। রাজকৃষ্ণের পৌরাণিক নাটকে কাহিনী ও ঘটনার চমৎকারিত্ব সে কালের দর্শকদের মুগ্ধ করতো। কিন্তু এই জন্য অনেকসময়ই তাঁর পক্ষে নাট্যকাহিনীতে সংহতি ও ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। রাজকৃষ্ণ আসলে এখানে 'পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক নাটক' লিখতে চেয়েছিলেন, ইতিবৃত্ত সবসময়ে নাট্য-লক্ষণাক্রান্ত নাও হতে পারে। 'ভীষ্মের শরশয্যা' নাটকের কাহিনী আগাগোড়া নাটকীয়, অন্তত নাট্যসম্ভাবনাপূর্ণ। নাটকটিকে অবশ্য দু'টি খণ্ডে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারতো, প্রথম তিন অঙ্কের কাহিনী মহাভারতের উদ্যোগপর্ব অবলম্বনে পরিকল্পিত, এই অংশে ভীষ্মের উপস্থিতি থাকলেও নায়কোচিত প্রাধান্য নেই। একদিকে পাণ্ডবপক্ষের শান্তিপূর্ণ রাজ্যভাগের প্রস্তাব, পরে পাঁচটি মাত্র গ্রামের প্রার্থনা, অন্যদিকে কৌরবপক্ষের অহংকৃত যুদ্ধ-প্রস্তাব এবং সূচ্যগ্র মেদিনী না দেওয়ার সংকল্প—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছে। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ চরিত্রাঙ্কনে রাজকৃষ্ণ মহাভারতীয় আদর্শ অনুসরণ করেছেন, তবে তার মধ্যে দুর্যোধন চরিত্রের উপস্থাপনে কৃতিত্বের প্রকাশ। শকুনির কূটবুদ্ধি গ্রহণ করলেও দুর্যোধন কখনোই নীচ আচরণ করতে পারেন না—এই ধারণা তাঁকে প্রতি-পক্ষের মহিমাদান করেছে। পাণ্ডবদের চরিত্রাঙ্কণে একমাত্র কৃষ্ণভক্তির আতিশয্য প্রকাশ ছাড়া অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। রাজকৃষ্ণের অন্যান্য নাটকে হাস্য-কৌতুকের অবাঞ্ছিত প্রক্ষেপ ঘটে, 'ভীষ্মের শরশয্যা' সেদিক থেকে অনেক পরিমাণে সংযত রচনা (একমাত্র তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে এক দরিদ্রা বৃদ্ধা ও শকুনিকে নিয়ে কমিক রিলিফ সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়)। তবে মহাভারতে কৃষ্ণের মধ্যে পরিহাস-রসিকতার যে ইঙ্গিত আছে, রাজকৃষ্ণ নাটকে তার সদ্ব্যবহার করেছেন। সেইসঙ্গে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মধ্যেও কিছুটা কৌতুকরস-রসিকতা সঞ্চার করেছেন নাট্যকার, কিন্তু তাতে নাটকের ভাবগাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয়নি।

চতুর্থ অঙ্ক থেকে নাট্যকাহিনীর প্রধান অবলম্বন ভীষ্মপর্ব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ

বর্ণনা এবং পরিণামে ভীষ্মের অস্ত্রত্যাগ ও শরশয্যাগ্রহণ পুরাণকাহিনীর বিশ্বস্ত অনুসরণ। বলাবাহুল্য সমগ্র ভীষ্মপর্বকে তিনটি অঙ্কের মধ্যে নাট্যরূপ দেওয়া সহজ ছিল না, কিন্তু এখানে রাজকৃষ্ণের ঘটনা-নির্বাচন ও দৃশ্য-পরিকল্পনায় দক্ষতার পরিচয় মেলে। একমাত্র অভিযোগ হতে পারে যে ভীষ্মকে নিয়ে লেখা নাটকে ভীষ্মের চরিত্রমাহাত্ম্য যেন তেমন ভাবে ফোটেনি। অথচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে ও যুদ্ধ চলাকালে বৃদ্ধ পিতামহের আত্মসংকট ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নিঃসন্দেহে অসামান্য এক ট্রাজেডির জন্ম দিতে পারতো।

আসলে রাজকৃষ্ণ 'পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক' লিখলেও মুখ্যত ভক্তিমূলক নাটকের আদর্শই তিনি এখানে গ্রহণ করেছেন। তাই নাটকে ভীষ্মের থেকেও বেশি প্রাধান্য পেয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। প্রথম অঙ্কেই কৃষ্ণের আবির্ভাব এবং সেখান থেকেই পাণ্ডবদের কাছে তিনি শুধু অর্জুনের রথের সারথি নন, "মনোরথ বাঁধা দিয়ে পাণ্ডবের শিরোরথ" (২/২) কিনে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি সকলকে দিয়ে বলিয়েছেন, "যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম, যথা ধর্ম্ম তথা জয়"। (২/৩)। বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের আতিথ্য গ্রহণের কাহিনী মহাভারত থেকে নেওয়া হলেও নাটকে এই ঘটনাবর্ণনায় উচ্ছ্বাসের আতিশয্য দেখা যায়।—"হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!" ধ্বনির মধ্য দিয়ে নাটক এমন এক স্তরে পৌঁছে যায়, যেখানে যুদ্ধ-সংঘাত সব কিছুই তুচ্ছ, বিশেষভাবে কর্ণ যখন জন্মরহস্য জানার সময়ই বলে ওঠেন—"তুমি সাক্ষাত পরব্রহ্মঈশ্বর," (৩/২) এবং "আমি যে যুদ্ধক্ষেত্রে, যুদ্ধ সময়ে / অর্জুনের রথে তোমার চরণ দর্শন করে / প্রাণত্যাগ কত্তে পাবো না, / তা হতে আমার ক্ষতি ও দুঃখ কি?" (৩/২)। তখন কর্ণ চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে (কুন্তী ও কর্ণের সাক্ষাৎ-দৃশ্যটির মধ্যেও নাট্যকারের মৌলিকতার পরিচয় মেলে—কৃতজ্ঞতা, প্রতিজ্ঞা, খ্যাতি ও কীর্তির পরিকল্পনা চমকপ্রদ)। পৌরাণিক নাটকে অলৌকিক প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ পরিহার করা সম্ভব হয় না। 'ভীষ্মের শরশয্যা' নাটকেও মহাভারতীয় কাহিনীর অনুসরণে কিছু কিছু অলৌকিক দৃশ্য স্থান পেয়েছে। কিন্তু নাটকের অন্তিম দৃশ্যে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম যে দৈববাণী শ্রবণ করে মৃত্যুর জন্য উত্তরায়ণ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, কিংবা জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের সারথি মূর্তির পরিবর্তে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি দেখতে চাইবেন এবং শুধু তাই নয়, মঞ্চেই বৃন্দাবনধামে গোপীগণ সহ রাধাকৃষ্ণ মূর্তির আবির্ভাব হবে—নাটকের দিক থেকে এগুলির কোনো প্রয়োজন ছিল না। নাট্যকার মৃত্যুকালে ভীষ্মকে দিয়ে বলাবেন—"জয় জয় রাধাকৃষ্ণ,—/ আশা মোর হইল পূরণ" (৬/১) এর মধ্য দিয়ে শুধু নাট্যকারের কৃষ্ণভক্তি নয়, সমকালের দর্শকরুচিরও পরিতৃপ্তি বিধান হয়েছে এবং সেখানেই পৌরাণিক নাটক হিসাবে 'ভীষ্মের শরশয্যা'র সার্থকতা। নাটকটি ১৮৮৬ সালের ১২ জুন বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

প্রমদ্বরা ।। নরনারীর প্রেমোপাখ্যান চিরদিনই সাহিত্যের বিষয়বস্তু। মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত মহাভারতের আদিপর্বে সেই প্রেমের এক চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে অষ্টম ( রুরু-চরিত ) ও নবম ( ডুণ্ডুভ-উপাখ্যান )• অধ্যায়ে। এই কাহিনীকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে রাজকৃষ্ণ রায় রচনা করেন তাঁর পৌরাণিকী গীতিনাটিকা—'প্রমদ্বরা'। সাবিত্রী যেমন যমরাজের কাছে ভিক্ষা করে ফিরে পেয়েছিলেন মৃত স্বামী সত্যবানের জীবন—এ কাহিনীতে রুরু তেমনি যমের সম্মতিতে নিজের অর্ধজীবনের বিনিময়ে পত্নী প্রমদ্বরার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

মহাভারতের দু'টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত সংক্ষিপ্ত কাহিনীকে রাজকৃষ্ণ নাটকের প্রয়োজনে বিস্তৃতি দিয়েছেন। দু'টি অঙ্ক ছয়টি দৃশ্যে পরিবেশিত হয়েছে প্রমদ্বরা-রুরুর অমরপ্রেমকথা।

মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমে অপ্সরা মেনকা-পরিত্যক্ত শিশুকন্যার বর্ণনায় নাট্যকার মহাভারতীয় কাহিনীর ঈষৎ পরিবর্তন করেছেন। মহাভারতের 'অকরুণা মেনকা' রাজকৃষ্ণের নাটকে মৃণ্ময় পাত্রে কন্যাকে নদীজলে ভাসিয়ে দুঃখে অশ্রুমোচন করেছেন। নদীজলে কমলমৃণালে অবরুদ্ধ মৃণ্ময়পাত্র দেখে মহর্ষি স্থূলকেশ বিচলিত বোধ করেছেন। পাত্রগ্রহণে তাঁর দ্বিধা দেখা দিয়েছে। কিন্তু মায়াকুমারীদের গানে ঋষিচিত্তের পরিবর্তন ঘটেছে। অপত্য-স্নেহে মোহিত হয়ে কন্যাসহ তিনি আশ্রমে ফিরে গেছেন। মেনকা অবশ্য এই ঘটনার মধ্যে অনাগত এক শুভ পরিণাম প্রত্যক্ষ করেছেন—"জগতে ঘটিবে নবীন ঘটনা, / কোটি কোটি লোকে করিবে রটনা, / প্রকৃতপ্রেমের প্রকৃত মহিমা / গীত হবে নরনারীর গলে।" ('নাট্যসূচনা')। স্থূলকেশ একদা প্রমদ্বরার প্রশংসাকালে জানিয়েছেন, "আমার প্রমদ্বরা প্রমদাকুলের সর্ব্বপ্রধানা।...জগতে একটি অলৌকিক অভিনব ঘটনা সংঘটনের জন্য ভগবানের কৃপায় প্রমদ্বরা আমাকে পিতা ব'লে ডাকে।" ( ১/৩ )

সেই 'অলৌকিক অভিনব ঘটনা সংঘটনের জন্য' প্রমদ্বরার প্রতি প্রেমাতুর হয়ে পড়ে ঘৃতাচী-প্রমতির সন্তান রুরু। তপোধন প্রমতি রুরুর প্রাণসখা উদ্দালকের মধ্যস্থতায় মহর্ষি স্থূলকেশের কাছে রুরু-প্রমদ্বরার বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। পুলকিত স্থূলকেশ জানান, "আমার নিতান্ত ইচ্ছা, অদ্যই গোধূলিলগ্নে শ্রীমান রুরুর হস্তে আমার প্রাণসমা কন্যা শ্রীমতী প্রমদ্বরাকে সম্প্রদান করি।" ( ১/৩ ) মহাভারতে কিন্তু প্রমতি নিজেই স্থূলকেশের আশ্রমে গিয়ে কন্যা প্রার্থনা করেছেন এবং সেখানে পাই—"মহর্ষি স্থূলকেশ ফাল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত দিবসে বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া রুরুকে প্রমদ্বরা সম্প্রদান করিলেন।"[১১৩]

উদ্দালকের মধ্যস্থতার কথা মহাভারতে পাই না—তবে কঠ, শ্বেত, উদ্দালক প্রভৃতি রুরুর বয়স্যদের উল্লেখ আছে। নাটকের প্রয়োজনে এ-চরিত্রগুলি পূর্ণতা পেয়েছে। প্রমদ্বরা-রুরুর প্রগাঢ় ভালবাসায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে প্রমদ্বরার আকস্মিক মৃত্যু। প্রমদ্বরার মৃত্যুবর্ণনায় রাজকৃষ্ণ ব্যাসদেবের অনুসরণ করেননি। মহাভারতে পাই প্রমদ্বরা সহচরীদের সঙ্গে "ক্রীড়াকৌতুক করিতে করিতে দৈবগত্যা প্রসুপ্ত ও কেলিভূমিতে পতিত এক কৃষ্ণসর্পকে পদাহত করিল। সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া বিষাক্ত দশন-পংক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করাতে সে বিবর্ণা, বিচেতনা ও ভ্রষ্টাভরণা হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িল।"[১১৩] তপোবনবাসীরা উপস্থিত হয়ে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন এবং "রুরু প্রিয়তমাকে তদবস্থ দেখিয়া নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত ও একান্ত কাতর হইয়া তথা হইতে বহির্গমন করিলেন।"[১১৩] বিলাপকালে প্রার্থনা জানালেন—"আমি যদি দান, তপশ্চরণ ও গুরুজনের শুশ্রূষা করিয়া থাকি, তবে আমার প্রিয়া পুনঃ সঞ্জীবিত হউক। আমি জন্মাবধি আত্ম-সংযম ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়া যে সকল পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি, এক্ষণে আমার প্রাণপ্রিয়া প্রমদ্বরা সেই পুণ্যবলে ভূমিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক।"[১১৪]

রাজকৃষ্ণ প্রমদ্বরার মৃত্যু পরিকল্পনায় নিজস্ব ভাবনা দ্বারা চালিত হয়েছেন। মৃত্যুর আগের দিন রুরু-প্রমদ্বরার সঙ্গে কথোপকথনকালে স্থূলকেশ আসন্ন অশুভের আভাস পেয়েছেন—"একি! অকস্মাৎ আমার বাম-বাহু, বামনেত্র যুগপৎ স্পন্দিত হয়ে উঠলো কেন? এ তো শুভলক্ষণ নয়। মঙ্গলময় শ্রীহরির নাম স্মরণ করা উচিত।" (২/১)। এরপর সকলে হরিগুণগান করে শঙ্কামুক্ত হতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পরদিন নিয়তির অমোঘ নিয়মে ধবলপর্বতে মদন-পূর্ণিমার মহোৎসবে সখী পরিবৃতা প্রমদ্বরাকে সঙ্গে করে রুরু রতিমদনের যুগলমিলন দেখতে যান। সেখানে পৌঁছে পথশ্রমে ক্লান্ত প্রমদ্বরা ক্ষণিক বিশ্রাম নিতে চান। সকলে মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য রাখতে গেলে প্রমদ্বরা এক শিলাতলে উপবিষ্ট হন। এমন সময় পাশের গর্ত থেকে "একটা কৃষ্ণ সর্পের বেগে বাহির হইয়া প্রমদ্বরার ললাটে দংশন ও পলায়ন"। (২/২)। প্রমদ্বরা যন্ত্রণাকাতর হয়ে রুরুকে আহ্বান করেন জানান, "আর জন্মে যেন আবার তোমার দাসী হয়ে পতিসেবার আকাঙ্ক্ষা মিটুতে পারি।" (২/২) তার মৃত্যুর পর সখীরা বিষবৈদ্য ডেকে চিকিৎসার কথা বলায় রুরু জানায় কালসর্পের দংশনের পর প্রাণ ফিরে পাওয়া অসম্ভব। পিতাদের ডেকে আনতে বলে একাকী বৃক্ষলতার বন্ধনে মরণোদ্যোগ করেন।

মহাভারতীয় উপাখ্যানে এ সময় দেবদূতের আগমন ঘটেছে, রুরুকে শোক সংবরণ করতে বলেছেন। শেষে ধর্মরাজের কাছে গন্ধর্বরাজ ও দেবদূত গিয়ে সম্মতি চাইলে যম জানান, "হে দেবদূত! যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে রুরুপত্নী রুরুর অর্দ্ধ পরমায়ু পাইয়া পুনর্জ্জীবিত হউক।"[১১৪] এবং প্রমদ্বরা নবজীবন

লাভের পর শুভলগ্নে পুত্রকন্যার বিবাহবিধি নির্বাহ হয়েছে।

নাটকে দেবদূতের ভূমিকা পালন করেছে মৃত্যু—সেও রুরুকে প্রাণত্যাগে বাধা দিয়েছে। সহসা যমের আবির্ভাব ঘটেছে। রুরু মৃত্যুকে বরণ করতে চাহিলে যম তার অসংগত অনুরোধ রক্ষা করতে অসম্মত হয়েছেন। শেষে রুরুর মৃত্যুবরণের অপূর্ব যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে যম বলেন—"যদি নিতান্তই তুমি জীবনমরণকে সমান জ্ঞান কর, তবে মৃতা প্রমদ্বরাকে তোমার অর্দ্ধজীবন দান কর।...অনন্ত জগতে অনন্ত কাল রুরু-প্রমদ্বরার অপূর্ব্ব দাম্পত্য-প্রেম ঘোষিত হউক।" (২/২) রুরু কর্তৃক প্রমদ্বরা পুনর্জীবিত হওয়ার মধ্য দিয়েই নাটকের পরিসমাপ্তি। পাঠক-দর্শকদের নাট্যোৎকণ্ঠা জাগিয়ে তুলতে, নাটকীয় চমক সৃষ্টিতে রাজকৃষ্ণ এ-পরিবর্তনে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বীণা রঙ্গমঞ্চে ১৮৮৯ সালে 'প্রমদ্বরা' অভিনীত হয়।

হরিহর-লীলা ॥ তিনটি দৃশ্য সমন্বিত একাঙ্ক নাটক 'হরিহর-লীলা' (১৮৮৯)। মহাদেবের মহিমা প্রচার একাঙ্কিকাটির প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর সেই উদ্দেশ্যের চরিতার্থতার জন্য দেখানো হয়েছে হরিহরের সমন্বয়।

একদা নারদের উদ্যোগে রাজনন্দিনী উমাকে ভিখারী স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন গিরিরাজ। কিন্তু আজ নিজ জামাতা শিবের প্রতি তিনি বিরূপ। শ্মশানবাসী শিবকে তিনি 'পাগল' বলে ভাবেন। তাঁকে 'পতিত', 'জাতিচ্যুত' বলে উল্লেখ করলে নারদ জানান, "আপনার জামাতা বরং পতিতকে, জাতিচ্যুতকে নিজগুণে উদ্ধার করেন।" (১/১) গিরিরাজের প্রতিবাদের ভাষায় স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় লৌকিক মহাদেবের রূপ,—"যে ব্যক্তি দিনরাত শ্মশানে বাস করে—মড়ার হাড় গেঁথে গলায় পরে মড়ার মাথায় ভিক্ষে কোরে খায়—সিদ্ধি-গাঁজার জঙ্গল উজোড় করে—উলঙ্গ থাকে—ছাই-পাঁশ মাখে, সে আবার পতিত নয়—জাতিচ্যুত নয়!" (১/১)। কন্যার এ-দুর্দশার জন্য নারদকে অভিযুক্ত করেন গিরিরাজ। বিষ্ণুর নির্দেশে নারদের মধ্যস্থতায় শিব-সমন্বয়ের আয়োজন হয়। বিষ্ণুর একনিষ্ঠ উপাসক হিমালয়ের এ ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্তন ঘটাতে এবং শিবের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মাতে হরি-হরলীলার প্রয়োজন। "যে হরি, সেই হর,—যে হর, সেই হরি" (১/১)। এ চিরসত্য গিরিরাজকে উপলব্ধি করাতে চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে শিব-সমন্বয়,—স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে শিবের মহিমা-প্রচার।

কাশীধামে ব্রহ্মা-ইন্দ্রের আনন্দ-বিহ্বলতা সেইসঙ্গে গিরিরাজের কাশীদর্শনে বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে নাটকটির সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় দৃশ্যটিতে।

তৃতীয় বা শেষ দৃশ্যে কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরে জগজ্জননী অন্নদাত্রী উমা ও অন্নপ্রার্থী শিবের মূর্তি দেখে গিরিরাজ বিস্মিত হয়েছেন। বিষ্ণু যখন বলেছেন,

"সকলে মিলিয়া আজ কাশীধাম মাঝে / শিবের প্রসাদ খাই শিবসমন্বয়ে।" (১/৩) তখন গিরিরাজের মনে হয়েছে, "এ কি বিপরীত কাণ্ড!…কোথায় দেবতা ঋষিদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে শিব, না দেবতা, ঋষি প্রভৃতিরাই উচ্ছিষ্ট খাচ্ছে শিবের!" (১/৩) এভাবে গিরিরাজের মোহ ও ভ্রমের বিনাশ ঘটলে তিনি বুঝলেন "সামান্য নহেন শিব, দেবের দেবতা।" (১/৩) তাই বললেন, "সাক্ষাৎ ঈশ্বর শিব জামাতা আমার।" (১/৩) অবশেষে জামাতারই ধ্যানে মগ্ন হলেন তিনি।

পুরাণকাহিনীতে শিবের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠালাভ সহজে ঘটেনি,—দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ থেকে শুরু করে ব্যাসের শিবনিন্দা পর্যন্ত একাধিক বিরোধ-মিলনের ঘটনার মধ্য দিয়ে পৌরাণিক শিবের মহিমা ঘোষিত হয়েছে। হরিহরের সমন্বয়-চিন্তা উনিশ শতকেও দেখা গেছে, তারই নিদর্শন রাজকৃষ্ণের 'হরিহর-লীলা'। আমাদের প্রসঙ্গত মনে পড়বে 'অবসর-সরোজিনী'র তৃতীয় ভাগে স্থান পেয়েছে সচিত্র 'হরিহর মূর্ত্তি : স্তবগীতি'—সেখানেও কবির প্রতিপাদ্য হলো "আধ দেব হরি, আধ দেব হর, হরিহর জীব-জীবন।"

প্রহ্লাদ-মহিমা বা প্রহ্লাদ-চরিত্র দ্বিতীয় খণ্ড ॥ (১৮৯১) নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, নাট্যকার প্রহ্লাদকে নিয়ে নাটক লিখে একদা অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করার ফলে প্রহ্লাদ-কাহিনীর উত্তরার্ধ অবলম্বনে আর একটি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। নাটকের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন, "যাঁহারা বেঙ্গল থিয়েটারে ও মদীয় বীণা থিয়েটারে মৎপ্রণীত প্রহ্লাদ-চরিত্র নাটকের অভিনয় দেখিয়াছেন, এবং যাঁহারা উক্ত নাটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য উহার দ্বিতীয় খণ্ড—'প্রহ্লাদ-মহিমা' নাটক রচনা করিলাম। সেই সকল সহৃদয় মহাশয়গণ সেটির ন্যায় এটিরও প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমি যার-পর-নাই অনুগৃহীত ও বাধিত হইব।"[১১৫] নাটকের আখ্যাপত্র থেকে আমরা জানি রাজকৃষ্ণের এই নাটকটিও 'বীণা-রঙ্গভূমিতে অভিনীত' (প্রথম অভিনয় ১লা নভেম্বর ১৮৯০)। কিন্তু 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে'র মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তা কোনোদিনই 'প্রহ্লাদ-মহিমা' লাভ করতে পারেনি। তার একটি কারণ নিশ্চয় এই যে, ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত প্রহ্লাদ-কাহিনীর সঙ্গে বাঙালি মাত্রেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, আর সেই পরিচিত কাহিনী অবলম্বনেই 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' লেখা হয়। কিন্তু 'প্রহ্লাদ-মহিমা' কাহিনী সুপ্রসিদ্ধ পুরাণগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়নি, নাট্যকারও নাটকটিকে তাই 'পৌরাণিক নাটক' না বলে 'হরিভক্তিমূলক নাটক' আখ্যা দিয়েছেন।

'প্রহ্লাদ-মহিমা' আকারে ক্ষুদ্র, কাহিনীর মধ্যে জটিলতা বা বিস্তার নেই। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর 'প্রহ্লাদের রাজ্যাভিষেক' ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান সেখানে বলেছেন, "তুমি এই মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত এখানে থেকে দৈত্যেশ্বরদের ভোগ্য রাজ্য ভোগ কর। মদ্‌গতচিত্ত হয়ে তুমি আমার প্রিয় কার্য্য সাধন কর, সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান যজ্ঞেশ্বর আমাকে যজ্ঞ দ্বারা আরাধনা কর।"[১১৬] রাজকৃষ্ণের নাটকে প্রহ্লাদ পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন গ্রহণে অনিচ্ছুক, পরে মাতৃআজ্ঞায় রাজ্যগ্রহণে সম্মত হলেও তিনি তার পূর্বে হরিনাম প্রচারের জন্য সর্বত্র পরিভ্রমণ করতে চেয়েছেন—"আমার স্বর্গীয় পূজ্যপাদ পিতার রাজ্য অতি বিশাল প্রজাসংখ্যা আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় অসংখ্য, সুতরাং এখনও কোটি কোটি প্রজা হরিভক্তিহীন হয়ে আছে। অগ্রে আমি সমস্ত প্রজাকে পরম পবিত্র হরিভক্তিরূপ অক্ষয় অমৃতে অভিষিক্ত করি, শেষে রাজসিংহাসনে স্বয়ং অভিষিক্ত হব।" (১/১) বলাবাহুল্য, সমস্ত বিধর্মী নাস্তিককে শুধু আস্তিকে পরিণত করা নয়, সর্বধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শও প্রহ্লাদের মধ্যে কাজ করেছে। উনিশ শতকের শেষপাদে বাংলা দেশে এই মনোভাব অপ্রত্যাশিত নয়। অলৌকিক ক্রিয়াকলাপেও তখন বিশ্বাস ছিল, ফলে ভগবান্ যে ভক্তাধীন তা দেখানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণকে চামর-ব্যজন থেকে শুরু করে নিজে আহারান্তে উচ্ছিষ্টদান পর্যন্ত সবই করতে হয়েছে। দস্যু দলপতি ভোঁরার সঙ্গে ধর্মীয়-বিতর্ক বড়োই অদ্ভুত, রাজপুত্রের দামি পোষাক বা জড়োয়া গয়নায় তার লোভ নেই, তার একমাত্র উদ্দেশ্য কালীমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা। তারপর প্রহ্লাদের উদ্ধার লাভের জন্যই দস্যুদলপতির কন্যা চাঁদনীর সর্পাঘাতে মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভ। কাহিনীর মধ্যে চমৎকারিত্ব আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু কোথাও কোনো সংগতি-সূত্র নেই। শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদকে জানিয়েছেন, "তুমি সমস্ত ভেদবাদী দ্বৈতবাদী এবং নাস্তিকগণের ভয়ঙ্কর ভববন্ধন মোচন করবার জন্যই সামান্য রজ্জু বন্ধনে আবদ্ধ হয়েচ।" (২/৩) একথা সম্ভবত যে কোনো ধর্মাত্মা মহাপুরুষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কিন্তু মহাপুরুষকে নিয়ে নাটক লেখা কঠিন।

একমাত্র মাতা কয়াধুর চরিত্রে বাৎসল্যরসের পরিস্ফুটনে কিছুটা মানবিকতা লক্ষ্য করা যায়। তা না হলে অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলি প্রহ্লাদমহিমা প্রকাশের বাহন মাত্র। কমিক্ রিলিফ্ হিসাবে খোঁড়া ও কানার অবতারণার প্রয়োজন ছিল না, শুক্রাচার্যের গাম্ভীর্য এখানে রক্ষিত হয়নি। তুলনায় দস্যু বালক ও বালিকাদের খেলা ও গান, তত্ত্বপ্রচারের আগ্রহাতিশয্যকে সাময়িক বিরতি দিয়েছে, এবং নাট্যকাহিনীর দিক থেকেও প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছে। দস্যুদের বলা হয়েছে 'জঙ্গলী' এবং তাদের মুখে এক অদ্ভুত আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। তাদের গান বেশ উপভোগ্য—

'ফুল্ ফুট্‌লা ফুট্‌লা পেড়্'পর্ ভেইয়া।
ফল্ টুট্‌লা টুট্‌লা দেখ্‌লে, হেঁইয়া ॥
ছুটি ছুটি, গুটি গুটি, খুঁটি খুঁটি লে লে,

হটিপুটি, লুটিপুটি, ঝুটিপুটি দে দে ;—
চল্ ঘরুয়া ফিরুয়া ফুলুয়া লেইয়া।
আজ্ ভালিয়া সাজ্‌বা কালিয়া মেইয়া।' ( ২/৪ )

'প্রহ্লাদ-মহিমা' জনপ্রিয়তা লাভ না করার একটি কারণ সম্ভবত রাজকৃষ্ণ এখানে ভাঙা অমিত্রাক্ষর বা পদ্যছন্দের পরিবর্তে অধিকাংশ স্থানে গদ্য ব্যবহার করেছেন। কোথাও গদ্য বেশ সাবলীল ও সহজ হলেও, গদ্যের মধ্য দিয়ে ভক্তিরসের প্লাবন সৃষ্টি সম্ভব নয়। সেইজন্যই মনে হয় নাটকে অনেকগুলি গানের সমাবেশ, তেমনি মাঝে মাঝে পদ্যচ্ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে সংলাপ কাহিনীর ভাবসমুন্নতি রক্ষায় সক্ষম হয়নি।

নরমেধ-যজ্ঞ ।। রাজকৃষ্ণের 'নরমেধ-যজ্ঞ' পুরাণ-কাহিনীর সম্ভাবনাকে আশ্চর্য কৌশলে ব্যবহার এবং পুরাণের নবজন্মের একটি সার্থক নিদর্শন। 'ভক্তি ও করুণ রসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক' নামে অভিহিত এই রচনাটি স্টার রঙ্গমঞ্চে মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৮৯১ সালের ১৩ জুন নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়—পরবর্তীকালে বহুদিন অভিনয় চলে। যদিও নাটকটি প্রকাশিত হয় প্রথম অভিনয়ের প্রায় দেড় মাস পরে ১লা আগস্ট। নাটকের গান অত্যন্ত জনসমাদর লাভ করেছিল।

নাটকের প্রধান চরিত্র নহুষ-পুত্র যযাতি, পুরাণখ্যাত চরিত্র। তবে যযাতির জীবনে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার আবির্ভাব বা পুত্র পুরুর সঙ্গে যৌবন-বিনিময়ের কাহিনী নিয়ে অনেক নাটক লেখা হলেও পিতৃ-আজ্ঞায় ব্রাহ্মণ বালককে যজ্ঞাহুতি দেওয়ার কাহিনী তেমন বহুল প্রচলিত নয়। পুরাণকাহিনীতে যযাতি আদর্শ রাজা বলে বর্ণিত হলেও তাঁর পরবর্তী অধঃপতনের কাহিনী গোপন করা হয়নি। 'নরমেধ-যজ্ঞে' যযাতির পূর্বজীবন বর্ণিত হয়েছে, তখনও তিনি অকৃতদার। অশোক বনে পুষ্পবেদিকায় উপবিষ্ট রাজা নৃত্য-গীত ও বিলাসে দিন যাপন করেন। এমন সময় তিনি এক 'অলৌকিক অদ্ভুত স্বপন' দেখেন—যে স্বপ্ন অনাগত মানস-সংকটকে আভাসিত করে। সম্ভবত স্বপ্নের মধ্যেই পিতা নহুষের প্রেতাত্মার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। প্রেতাত্মার পরিকল্পনায় শেক্‌সপীয়রীয় নাটকের প্রভাব কাজ করতে পারে, যযাতির অন্তর্দ্বন্দ্বও অনেক পরিমাণে রোমান্টিক ট্রাজেডির নায়কের 'intestinal warfare of the spirits' প্রকাশ করেছে। নহুষের প্রেতাত্মা এসে জানিয়েছেন, "নরমেধ-যজ্ঞ বিনা / পাপ তোর ঘুচিবে না / তোর পাপ না ঘুচিলে স্বর্গলাভ / নাহি হবে মোর।" ( ১/৩ ) বলাবাহুল্য পুরাণ-কাহিনীতে নরমেধ-যজ্ঞ কোনো অভূতপূর্ব ঘটনা নয়। বিশেষত মুনি নারদ যখন যজ্ঞের উপায় ও পদ্ধতি নির্দেশ করছেন এবং কাহিনীশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন এসে অগ্নিকুণ্ড

থেকে ব্রাহ্মণ বালককে রক্ষা করছেন, তখন সব কিছুরই এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। উনিশ শতকের শেষপাদে বাংলা নাটকে ভক্তিরসের প্লাবন যখন দেখা দিয়েছে, তখন এই ধরনের অলৌকিক ঘটনাপরিপূর্ণ ভগবৎ-মহিমামূলক নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রাজকৃষ্ণের কৃতিত্ব তিনি ভক্তিরসাত্মক এই কাহিনীকে মানবরসপুষ্ট করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ এখানে শুধু পুরাণের ধর্ম নয়, নাটকের ধর্মও রক্ষিত হয়েছে।

রাজকৃষ্ণের যযাতি যথার্থ ট্রাজেডির নায়ক। পিতার প্রতি পরম শ্রদ্ধা-পরায়ণ হয়েও পিতার আদেশে নরমেধ-যজ্ঞ সাধনে তিনি প্রবৃত্ত হতে পারেন না। শুধু তীব্র মানসিক অশান্তি নয়, তীব্রতর অন্তরসংঘাতে তিনি ক্ষতবিক্ষত হন,—"দিন যায় দিন আসে / দিনে দিনে দারুণ ভাবনা বাড়িয়া উঠিছে, / মনে সমুদ্র সমান ; / পলে পলে আকুলিত হইতেছে প্রাণ!" (২/৫) একদিকে পিতার স্বর্গলাভ এবং সেজন্য পিতৃআদেশ পালনের বাধ্যতা, অন্যদিকে হৃদয়বত্তা ও মানবতাবোধ, যা তাঁকে নরমেধ-যজ্ঞের বিরোধী করে তুলেছে। নারদের প্ররোচনা সত্ত্বেও যযাতি দ্বিধামুক্ত হতে পারেন না। এমনকি নাটকের অন্তিম দৃশ্যে তাঁর দ্বিধাকাতর চিত্তের যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে তিনি নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছেন,—"এ জলন্ত নরমেধ-যজ্ঞ-হুতাশনে।" (৫/৪) বালককে যখন হোমকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয়েছে, তখন যযাতি মূর্ছিত হয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনীতে বিশেষত ভক্তি মূলক নাটকে এই ধরনের রক্তমাংসের জীবন্ত মানবচরিত্রের সাক্ষাৎ খুব বেশি মেলে না।

ঋষ্যশৃঙ্গ ।। রামায়ণে বালকাণ্ডের নবম-দশম সর্গে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ-কাহিনীর মধ্যে আছে আশ্চর্য নাটকীয়তা, যে জন্য তাঁকে নিয়ে পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে অনেক গল্পকথা। রবীন্দ্রনাথ যখন 'পতিতা' কবিতা লেখেন তখন সেই দেবশিশুসম তরুণ-তাপসের বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টির অসামান্যতা থেকে প্রাধান্য পায় এক পতিতা নারীর আত্মজাগরণ—"জননীর স্নেহ, রমণীর দয়া, কুমারীর নব নীরব প্রীতি"[১১৭] জেগে ওঠে বারাঙ্গনা-চিত্তে। আধুনিক কালে বুদ্ধদেব বসু যখন 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটক লেখেন তখন জানান, "এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত, এবং রচনাটিও শিল্পিত—অর্থাৎ, একটি পুরাণ কাহিনীকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলাবাহুল্য, এ ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না ; কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন।"[১১৮] রাজকৃষ্ণ রায় যখন ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে

নাটক লেখেন তখনও পুরাণকাহিনীর কিছুটা পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু সে পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ বা বুদ্ধদেবের মতো মূল কাহিনীকে কোনো নতুন তাৎপর্য দেয়নি। আসলে রাজকৃষ্ণ বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ঘটনার চমৎকারিত্বের জন্য; চরিত্রের গহন গভীর রহস্য তাঁর কোনো নাটকেই তেমন প্রাধান্য পায় না, 'ঋষ্যশৃঙ্গ' নাটকও সেদিক দিয়ে চরিত্র ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেয়নি।

রাজা লোমপাদ রাজকৃষ্ণের নাটকে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। রামায়ণে লোমপাদের পাপের বিশদ পরিচয় নেই, শুধু বলা হয়েছে, "এই রাজার দোষে অঙ্গদেশে সর্ব্বভূত-ভয়াবহ ঘোরতর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইবে।"[১১৯] নাটকে রাজার কেলিকুঞ্জের শুধু বর্ণনা নয়, তাঁর নিজের মুখে শোনা যায়,—"আমি দেবনিন্দক, বিপ্রনিন্দক, প্রজাঘাতী, অতি নিষ্ঠুর ক্ষত্রকুলের চণ্ডাল!" (১/২) তারপর রাণীর আহ্বানে তাঁর মধ্যে জাগে আত্মগ্লানি, দুরাচারী রাজা কর্তব্যপালনে অগ্রসর হন। এই পরিবর্তন আকস্মিক ও পূর্বপ্রস্তুতিহীন, কিন্তু নাট্যকাহিনীতে চমক সৃষ্টি করেছে। রাণী করুণার পরিকল্পনা রাজকৃষ্ণের মৌলিক সংযোজন। 'রাজা ও রাণী'র সুমিত্রার সঙ্গে রাণী করুণার সাদৃশ্য চোখে পড়ে। রাজকন্যা শান্তা নাটকে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, যদিও বুদ্ধদেবের নাটকের মতো তার নবজন্ম ঘটেনি। রামায়ণে তপোবন থেকে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনার জন্য রাজা পাঠিয়েছিলেন একদল বারাঙ্গনা। নাটকে বৃদ্ধা লম্বোদরী বারাঙ্গনা দলের নেতৃত্ব দেয়, এবং তারই কৌশলে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনা সম্ভব হয় চম্পানগরীতে। বারাঙ্গনাদের ময়ূরপঙ্খী নৌকার বর্ণনা ও তপোবনে দুদিন অবস্থান নাটকের প্রয়োজনে রাজকৃষ্ণের সংযোজন। বিভাণ্ডকের চম্পানগরীতে আগমন রামায়ণে বর্ণিত না হলেও নাটকে এই ঘটনার গুরুত্ব আছে। পুরাণে যে কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত স্বল্প পরিসরে বর্ণিত তিন অঙ্কের নাটকে তাকে বিস্তার দান করতে হয়েছে। বিভাণ্ডককে দিয়ে কাহিনীর শেষে ভরতবাক্য উচ্চারণ অসংগত না হলেও তাঁর সঙ্গে লম্বোদরীর বাচালতা অসহ্য। রাজকৃষ্ণ সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে একটি বিদূষক চরিত্রের অবতারণা করেছেন, কিন্তু নর্মসখার সংলাপ ও আচরণ পৌরাণিক নাটকের গাম্ভীর্য রক্ষায় অক্ষম।

ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে রাজকৃষ্ণ সম্ভবত বাংলায় প্রথম নাটক রচনা করেন। ১৮৯২ সালের ৩১ ডিসেম্বর নাটকটি প্রকাশিত হয়। কাহিনী নির্বাচনে তাঁর নাট্যপ্রতিভার পরিচয় মেলে। ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনী একান্তভাবে মানবরসপুষ্ট, এবং সেইজন্যই একালের দর্শককেও এই নাটক আকৃষ্ট করে। পুরাণকাহিনীর যেটুকু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন নাট্যকার তাও অনিবার্য বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনীর মধ্যে মানবমনস্তত্ত্বের যে চিরন্তন রহস্য ও অসামান্য কবিত্ব নিহিত ছিল তার সুযোগ রাজকৃষ্ণ গ্রহণ করেননি। ফলে রাজকৃষ্ণের 'ঋষ্যশৃঙ্গ' বাংলা পুরাণাশ্রয়ী নাটকের

সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে মাত্র, স্থায়ী নাট্যমূল্য লাভ করতে পারেনি।

'ঋষ্যশৃঙ্গ' ১৮৯২ সালের ২৪ ডিসেম্বর স্টারে প্রথম অভিনীত হয়।

গিরি-গোবৰ্দ্ধন ।। পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাশাপাশি ক্ষুদ্র একাঙ্কিকা রচনাতেও রাজকৃষ্ণের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, তার নিদর্শন 'গিরিগোবর্দ্ধন' (১৮৯২)। ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধন-ধারণের কাহিনী শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধ চতুর্বিংশ ও পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনী অবলম্বনে নাটকের তিনটি দৃশ্যের পরিকল্পনা।

বৃন্দাবনে শ্রীদাম-সুদাম-বলরামের সঙ্গে বালক শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার মধ্য দিয়ে নাটকের সূচনা। সেখানে নারদের আগমন এবং কৃষ্ণকে ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ করতে অনুরোধ। নারদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ জনান্তিকে জানিয়েছেন "আমি তাকে আমার অনন্ত শক্তি ও অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে পুনর্ব্বার আমার অধীন কোর্বো। নারদ! ইন্দ্র ঈশ্বর নয়—ঈশ্বর আমি।" (১/১) বালকের মুখে এ-ধরনের আত্মগর্বী মন্তব্য সংগত বা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে পিতা নন্দ শ্রীকৃষ্ণের কাছে ইন্দ্রযজ্ঞ করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জানিয়েছেন,—"ভগবান্ ইন্দ্রই বর্ষা ঋতু। মেঘ সকল তার মূর্ত্তি। ইন্দ্র মেঘ দ্বারা বারিবর্ষণ করেন বোলে শস্যোৎপত্তি হয়। সেই শস্যে আমাদের ধেনু ও বৎসগণের জীবনরক্ষা হয়। তাই আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ কোরে থাকি।" (১/২) রাজকৃষ্ণ-সৃষ্ট নন্দের এ-উক্তির সমর্থন মেলে শ্রীমদ্‌ভাগবতে। সেখানে, "নন্দ বললেন, বাছা, ভগবান ইন্দ্র পর্জন্যরূপী, মেঘগুলি তাঁর প্রিয় মূর্তি। সেই সব মেঘ প্রাণীদের প্রীতিসাধক ও জীবনরক্ষার অপরিহার্য জল দান করে থাকে। আমরা ও অন্যান্য মানুষরা সেই মেঘপতি ঈশ্বর ইন্দ্রকে তাঁরই বর্ষণ-করা জলে উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে তাঁর যজ্ঞ করে থাকি।"[১২০] নাটকে কৃষ্ণ এ-কথার প্রত্যুত্তরে বলেন—"ইন্দ্র জলবর্ষণ করে না;—পর্ব্বত জলবর্ষণ করে।… পর্ব্বতে মেঘোৎপত্তি হয়, পর্ব্বতই জলের প্রত্যক্ষ দেবতা।" (১/২)

ফলস্বরূপ নাটকের তৃতীয় বা শেষ দৃশ্যে গোপ-গোপীদের ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্তে গোবর্ধন-যজ্ঞের আয়োজন করতে দেখা যায়। এখানেও নারদের আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের মঙ্গলকামনা করে তিনি ইন্দ্রলোকে গমন করেছেন—ইন্দ্রকে কৃষ্ণকাণ্ড জ্ঞাপন করে রুষ্ট করতে।

গোবর্ধন-পর্বতে গোপাল-দর্শন, তাঁর মাথায় উজ্জ্বল দৈব-জ্যোতির প্রকাশ, আপন পুত্রের এ-ধরনের ক্রিয়া-কলাপ নন্দ-যশোদাকে বিস্ময়বিমূঢ় করে তুলেছে। অলৌকিক দৈব-শক্তির প্রকাশে কৃষ্ণের মহিমা নিরূপণের চেষ্টা চলেছে।

অল্প পরেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘনিয়ে এলে নন্দ কৃষ্ণের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে

বলেছেন,—"...তোরই জন্য আজ অকস্মাৎ এই সর্ব্বনাশ! ভগবান্ ইন্দ্র যজ্ঞপূজা না পেয়ে অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছেন। তাই এই জীবসংহারিণী ব্রজবিধ্বংসিনী বৃষ্টি।" (১/৩) ভয়ার্ত যশোদা-নন্দকে আশ্বস্ত করে শ্রীকৃষ্ণ তখন বলেছেন,—"আমি আমার বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে তাঁর বাসপীঠ গিরিগোবর্দ্ধনকে ছত্রের ন্যায় উর্দ্ধে উত্তোলন কোরে রাখবো। আপনারা সকলে তার নিম্নদেশে অবস্থান করুন।" (১/৩)—গোবর্ধনই সকলকে রক্ষা করবেন। ভাগবতেও পাই—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক হাতে গোবর্ধন পর্বতকে তুলে, বালক যেমন ছাতা ধরে থাকে তেমনি অবলীলাক্রমে, তাকে ধরে রইলেন।"[১২১] সকলকে জানালেন, "তোমরা গোধন-সহ এই গিরিগর্তে প্রবেশ কর।"[১২২]

যশোদার মাতৃবাৎসল্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের পর্বত ধারণকালে তাঁর উৎকণ্ঠা প্রকাশের মধ্য দিয়ে,—"ওগো সকলে হাত দিয়ে পর্ব্বত ধর। গোপাল আমার অতি শিশু। হাতে বড় ব্যথা পাচ্চে।" (১/৩)

নাটকের শেষে ইন্দ্রের মুহূর্তিক আবির্ভাবে চমক সৃষ্টি হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র সলজ্জ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করে স্বীকার করেছেন তিনি ঈশ্বর নন। বলেছেন, "হে অনন্তশক্তি মধুসূদন হরি। আমার অসার দর্প চূর্ণ হয়েছে। আমায় ক্ষমা কর, নারায়ণ!" (১/৩)। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও বিস্মিত ইন্দ্রকে আত্মসমর্পণ করতে দেখা যায়—"ভগবান ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা ও সুখেচ্ছা ত্যাগ করে সাতদিন পর্যন্ত পর্বত ধারণ করে রইলেন, মুহূর্তের জন্যও তিনি স্থান থেকে বিচলিত হলেন না।...শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে দেবরাজ ইন্দ্রও বিস্মিত হলেন। তিনি গর্ব ও অভিমান ত্যাগ করে তাঁর আজ্ঞাবাহী মেঘদের বর্ষণ করতে বারণ করলেন।"[১২২]

পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ গিরিগোবর্ধন-লীলার স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন, "অসার ধনগর্বী নরাধমদের গর্ব খর্ব" করাই তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য। হরির গুণ-মাহাত্ম্য কীর্তনের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি। বালক শ্রীকৃষ্ণের এই ধরনের চারিত্রিক পরিণতি বিশ্বাস্যতার সীমা অতিক্রম করে।

শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা ॥ শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিপ্রপত্নীদের অন্নগ্রহণ' অংশ অবলম্বনে রাজকৃষ্ণ রায় তিন-অঙ্ক-বিশিষ্ট নাটক 'শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা' রচনা করেন। নাটকটি ১৮৯২ সালে প্রকাশিত। ১৮৮৯ সালে অর্থাৎ প্রায় বছর তিনেক আগে ১৪ সেপ্টেম্বর বীণাতে অভিনীত হয়। 'শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা' সাময়িক মঞ্চসাফল্য লাভ করেছিল, কিন্তু নাট্যকাহিনীর দুর্বলতাও নাট্যসমালোচকদের চোখে পড়েছিল।

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাল-গোপাল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর স্বরূপ স্মরণ করে বলরাম যশোদার প্রতি স্বগতোক্তি করেছেন—"আমিই অনন্ত, আমারি হৃদয়

কন্দরে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ হরি, তোর গোপালরূপে অনন্তকাল যোগনিদ্রায় নিদ্রিত। …জাগিয়ে ভগবানের নব নব মানবী লীলা দেখবো।" ( ১/১ )

শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষার কারণ নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নারদের কথায় জানা যায়,—"আজ ভগবান, অগ্রজ বলভদ্রের সহিত অন্নভিক্ষা রূপ অভিনব লীলায় জীবগণকে ভক্তি শিক্ষা দিচ্ছেন।" যশোদাকে তাঁর এই সংবাদ জানানোর কারণ হিসেবে তিনি বলেন,—"আজ যশোদার বাৎসল্যভাব দর্শন কর্বো। সেই বাৎসল্যভাব অন্য অন্য জননীগণকে শিক্ষা দেবো।" ( ৩/১ ) দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেও স্বগতোক্তি করেছেন, "আজ আমার সাধের ব্রজধামে আর একটি নূতন লীলা প্রচার করবো।"

বালক কৃষ্ণ বন্ধুদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের উপায় জানাতে গিয়ে বলে,—ঋষিরা স্বর্গকামনায় আঙ্গিরস যজ্ঞ করছেন। সেই যজ্ঞান্ন ভিক্ষা করে আনলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হবে। ঋষিরা সম্মত না হলে সে-ভিক্ষা ঋষিপত্নীরা দেবেন। কারণ "নারী জাতি ঈশ্বরের পার্থিব মূর্ত্তি।" ( ২/১ ) মূলে পাই, কৃষ্ণ বলছেন, "ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা স্বর্গকামনা করে আঙ্গিরস নামক বহুজনসাধ্য যজ্ঞ করছেন। সেখানে গিয়ে অন্ন চেয়ে আন।"[১২৩]

কংস শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে নিধনের জন্য ঋষিদের দিয়ে আঙ্গিরস যজ্ঞের আয়োজন করেন। কৃষ্ণ যজ্ঞান্নের অগ্রভাগ গ্রহণ করে কংসের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করার চেষ্টা করেন। সহায়তা করেন বন্ধুরা, ঘূর্ণিকা এবং ঋষিপত্নীরা ষড়রিপুর মত 'ষড়্‌ঋষি', রাম-কৃষ্ণ-বধের জন্য উদ্যোগী হন।

জঠর এ-নাটকে ঋষিদের অনুগত একটি পার্শ্বচরিত্র। সে কৃষ্ণবিদ্বেষী হলেও তার স্ত্রী ঘূর্ণিকা কৃষ্ণের একান্ত অনুরাগিণী। তাই জীবনের অন্তিম প্রহরে সে কৃষ্ণপদধ্বনি শুনতে পেয়েছে, দেখেছে তার "ইষ্টদেবতার রাঙা পা দু'খানি" ( ২/৫ )। জঠর তার "শরীরকে বেঁধেচে, কিন্তু মনকে বাঁধ্‌তে পারেনি।" ( ২/৫ )। তার ভক্ত-মন শক্তির বাঁধন ছিন্ন করে কৃষ্ণপদে আশ্রয় নিয়েছে। পরে ভয়ার্ত জঠরও ঘূর্ণিকাকে দেবীমূর্তিতে কৃষ্ণের সঙ্গে দর্শন করে আত্মনিবেদন করেছে। শুধু সে নয়, ব্রাহ্মণেরাও আত্মসমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে, অপরাধবোধে ক্লিষ্ট হয়ে কৃষ্ণের আশ্রয়ভিক্ষা করেছে। কৃষ্ণের দৈববাণী শোনা গেছে—"জঠর! যাবজ্জীবন তুমি ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের পূজা কর" ( ২/৫ )—কৃষ্ণ-রামনাম কীর্তন, শ্রবণ, স্মরণ, চিন্তন করলে চরমে কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি ঘটবে। "বিপ্রগণ!…ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ কর, চরমে তাঁর পাদপদ্মে মোক্ষলাভ করবে।" (২/৫) নাটকের ঘূর্ণিকা-কাহিনী ভাগবতে নামবিহীন ভাবে বর্ণিত—"কোন এক নারী স্বামী কর্তৃক নিরুদ্ধ হওয়ায় কৃষ্ণদর্শনে আসতে পারেননি, সেজন্য তিনি যেমন শুনেছিলেন ধ্যানযোগে সেইভাবে নিজের হৃদয়ে ভগবানকে আলিঙ্গন করে কর্মানুবন্ধী লৌকিক দেহ ত্যাগ করলেন।"[১২৪]

কৃষ্ণের মনোহর রূপবর্ণনার ক্ষেত্রেও ভাগবতের সঙ্গে নাটকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নাটকে কৃষ্ণের চরণে ঋষিপত্নীদের 'পরমগতি লাভেচ্ছা' ভাগবতে তাদের 'ভগবত-গতি' প্রাপ্তি কামনার অনুসরণে কল্পিত।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে গোপালের জন্য যশোদার স্নেহ-ব্যাকুলতার প্রকাশ ঘটেছে। ঋষিপত্নীদের গোপাল-পূজা দেখে তিনি ভীত হয়ে ভেবেছেন, এটি কংসেরই কোনো দুরভিসন্ধি। নাটকের শেষে কৃষ্ণ মাকে সান্ত্বনা দিয়ে জানায়—"আমি তো সামান্য শিশু ছেলে, স্বয়ং ভগবান্ হরি, ভক্তের কান্নার ডোরে বাঁধা হন।" (৩/২) এখানেই লেখকের মূল বক্তব্যটি নিহিত—ভক্তি থাকলে ভক্ত ভগবানকে পাবেই।

নাটকটি আকারে ক্ষুদ্র। অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে। নাট্যকারের কল্পনা ভক্তিরসের স্রোতে সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতার সীমা অনেকসময়ই লঙ্ঘন করেছে। আগের অঙ্কে যে শিশুকৃষ্ণ দোলায় দুলে ঘুমপাড়ানি গান শুনে ঘুমোয়, পরের অঙ্কে সে-ই রাধার সঙ্গে প্রেমালাপে রত হয়। যে-কৃষ্ণ মাকে পায়ে ব্যথা লাগছে বলে কোলে নিতে বলে, সে-ই পরমুহূর্তে তত্ত্বকথা শোনায়, কখনও বা দেবমহিমা প্রদর্শন করে। এ-সব অসংগতি বাদ দিয়ে নাটকের সংগীত-রচনা সুন্দর বলা যায়। বিশেষত বালগোপালের উদ্দেশে গীত কিছু গানকে 'Nursery Rhymes' এর পর্যায়ভুক্ত করা যায়। যেমন,—"আমার গোপাল দোলে দোলার কোলে" গানটি।

নাটকে কংসের ভূমিকা নিতান্ত সামান্য। যশোদার মাতৃসুলভ আচার-আচরণ বাৎসল্য-ভাব প্রকাশে অত্যন্ত বাস্তব, সেখানে ঘরোয়া চিত্রই ফুটে উঠেছে।

## ।। ভক্তিমূলক নাটক ।।

বাংলা পৌরাণিক নাটক সাধারণত ভক্তিরসাশ্রয়ী। অপৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে লেখা নাটকে ভক্তিরস প্রাধান্য পেলে তাকে আমরা স্বতন্ত্রভাবে 'ভক্তিমূলক নাটক' নামে অভিহিত করতে পারি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটা বড়ো অংশ দেবমাহাত্ম্য-মূলক কাহিনী আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে। সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থগুলিতে পৌরাণিক দেবদেবীর লীলা বর্ণিত হয়েছে, বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কাহিনী পাওয়া যায়। এদিক থেকে মঙ্গলকাব্যকে বাংলা-পুরাণ বলা অসংগত নয়। মঙ্গলকাব্যে পুরাণের অনুসরণে বৈধীভক্তি তথা সকাম ভক্তির প্রকাশ হয়েছে। অন্যদিকে বৈষ্ণব সাধনায় অহৈতুকী ভক্তি দেখা গেছে। উনিশ শতকে বাঙালির চিন্তায় ও চেতনায় একদিকে যেমন সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাব প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি পৌরাণিক ও বৈষ্ণব ভক্তির একত্র প্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য প্রাচীন আলংকারিকেরা সাহিত্যে ভক্তিরসকে স্বীকার করেননি,—তাঁদের মনে হয়েছে ভক্তিভাব কখনও এত সম্পন্ন হতে পারে না, যাতে রসের বা আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশ ঘটতে পারে। আবার অভিনবগুপ্তের মতো কারও মনে হয়েছে ভক্তিরস আসলে শান্তরসেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে বা শাক্ত-সংগীতে যে ভক্তিরসের প্রকাশ ঘটেছে তাকে শান্তরসের অন্তর্গত বললে তার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। আধুনিক কালে রসতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তাই মন্তব্য করেছেন, "আমরা চাই বৈষ্ণব বা শাক্ত সাধকের ভক্তি, অন্ততঃ বহিরাশ্রয় তাহার দ্বৈতবাদ, এবং পরমদেবতা সেখানে আত্মরূপে নয়, কিন্তু ব্যক্তিরূপে অর্থাৎ স্বামী, প্রেমিক, সখা, অথবা মাতা বা পিতার রূপে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্য দিয়া প্রকাশ পান। তাঁহাকে পূজা করা যায়, ভালবাসা যায়, তাঁহাকে আদর করা যায়, তাঁহার প্রতি অভিমান করা যায়, রাগ করা যায়, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিচিত্র মানবীয় লীলা সম্পন্ন করা যায়। এই ভক্তির পাত্র হইতেছেন গৌরচন্দ্রের হৃদয়-সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ এবং রামপ্রসাদের 'মা', শান্তরসে এই লীলা চলে না।"[১২৫] উনিশ-শতকে বাংলা দেশে জ্ঞানসর্বস্ব অদ্বৈতবাদের চর্চা কখনো দেখা গেলেও, প্রীতিসর্বস্ব দ্বৈতবাদই ভক্তিসাধনার ভিত্তি রচনা করে। ভক্তিমূলক নাটকেও তাই শ্রদ্ধা প্রীতি বা শুদ্ধাভক্তির প্রকাশ ঘটেছে, যার নিদর্শন রাজকৃষ্ণের 'মীরাবাই' ও 'হরিদাস ঠাকুর' নাটক। তবে যেখানে সকাম ভক্তি বা বৈধীভক্তির প্রকাশ, সেখানে তাকে শান্তরসের অন্তর্গত করলে ভুল হবে না, যার নিদর্শন মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে লেখা রাজকৃষ্ণের 'সত্যমঙ্গল' ও 'রাজা বংশধ্বজ'। ভক্তিমূলক নাটকের আলোচনায়

তাই দুটি স্তর নির্দেশ অসংগত মনে হয় না। যদিও সর্বত্র দুটি স্তরকে দুটি স্বতন্ত্র ধারা বলা যায় না—অনেক সময়ই উভয় স্তরের একত্র অবস্থান দেখা যায়।

হরিদাস ঠাকুর ॥ "ভক্ত গুণ কহিতে প্রভুর বাঢ়য়ে উল্লাস। / ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস ॥ / হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার। / কেহো কোন অংশে বর্ণে নাহি পায় পার ॥"[১২৬] বৈষ্ণব সাহিত্যে ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। রাজকৃষ্ণ ভক্তিমূলক নাটক রচনাকালে তাই হরিদাস ঠাকুরের কাহিনী গ্রহণ করেছেন। তবে হরিদাসের জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাই নাটক রচনারও বিশেষ উপযোগী। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলিতে হরিদাস ঠাকুরের 'অনন্ত চরিত্র' মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। রাজকৃষ্ণের নাটকে হরিদাসের হরিভক্তি তাঁর জীবনের নানা অত্যাশ্চর্য ঘটনা সম্পাদনে কিভাবে সাহায্য করেছে এবং তাঁর অলৌকিক মহিমা প্রচারে সহায় হয়েছে, তা দেখানো হয়েছে। নাট্যারম্ভের পূর্বে 'অবতারণা' অংশ থেকে জানা যায় নারায়ণ লক্ষ্মীকে বলছেন,—"প্রেমভক্তি-ঋণ তব কতক শুধিতে / একাধারে রাধাকৃষ্ণ হইব কলিতে।" এবং কলিতে ভূলোকে তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হবেন ব্রহ্মা, হরিদাস ঠাকুর রূপে। নারায়ণের মতে হরিদাস, "যবন কুলে জন্মগ্রহণ ক'রে আমার স্বতঃসিদ্ধ ভক্ত হয়ে পাপিত্রাণমূল হরিনাম প্রচার করবেন।" (অবতারণা)। সঙ্গে থাকবেন আচার্য অদ্বৈত রূপে মহাদেব, অবধূত নিত্যানন্দ রূপে বলরাম, এবং শ্রীবাসরূপী দেবর্ষি নারদ। হরিনাম শিক্ষা দিয়ে পাপীজীবগণকে নরক থেকে ত্রাণ করবেন তাঁরা সকলে।

তিন অঙ্ক বিশিষ্ট নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখা যায় বুড়ন গ্রামে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশে মুসলমানরা বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন যবন হরিদাসের গৃহ অগ্নিদগ্ধ করে। হিন্দু ধর্মবিশ্বাস গ্রহণের কারণ হিসেবে তিনি জানান, "যিনি আল্লা, তিনিই হরি, তবে যার মনে যে নামে জাগেন, সে, সে নামে তাঁকে ডাকে।" (১/৩) তাঁর মতে, "ঈশ্বরের নাম নাই—রূপ নাই—তিনি নিরাকার ব্রহ্ম" (১/৩)। চৈতন্যভাগবতে হরিদাসের মুখে এরই প্রতিধ্বনি শুনেছি—"শুন বাপ সবারেই একই ঈশ্বর ॥ / নাম মাত্র ভেদ কহে হিন্দুয়ে যবনে। / পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥"[১২৭]

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে গৌড়নগরে নবাবের দরবারের চিত্র পাই। সেখানে নবাব হরিদাসকে হরিনাম ত্যাগ করতে বললে তিনি জানান, "শরীর যদ্যপি মোর খণ্ড খণ্ড হয়ে / প্রাণ-বায়ু বহির্গত হয়, / তথাপি জানিও সুনিশ্চয়- / প্রাণারাম হরিনাম কভু না ছাড়িব।" একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে 'চৈতন্যভাগবতে' হরিদাসের উক্তিতে—"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ। / তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥"[১২৮] নবাব মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখালে হরিদাস জানান, "জন্মিলেই অবশ্য মরণ। / কায়ার যেমতি ছায়া সাথী, / দিবসের সঙ্গী যথা রাত্তি, / তেমতি

জন্মের সাথী মৃত্যু সুনিশ্চয়। / কি হেতু করিব ভয় ?" (২/১) সেই সঙ্গে একথাও জানায়, "এ তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে / হরিনাম কভু না ছাড়িব।" (২/১) এ-মনোভাব প্রকাশের শাস্তি স্বরূপ হরিদাসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হয়। পাইঁকদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়—"বাইশবাজারে নিয়ে গিয়ে /প্রহার করিয়া এর বধহ জীবন। / তাহে যদি নাহি মরে, / তা'হলে জানিবে সবে—/ এ যা বলে, সত্য সে সকল।" (২/১) 'চৈতন্যভাগবতে'ও এই নির্দেশের সমর্থন মেলে,—"কাজী বলে বাইশ বাজারে বেড়ি মারি। / প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি।। / বাইশ বাজারে মারিলেই যদি জীয়ে। / তবে জানি জ্ঞানী সব সাঁচা কথা কহে।।"[১২৮] বাইশ বাজারে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। হরিদাসকে প্রহার করতে গেলে প্রহারোদ্যত পাইকদের হাত নিশ্চল হয়ে পড়ে। অবশেষে ধ্যানযোগে হরিদাস স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন—তাঁর মৃতদেহের সদ্গতি না করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সকলকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে দিয়ে হরিদাস গঙ্গাবক্ষ থেকে উত্থিত হন। নবাব সেই সঙ্গে কাজী, হরিদাসের চরণে ক্ষমাপ্রার্থনা তথা আত্মসমর্পণ করেন। নবাব অনুরোধ করেন,—"এবে, যথা ইচ্ছা তব, / সেইখানে কর অবস্থান। / এই গঙ্গাতীরে, সাধু ! / গোফামাঝে কর অবস্থিতি।" (২/৪) এই মিনতি 'চৈতন্যভাগবতে'ও আছে,-"গঙ্গা তীরে থাক গিয়া নির্জন গোফায় ॥ / আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা। / যে তোমার ইচ্ছা তুমি করহ সর্বথা ॥"[১২৯]

দ্বিতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য ও তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের কাহিনী 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে নেওয়া হয়েছে। বৈষ্ণবদ্বেষী রামচন্দ্র খান হরিদাসকে অপদস্থ ও অপমানিত করার জন্য বেশ্যাদের সাহায্য গ্রহণ করেছে। কৃষ্ণদাসের বিবরণে আমরা পাই, "হরিদাস কহে তোমা করিব অঙ্গীকার/সংখ্যা নাম সমাপ্ত যাবত না হয় আমার ॥ / তাবত তুমি বসি শুন নাম সংকীর্তন / নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন ॥"[১৩০] লক্ষণীয় যে বেশ্যার চিত্তপরিবর্তনে কৃষ্ণদাস কোনো অলৌকিক ঘটনার আশ্রয় নেননি। রাজকৃষ্ণ নাটকের প্রয়োজনে মোহিনী-মায়ারণ্যে ইহলৌকিক মানসিক বৃত্তি দ্বারা পাপপথে পরিচালিত হওয়া এবং জ্ঞানারণ্যে পারলৌকিক মানসিক বৃত্তিদের তার প্রতি সাবধানবানী উচ্চারণ করার কথা বলেন। নরক-যন্ত্রণা অনুভবের পর হরিদাসের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করে প্রাণের জ্বালা দূরীভূত করে মুক্ত হয় মোহিনী। তবে রামচন্দ্রের পরিণাম নাটকে দেখানো হয়নি, যদিও 'চৈতন্যচরিতামৃতে' রামচন্দ্র-কাহিনী অনেক বিস্তারিত।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে অদ্বৈতের সঙ্গে হরিদাসের সাক্ষাৎ হয়। অদ্বৈত বলেন, "চল এবে দুই জনে শ্রীচৈতন্য দরশনে, / পুণ্যধাম নবদ্বীপে যাই।" (৩/২)। হরিদাস-অদ্বৈত নবদ্বীপে শ্রীবাস গৃহে চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। চৈতন্যের মূর্চ্ছাদর্শনে হরিদাস

অদ্বৈতকে জানান—"সাক্ষাৎ শ্রীহরি এবে শ্রীচৈতন্য নামে / আসিলেন পাপিকুলে করিতে নিস্তার- / প্রেমভক্তিময় হরিনামে।" (৩/৩) প্রবুদ্ধচৈতন্যের কাছে অদ্বৈত হরিদাসের পরিচয় দিলে চৈতন্য সানন্দে বলেন—"ধন্য আমি, / ধন্য মোর হরির সাধনা, / তেঁই আজ পাইলাম সাধু হরিদাসে। / আইস দক্ষিণ বাহু মোর, / দেহ কোল চৈতন্য সুদীনে।" (৩/৩) যবনকুলেতে জন্ম বলে হরিদাস কোল দিতে অসম্মতি প্রকাশ করলে চৈতন্য প্রতিবাদ করেন, "তোমা হ'তে পাপ কলিকালে / কোটি কোটি পাপী—কোটি কোটি তাপী / পাপতাপমুক্ত হয়ে / যাবে চলি, বৈকুণ্ঠ -ভবনে।" (৩/৩) সমবেত হরিধ্বনির মধ্যে হরিদাস জানান—"ধন্য আমি আজ, / কলির জীবের মুক্তি দাতা / শ্রীগৌরাঙ্গ পতিত-পাবন-/ দিয়াছেন কোল এই দীনহীন জনে। /...পবিত্র হইনু আমি, / পাপরাশি ঘুচিল আমার।" (৩/৩) নগরকীর্তনকালে নবদ্বীপের রাজপথে নিত্যানন্দের চৈতন্যদর্শনলাভ। "অবধূত নিত্যানন্দ, / অর্দ্ধেক শকতি মোর তুমি" (৩/৪) বলে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। হরিদাস চৈতন্যের সঙ্গে 'দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ' বলে নিত্যানন্দের জয়ধ্বনি করেন। চৈতন্যদেব ভক্তদের প্রতি আদেশ দেন,—"অদ্য হতে নদীয়ার প্রতি ঘরে, / হরিনাম করহ ঘোষণা।" (৩/৪)

নাটকে তিনটি অংশ—যবন হরিদাসের হিন্দুধর্মে প্রীতির কারণে তাঁর গৃহ অগ্নিদগ্ধ করা, নবাব-কাজীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাঁকে হত্যা, হিন্দু জনগণের হরিদাসের প্রতি সহানুভূতি, রামচন্দ্র-মোহিনীর হরিদাসকে ধর্মভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা, চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের সঙ্গে নবদ্বীপে শ্রীবাসগৃহে হরিদাসের মিলন। জীবনী-নাটক রচনায় রাজকৃষ্ণের কৃতিত্বের পরিচয় মেলে 'হরিদাস ঠাকুর' নাটকে। বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্রীয় ভাববস্তুর অনুসরণে সাজানোর মধ্যে নাট্যলক্ষণের প্রকাশ আছে। তবে ভক্তিমূলক নাটকে নাট্যদ্বন্দ্ব খুব তীব্র নয়, ফলে বৈষ্ণব ভক্তের কাছে 'হরিদাস ঠাকুর' যতটা সমাদর লাভ করেছিল, নাট্যসমালোচকের কাছে ততটা স্বীকৃতি লাভ করেনি।

'হরিদাস ঠাকুর' নাটকটি রাজকৃষ্ণ ঢাকায় লেখেন এবং সেখানেই এ-নাটকের প্রথম মঞ্চাভিনয় হয় বলে প্রচারিত। নাটকের প্রকাশকাল ২৫ জুলাই ১৮৮৮। তবে ১৮৮৮ সালের ১৭ জুন আর্য-নাট্য-সমাজ যে 'বীণা' রঙ্গমঞ্চে এ-নাটকের অভিনয় করে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৪ জুলাই ১৮৮৮ সালের 'অনুসন্ধান' পত্রিকায়।

মীরাবাই ॥ আধুনিক কালে দিলীপকুমার রায় যখন মীরাবাইকে নিয়ে 'ভিখারিণী রাজকন্যা' (১৯৫২) নাটক লেখেন, তখন তাঁর মনে হয় "মীরা আমাদের কাছে খানিকটা পৌরাণিকী কথিকার মতোই প্রেরণা দিয়ে এসেছেন।

অর্থাৎ তাঁর কথা যখন আমরা ভাবি তখন হিসেবে ভুল হয়ে যায়—তাঁর জীবনের কতখানি ইতিহাস কতখানি কিংবদন্তী।"[১৩১] ভারতবাসীর কাছে মীরাবাই-কাহিনীর আকর্ষণ অপরিসীম,—রাজরাণীর প্রেমভিখারিণীতে রূপান্তর শুধু ঘটনার চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেনি, সেই সঙ্গে অহৈতুকী কৃষ্ণপ্রেমের এক বিরলদৃষ্ট নিদর্শন উপস্থিত করেছে। তা ছাড়া মীরার ভজন, যার আকর্ষণ কোনোদিন কমে না, বরং "অনেক বুদ্ধিবাদী অবিশ্বাসীরও যে তাঁর গান শুনে চোখে জল আসে এ অবিসংবাদিত। সময়ে সময়ে এমনো মনে হয় যে মীরার জীবন আমাদের আবিষ্ট করে খানিকটা সেইভাবে যেমন করে পুরাণ...।"[১৩১] রাজকৃষ্ণ রায় সম্ভবত বাংলায় প্রথম মীরার কাহিনী অবলম্বনে নাটক লেখেন, তাঁর কাছে 'মীরাবাই' (১৮৮৯) ছিল 'ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক নাটক'।[১৩২] টডের রাজস্থান বইয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, সেখানেই বীজাকারে মীরাবাইয়ের কাহিনী পাওয়া যায়, যথা—"Koombho married a daughter of the Rahtore of Mairta, the first of the clans of Marwar. Meera Bae was the most celebrated princess of her time for beauty and romantic piety. Her compositions were numerous, though better known to the worshippers of the Hindu Apollo than to the ribald bards. Some of her odes and hymns to the diety are preserved and admired. Whether she imbibed her poetic piety from her husband, or whether from her he caught the sympathy which produced the 'sequel to the songs of Govinda', we cannot determine. Her history is a romance, and her excess of devotion at every shrine of the favourite deity with the fair of Hind, from the Yamuna to 'the world's end,' gave rise to many tales of scandal."[১৩৩] তবে সেইসঙ্গে মীরাবাইকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কল্পকাহিনী,—এর মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধানের চেষ্টা নিরর্থক। বিশেষ করে আমাদের মনে রাখতে হবে, রাজকৃষ্ণ যখন নাটক লেখেন তখন মীরাবাই সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণালব্ধ ঐতিহাসিক তথ্য তাঁর জানা ছিল না। ফলে মধ্যযুগীয় ভক্তিসাহিত্য ও প্রচলিত কথা-কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত হয়েছে রাজকৃষ্ণের নাটক। যার মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে নাট্যকারের ভক্তিরস পরিবেশনের আগ্রহ। সেখানে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকের সঙ্গে 'মীরাবাই'-এর কোনো পার্থক্য নেই—ভক্তবৎসল ভগবানের মহিমা প্রদর্শনের জন্য অলৌকিক প্রসঙ্গ তাই খুব সহজে নাটকে স্থান পায়।

রানকুম্ভের দুর্বৃত্তসুলভ আচরণ এবং পরিণামে তার কারাবাস এবং মীরার দয়ায়

কারামুক্তি—নাট্যকাহিনীকে সংঘাত ও গতি দান করেছে। তবে ভক্তিমূলক নাটকে নাট্যদ্বন্দ্বের তীব্রতা যেমন প্রত্যাশিত নয়, তেমনি বিপর্যয়কর পরিণামও পরিহার্য। আকবর ও তানসেনের উপকাহিনী নাটকে বৈচিত্র্য সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে, অবশ্য দিলীপকুমার রায় তানসেনকে যে গুরুত্ব দিয়েছেন, রাজকৃষ্ণ তা দেননি। রাজকৃষ্ণের নাটকের ঘটনাধারা একমুখী, কাহিনীবৃত্তও সরল। রূপ গোস্বামীর সঙ্গে মীরার সাক্ষাৎ ও তাঁকে গুরুরূপে বরণের কথা বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়। আসলে বৈষ্ণব ভক্তিসাধনাকে নাট্যরূপ দেওয়া সহজ নয়—রাজকৃষ্ণ মীরার অলৌকিক কাহিনীকে লৌকিক পটভূমির সঙ্গে যুক্ত করে সাধ্যমতো মানব রসপুষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক দর্শকের কাছে 'মীরাবাই' নাটকের আবেদন সীমাবদ্ধ, কিন্তু উনিশ শতকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাটকটি দর্শকদের প্রশংসাধন্য হয়েছিল।

বীণা রঙ্গমঞ্চ যখন দর্শকাভাবে বিপন্ন এবং রাজকৃষ্ণ অভিনেত্রী-বর্জিত রঙ্গমঞ্চ চালনায় ব্যর্থ, তখন 'মীরাবাই'-এর অভিনয় দিয়ে বীণার এক নতুন পর্বের সূচনা হলো (প্রথম অভিনয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুলাই)। মীরাবাই-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন তরুণী তিনকড়ি,[১৩৪] সে কালের পত্রিকায় নাট্যসমালোচক লেখেন, "The character of the heroine, impersonated by a handsome working young artist of great promise was admirably sustained. The feeling which she brought to bear upon the interpretation of her role, and the ease, freedom and grace, which characterized all her gestures and action, rank her at once amongst the elite of her profession."[১৩৫] রাণা কুম্ভের ভূমিকায় অক্ষয়কুমার কোঁয়ারের অভিনয়ও খুব প্রশংসা লাভ করেছিল। শুধু অভিনয়নৈপুণ্য নয়, মঞ্চসজ্জা ও সংগীত ব্যবহারের অভিনবত্বও 'মীরাবাই' নাটকটিকে জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় 'মীরাবাই'য়ের অভিনয় সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়—"বীণা-রঙ্গভূমি। কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবুর নূতন নাটক 'মীরাবাই' উক্ত রঙ্গালয়ে আজকাল বড়ই দক্ষতার সহিত অভিনীত হইতেছে। নাটকের কতকগুলি গান—বিশেষত তানসেনের গীত—বড়ই মনোমুগ্ধকর; অথচ তাল-লয় সংযুক্ত। আজকালকার থিয়েটারের বাজারে এরূপ গান প্রায়ই হয় না। বস্তুত, ইহা বড় অল্প প্রশংসার কথা নহে। অধিকন্তু এবারের দৃশ্য-সৌন্দর্য্য আরও মনোহর। কোথায় গান হইতেছে, অথচ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া-যোগে সেই গান দর্শকের কাছে কে যেন আসিয়া গাহিয়া যাইতেছে,—এই যে সুন্দর কৌশলটি, এটি বাঙ্গলার থিয়েটারে সম্পূর্ণ নূতন। এ-দৃশ্যে সকল দর্শককেই মোহিত হইতে হয়। তদ্ভিন্ন, জ্যোতির্ম্ময় বালকের আবির্ভাব ও শেষদৃশ্যের পট-পরিবর্ত্তন

প্রণালীটিও উল্লেখযোগ্য। ফলত মীরাবাই দেখিবার জিনিষ বটে।"[১৩৬]

সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা ।। ব্যক্তিগত অনুরোধে রাজকৃষ্ণ রায় নানা নাটক রচনা করেছেন। 'সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা' তার ব্যতিক্রম নয়। সত্যভক্ত 'শ্রীযুক্ত রায় ক্ষেত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের' অনুরোধে নাটকটি লিখিত। নাটকটির 'বিশেষ বিজ্ঞাপন'-এ রাজকৃষ্ণ জানান, ক্ষেত্রচন্দ্র "আমাকে ভগবান সত্যনারায়ণের মহিমা, ব্রত ও পূজাসম্বন্ধীয় এই নাটকখানি রচনা করিতে বলেন এবং যথোপযুক্ত পারিশ্রমিকও দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু আমি তাঁহার হিন্দুগৌরবস্বরূপ পরম পবিত্র সনাতন সত্যধর্ম্ম প্রচারের সদুদ্দেশ্য, সদুদ্যম ও সদুৎসুকতা দর্শনে, নিতান্ত আনন্দিত হইয়া, পারিশ্রমিক লই নাই।"[১৩৭] নাট্যকারের মতে, "সত্যভক্তগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক 'সত্যমঙ্গল' পাঠ করিয়া, কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দলাভ করিলেই আমার আশাতীত পারিশ্রমিক লাভ হইবে।" পরিশেষে রাজকৃষ্ণ মন্তব্য করেছেন, "উক্ত ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মার ন্যায় কি ধনী, কি মধ্যবিৎ এবং কি দরিদ্র, সমস্ত হিন্দুরই লুপ্তপ্রায় সত্যধর্ম্মের আলোচনা, প্রবর্ত্তনা, সম্মাননা ও ব্রতার্চ্চনা করা সম্পূর্ণরূপে উচিত।"[১৩৭] নাটকটির সূচনায় 'অনুক্রমণিকা' অংশে বলা হয়েছে,—ভগবান কলিতে অন্যতম মূর্তিধারণ করেন—'সত্যনারায়ণ'; "স্কন্দ পুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডে এবং ভবিষ্যপুরাণাদিতে ভগবানের সত্যনারায়ণ অবতার ও সত্যব্রতের বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত আছে।"[১৩৮] রাজকৃষ্ণ এই জন্য সত্যমঙ্গলকে 'পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আশুতোষ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, সত্যনারায়ণের কাহিনীর সঙ্গে পুরাণের যোগ আরোপিত— "মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ইহাদের মৌলিক সম্পর্ক রহিয়াছে।...স্কন্দপুরাণের এক স্থলে সত্যনারায়ণের উল্লেখ আছে সত্য, তবে তাহা যে পরবর্তী যোজনা তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব মনে হয়, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী কিংবা তাহার সামান্য পূর্ববর্তীকালের কোনও অলৌকিকতা-সিদ্ধ মুসলমান ফকির বা পীরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সমসাময়িক কাল কিংবা তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরবর্তীকাল হইতেই সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালীগুলি রচিত হইতে আরম্ভ করে।"[১৩৯] আমরা তাই সত্যনারায়ণ লীলাপ্রকাশক নাটকগুলিকে পৌরাণিক বলে মেনে নিতে পারি না। সত্যনারায়ণ ঠাকুর কোনো পৌরাণিক দেবতা নন, লৌকিক দেবতা। রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্যের মতো সত্যপীরের কথাকে 'গ্রাম্য-সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১৪০] মধ্যযুগীয় মঙ্গলসাহিত্যে যেমন দেবতার মাহাত্ম্যপ্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, প্রসন্ন হলে তাঁরা যেমন মঙ্গল সাধন এবং রুষ্ট হলে অনিষ্ট সাধন করতেন,—সত্যনারায়ণ-পাঁচালীতে তেমনি সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য এবং তাঁর দাক্ষিণ্য ও রোষ বর্ণিত হয়েছে। মানুষ অধর্মাচরণ করলে,

অন্যায় করলে, সত্যব্রতপালনে অবহেলা করলে সত্যনারায়ণ ঠাকুরের প্রতি অবিশ্বাসী হলে বা তাঁর প্রসাদ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করলে সত্যদেবের রোষে পড়ে। সত্যঠাকুর তার জীবনকে যে কোনো ভাবে বিপন্ন করে তোলেন—পাপের প্রতিফল পায় সে। প্রচলিত সত্যনারায়ণের পাঁচালীর কাহিনী অনুসরণ করে রাজকৃষ্ণ তাঁর সত্যনারায়ণ মাহাত্ম্য প্রচারক নাটকগুলি লিখেছেন। সেখানে কাহিনীর মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথাও পরিস্ফুট করেছেন। সত্য-নারায়ণের নৈবেদ্য, বেদী, প্রণাম, সত্যপীরের সিনী, মোকাম, সেলাম-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

১২৯৭ সালের ২০শে জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত 'সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ লীলা' নাটকের শুরুতে আছে প্রস্তাবনা—প্রথম শাখা, দ্বিতীয় শাখা ও তৃতীয় শাখা।

প্রথম শাখাতে গোলোকপুরীর বিশ্রাম উপবনে লক্ষ্মী-নারায়ণের অবস্থান ও কথোপকথন বর্ণিত। "কলিযুগে কোন্ অবতারে / তারিবে হে তব জীবগণে?" লক্ষ্মীর এ-জিজ্ঞাসার উত্তরে নারায়ণ জানান, "অভিনব অবতার সত্যনারায়ণ / হব আমি কলিযুগে।"[১৪১] এবং তার কারণ, "কলিগর্ব্ব খর্ব্ব করি / সর্ব্বজীবে জীয়াইব সত্যের আলোকে।"[১৪১] সত্যনারায়ণ রূপে মর্ত্যে আবির্ভাবের পিছনে তাঁর নানা উদ্দেশ্য আছে। তিনি লক্ষ্মীকে আরও বলেন, "যারা কাঁদে কলির পীড়নে, / মুছাব তাদের অশ্রু বারি; / যারা মজি কলির কুহকে / পূজিছে তাহাকে, / তা সবে শাসিব কলি সনে; / ঘুচাইব মিথ্যাভ্রম, / দেখাইব সত্যলোক, / সত্যধর্ম্মে স্থাপিব সকলে / অভিনব রূপে এবে মর্ত্যে অবতরি। / কলিজীব পাবে পরিত্রাণ, / পাইবে নির্ব্বাণ মোর পদে।"[১৪২]

প্রস্তাবনা—দ্বিতীয় শাখাতে পাওয়া যায় রাজা পরীক্ষিতের কাহিনী। কলিকে নিধন-বাসনায় বীরবেশে রাজা পরীক্ষিৎ পথ-পরিক্রমণ কালে বৃষরূপী ধর্ম ও গাভীরূপা পৃথিবীর সাক্ষাৎ পান। তাঁদের বক্তব্য—কলি "এখনি আসিয়া / ফেলিবে নাশিয়া মোরে তীক্ষ্ণ অসি ঘায়।"[১৪৩] পরীক্ষিৎ তাঁদের রক্ষার আশ্বাস দেন। এরপর ষড়রিপুর, তারপর কলির আগমন ঘটে, ভয়ঙ্কর শরযুদ্ধ হওয়ার পরিণামে কলি আহত হয়। তখন রাজা আকাশবাণী শুনতে পান—"কলিরে করহ পরিহার..." "...তব বধ্য নহে পাপ কলি।"[১৪৪] এই ঘটনার সন্ধান মেলে রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ কথায়। সেখানে ধর্মকে গোরূপ ধারণ করে কলির সামনে উপস্থিত দেখা যায়—"এক কালে তবে পরীক্ষিৎ নরনাথ। / মৃগয়াতে কলিক্রীড়া দেখিল সাক্ষাৎ॥ / সেক্ষণে গোরূপ ধর্ম্ম কলি হৈল নর। নির্ঘাত প্রহার করে গরুর উপর॥"[১৪৫] পরাজিত কলি যখন তার অবস্থানের সম্পর্কে জানতে চান, তখন শোনা যায়—"মদ্যপান, নারীহত্যা, জীবহত্যা যেথা / বসিবি সেখানে তুই; / স্বর্ণ, মিথ্যা, গর্ব্ব, কাম, হিংসা, বৈর আদি / তোর বাসস্থান চিরদিন।"[১৪৬]

পাঁচালীতে পাই, "এত শুনি কহে কলি হেঁট করি মাথা। / কহ নৃপ আমার ভাগ্যের স্থান কোথা॥ / বুঝিয়া ভূপতি দিল চারিস্থান তারে। / বেশ্যা সুরা অর্থ আর পাপকারী নরে॥"[১৪৭] কাহিনীশেষে দেখা যায় ধর্ম কৃতজ্ঞচিত্তে পরীক্ষিৎকে জানাচ্ছেন—"অন্তে তুমি বৈকুণ্ঠে যাইবে, / মিশাইবে সত্যরূপ হরির চরণে।"[১৪৬] পৃথিবীও শুভকামনা করেন—"অনন্ত শরীর জুড়ি মোর, / সুখ্যাতি ঘুষিবে তব সর্ব্বজীবগণ।"[১৪৬] অর্থাৎ পৃথিবীতে ধর্মস্থাপনে সহায়তার জন্য পরীক্ষিতের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা।

প্রস্তাবনা—তৃতীয় শাখা বা শেষ শাখাতে পটভূমি নৈমিষারণ্য। শৌণকাদি ঋষিদের শ্রোতারূপে পেয়ে সূত পুরাণপাঠ করছেন। তখন শৌণকের মনে প্রশ্ন জাগে—"কলিকালে অল্পায়ু মানব / কিরূপে কঠিন ধর্মব্রত আচরিবে?"[১৪৮] নারদ আবির্ভূত হয়ে সে জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন—সত্যনারায়ণের নাম শোনালেন। সূতকে নির্দেশ দিলেন মুনিদের সত্য কথা শোনানোর। তিনি আরও জানালেন, —"স্কান্দরেবাখণ্ডে আর ভবিষ্যপুরাণে / সত্যনারায়ণ কথা হইবে বর্ণিত।"[১৪৯] এরপর স্তবগানের মধ্য দিয়ে প্রস্তাবনার পরিসমাপ্তি—নাটকের সূচনা।

নাটকের প্রথম অঙ্কে জানা যায়, "সত্যনারায়ণ স্বয়ং জগদীশ্বর ভগবান হরি।"[১৫০] তিনি বলেন, "...আমার এই ব্রহ্মচারিবেশই সত্যধর্ম্ম ও সত্যব্রত প্রচারের প্রথম সোপান।"[১৫১] তাই এ-অঙ্কের কাহিনীতে তাঁকে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশেই মানবকল্যাণসাধনে ব্রতী হতে দেখা যায়। ভিক্ষুক সদানন্দ-ব্রাহ্মণের দয়ার্দ্র চিত্তের পরিচয় পেয়ে ব্রহ্মচারীরূপী সত্যনারায়ণ তাঁকে কৃপা করেন এবং সত্যনারায়ণ-পূজার উপদেশ দেন। কারণ তাঁর মতে, "সত্যধর্ম্ম বই, সত্যলোক বই এবং সত্যনারায়ণের পূজা বই, কলিযুগে জীবগণের মুক্তির অন্য উপায় নাই।"[১৫২] পাঁচালীতে দেখি সদানন্দ পূজায় অসম্মতি প্রকাশ করলে ব্রহ্মচারী জানিয়েছেন, "রাম ও রহিমে কভু নাহি ভেদাভেদ। / ত্রিভুবনে এই দুই জানিবে অভেদ।"[১৫৩] সত্যনারায়ণ, সদানন্দ-পত্নীকে বস্ত্রালংকার-শাকান্ন দিয়ে কৃপা করেন।—"অদ্য লক্ষেশ্বরী হয়ে সুখে কর ঘর।"[১৫৪]

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বর্ণিত হয়েছে লক্ষপতি সদাগরের কাহিনী। প্রথম অঙ্কে উল্লিখিত সদানন্দ শর্মাই সত্যধর্ম প্রচারের আদিগুরু। তাঁর সহায়তায় লক্ষপতি সপরিবারে কিভাবে সত্যনারায়ণের কৃপার্জন করলো—সে কাহিনী জানা যায় এ -নাট্যাংশে।

সত্যনারায়ণের কৃপায় লক্ষ্মীশ্রী কন্যা, উপযুক্ত জামাতা, এবং অতুল ঐশ্বর্য লাভ করেন লক্ষপতি—কিন্তু সত্যব্রতপালনের অবসর মেলে না। ভাবেন, "অগ্রে কোটি-পতি হই, তারপর সত্যনারায়ণের ব্রত করবো।" (১/১) সত্যনারায়ণ সমস্ত লক্ষ্য করে স্থির করেন, "ঘুচাইব ধনলোভ / জন্মাইব মনঃক্ষোভ / শিক্ষা দিব বিধিমতে

দোঁহে।" (১/২)। শাস্তিস্বরূপ বাণিজ্যকালে রত্নসারপুরের রাজা চন্দ্রকেতুর আশ্রিত লক্ষপতি কঙ্কণকে কৌশলে রাজ-আভরণ চুরির দায়ে দ্বাদশ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ করা হলো। কলির ছলনায় পত্নী লীলাবতী, কন্যা কলাবতী সত্যনারায়ণকে বিস্মৃত হলে ফল স্বরূপ তারা নিঃস্ব, গৃহহারা হয়ে অশেষ দুঃখভোগ করলো। শেষে সত্যনারায়ণের দয়ায় সকলে মুক্তি পেল। হরিদাস শর্মার গৃহে ঠাকুরের প্রসাদ খেয়ে কলাবতীর মোহভঙ্গ হলো। "আমি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা প্রভু সত্যনারায়ণকে ভুলেছিলেম। মা'ও আমার তাঁকে বিস্মৃত হয়ে আছেন! হায়, তাই আমাদের এত দুর্গতি!" (২/৪)।

লক্ষপতিও দৈবস্বপ্নদর্শনে জানতে পেরেছেন সত্যনারায়ণকে অবহেলা করাতেই তাদের 'দুঃসহ কারাবাস-যন্ত্রণা' ভোগ। তবুও মানুষ ভুল করে। লক্ষপতিও গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে অধর্মাচরণ করেছেন। নদীতীরে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণবেশী সত্যনারায়ণকে ধনরত্নপূর্ণ তরণী থেকে সামান্য ভিক্ষাও দেননি। বলেছেন, "লতা, পাতা, ঘাস, খড়" তরণীতে পূর্ণ। বাস্তবেও তাই হয়েছে। এই অলৌকিক ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে পাঁচালীর পাতায়—"কতদূরে গিয়া দেখে শ্বশুর জামাই। / তুষ ও অঙ্গার ভিন্ন আর কিছু নাই॥ / সাত নায় যত দ্রব্য সকলি অমনি। / কান্দে দুই সদাগর শিরে কর হানি।।"[১৫৫] মিথ্যাভাষণের ফল এভাবেই ফলেছে।

কাহিনীশেষে আরও একবার দেখানো হয়েছে সত্যনারায়ণ অবহেলার পরিণাম। কন্যা কলাবতী স্বামী-প্রত্যাবর্তনের আনন্দে প্রসাদ ফেলে নদীতীরে ছুটেছে— অবহেলার প্রতিফল স্বরূপ স্বামী কঙ্কণকুমার তরণীসহ নদীজলে নিমজ্জিত হয়েছে। সদানন্দের পরামর্শে সে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করে এবং সত্যনারায়ণের উদ্দেশে ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে জলমগ্ন পতির জীবন ফিরে পায়। সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে পাই সত্যদেবের রোষের কথা—"প্রসাদ লইয়া সবে যোড় করি পানি। / প্রসাদ ভূমেতে ফেলে সাধুর নন্দিনী॥ / তাহা দেখি সত্যদেব কুপিত হইল। / জামাতা সহিত তরী জলেতে ডুবিল॥"[১৫৬] এই প্রতিফলের কথা রামেশ্বরীকথাতেও আছে—"প্রসাদ ফেলেছে তাতে পীরের হৈল কোপ। / বাপ বন্ধু ঘাটে কান্দে ডুবে মরে পতি।"[১৫৭] অবশেষে সকলে সত্যনারায়ণ-ব্রতপালনে উদ্যোগী হয়।

সত্যনারায়ণ পাঁচালী অবলম্বনে নাটক রচনার পিছনে ভক্তদর্শকের মনোরঞ্জনের ইচ্ছা কাজ করেছে। কিন্তু 'মীরাবাই' বা 'হরিদাস ঠাকুরে'র মতো 'সত্যমঙ্গল' মঞ্চসাফল্য লাভ করেনি। তার কারণ প্রস্তাবনা-অংশটির মধ্যে আদৌ কোনো নাট্যলক্ষণ নেই, সদানন্দের কাহিনীও নাট্যদ্বন্দ্ব বর্জিত—বিবৃতিমূলক দেবমাহাত্ম্যের কাহিনী যতটা পাঠোপযোগী, ততটা অভিনয়োপযোগী নয়। একমাত্র লক্ষপতির কাহিনীর মধ্যে নাট্যসম্ভাবনা ছিল, তাই রাজকৃষ্ণ পরে 'লক্ষপতি' নামে এই অংশটি স্বতন্ত্র নাটকরূপে প্রচার করেন।

রাজা বংশধ্বজ ।। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি প্রকাশিত 'রাজা বংশধ্বজ' নাটকটিকে রাজকৃষ্ণের সত্যমঙ্গল কাহিনীর পরিশিষ্ট বলা যায়। তিনটি অঙ্কে সম্পূর্ণ এ নাটকে পূর্বোক্ত নাটকের মতোই সত্যনারায়ণের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। পুষ্পপুরের রাজা বংশধ্বজের মনে সত্যনারায়ণের প্রতি ভক্তিভাব জাগিয়ে তোলাই এ-নাট্যকাহিনীর মূল বিষয়। রাজার অবিশ্বাসী মনে বিশ্বাসের সঞ্চার হয়েছে কাশী-পুর গ্রামের সদানন্দ শর্মার সহায়তায়। সদানন্দ-শিষ্য ধুরন্ধরের ভাষায়, "তিনি হাজার নর-নারীকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত কোরে, সত্যভক্তির আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখালেন।" (১/১) দেবগ্রামে যাত্রাকালে অরণ্যমধ্যে মৃত পুত্র হংসধ্বজ-সহ রাজা বংশধ্বজ ও ক্রন্দনরতা রাণী মণিমালার সাক্ষাৎ পেলেন সদানন্দ। শোকাতুর রাজা তাঁকে জানালেন মৃগয়া করতে এসে বনে ভ্রমণকালে তিনি দেখেন কাঠুরিয়া এবং গোপগণ সত্যনারায়ণ পূজা করছে। তাদের অনুরোধে তিনি দেবতাকে প্রণাম করতে এবং প্রসাদ গ্রহণ করতে অসম্মত হন—পুত্রকেও নিষেধ করেন। কারণ তাঁর মতে, সত্যনারায়ণ 'দেবতা' নয়, 'উপদেবতা' বা 'ভূতযোনি'। শিবিরে প্রত্যাবর্তন কালে পথে কালসাপ অজগর পুত্রকে দংশন করতে এলে তিনি বিষবাণ নিক্ষেপ করে আসন্ন বিপদ থেকে পুত্রকে রক্ষা করতে চান। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট শর পুত্রের বক্ষবিদ্ধ করে। পুত্রহন্তা পিতাকে সদানন্দ জানান—"ভগবান সত্যনারায়ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করার—এই নিদারুণ প্রতিফল। আর নিন্দা কোরবেন না, কোল্লে আপনার রাজ্যধন প্রভৃতি সমস্ত উৎসন্ন হোয়ে যাবে।" (৩/১) আরও বলেন,—"তিনি রুষ্ট হোলে, পাপিষ্ঠ মানবকে একেবারে নষ্ট করেন ; আবার তুষ্ট হোলে, ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সাধন করেন।" (৩/১) শেষে তাঁরই নির্দেশানুসারে পুষ্পপুরাধিপতি বংশধ্বজ বটবৃক্ষতলে ভক্তিভরে সত্যনারায়ণকে প্রণাম জানিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং তাচ্ছিল্যভরে-পরিত্যক্ত সত্যপ্রসাদ গ্রহণ করেন। ফল-স্বরূপ মৃত পুত্রের প্রাণ ফিরে পান—সেই সঙ্গে ধর্মাচার্য রূপে সদানন্দকে।

সত্যনারায়ণের কৃপায় মৃত হংসধ্বজের পুনর্জীবন লাভ নিতান্তই অলৌকিক ঘটনা। দেবমাহাত্ম্য প্রচারের জন্য এ নাটকীয় ঘটনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন নাট্যকার। নাটকের সমাপ্তি—সমবেত সত্যনারায়ণের লীলাকীর্তনের মধ্য দিয়ে। সেখানে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সুর ধ্বনিত। সত্যপীর এবং সত্যনারায়ণ মূলে যে এক সে কথাই প্রতিপাদিত হয়েছে।

নাটকের অভিনয়ের কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না।

লক্ষপতি ।। রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলীতে 'লক্ষপতি' নামে যে-নাটকটি মুদ্রিত হয়েছে, সেটি 'সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা' নাটকের শেষাংশ। 'লক্ষপতি' স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছিল কি না জানা নেই, তবে বেঙ্গল মেডিকেল

লাইব্রেরি প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর পঞ্চম ভাগে ( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২ ) 'সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ পাঁচালী'র পরিশিষ্ট রূপে 'রাজা বংশধ্বজে'র সঙ্গে এটি স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত হয়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী'তে 'সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ লীলা' স্থান পায়নি—গ্রন্থাবলীর অষ্টম ভাগে স্বতন্ত্র 'পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক' হিসাবে 'লক্ষপতি'কে পাচ্ছি। ( আমরা 'লক্ষপতি' নাটকের আলোচনাকালে বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'গ্রন্থাবলী'র অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ নির্দেশ করেছি )। 'সত্যমঙ্গলে'র আলোচনাকালে 'লক্ষপতি'র বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং নাটকটির পুনরালোচনা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় পরিহার করা হলো।

## ।। ঐতিহাসিক নাটক ।।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'কে ( ১৮৬১ ) বাংলা ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রথম প্রয়াস বলতে পারি। ঐতিহাসিক নাটকের অবলম্বন বিশেষ দেশকালপাত্র, যার মধ্যে শুধু ঘটনার চমৎকারিত্ব থাকলেই চলবে না, মানবরসও থাকতে হবে। অতীত পুরাবৃত্ত উনিশ শতকে বাঙালি দর্শক ও পাঠককে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে, এবং ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক, কাব্য ও উপন্যাস জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-ইতিহাস-কথাটি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে তা হলো কর্ণেল জেম্‌স্ টডের লেখা 'অ্যানাল্‌স অ্যাণ্ড অ্যান্টিকুইটিজ অফ্ রাজস্থান'। টড্ সাহেব পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে অনেকদিন রাজস্থানে ছিলেন, এবং শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সঙ্গে তিনি রাজপুতদের জীবন বর্ণনা করেছেন। ১৮২৯ এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে দু'খণ্ডে বিলাত থেকে স্মিথ, এল্ডার কোম্পানি গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করেন। আধুনিক গবেষণায় টডের গ্রন্থে তথ্যগত অনেক ভুল বেরিয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে টড্ যে যুগে গ্রন্থ রচনা করেছেন, সে যুগে তাঁর পক্ষে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্যের মধ্যে সত্যাসত্য নির্ণয়ের সুযোগ ছিল না।[১৫৮] আসলে টডের গ্রন্থে ইতিহাসের কিছু উপাদান থাকলেও, মুখ্যত সেটি রাজপুত জাতির জনশ্রুতিমূলক কাহিনী সংকলন। টডের রাজস্থান বই থেকে কাহিনী নিয়ে যখন নাটক লেখা হয়েছে তখন টড্ রচিত কাহিনীর সঙ্গে মিলেছে নাট্যকারের স্বরচিত কাহিনী। ফলে এই সব নাটককে যথার্থ 'ঐতিহাসিক নাটক' না বলে জনশ্রুতিমূলক অতীতাশ্রয়ী নাটক বলাই সংগত। অন্যদিকে ইউরোপে ঐতিহাসিক নাটকে অতীত কাহিনীর ব্যবহারের ফলে যে-ভাবে উচ্চাঙ্গের ট্রাজিক-রস সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, উনিশ শতকে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে তা সম্ভব হয়নি। নিকল ঐতিহাসিক নাটকরচয়িতাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "One principal interest for these dramatists in theme taken from the past lies, of course, in the manner through which comment in the present day may be made through the choice of subject-matter from past ages, and for some there is the added incentive which comes from realization that only through the handling of a 'distanced' story can there be even a hope of approaching the quality of tragedy."[১৫৯] বলাবাহুল্য এই মন্তব্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে কিছু পরিমাণে প্রযোজ্য হলেও রাজকৃষ্ণ রায়ের তথাকথিত জনশ্রুতিমূলক অতীতাশ্রয়ী নাটক সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না।

রাজকৃষ্ণ যে-সময়ে পুরাকাহিনী অবলম্বনে নাটক লিখছেন, সেই সময়ে পৌরাণিক নাট্যধারাটি সর্বাধিক প্রসার লাভ করলেও, ঐতিহাসিক নাটকও ( ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো না হলেও ) যথেষ্ট জনসমাদর লাভ করে। নাট্যকার মনোমোহন বসু ঐতিহাসিক নাটকের উপযোগিতা নিয়ে 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেন—" ঐতিহাসিক কার্য্য লইয়া নাটক করিলে নাটকের নাটকত্বের বিশেষ সৌন্দর্য্য ও সাহস এবং সন্নীতির বৃদ্ধি হইবে, জাতীয় সাধারণ উন্নতি সাধন করা ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়।"[১৬০] অবশ্য মনোমোহন নিজে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেননি। অনুরূপভাবে রাজকৃষ্ণ রায় যদিও 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন [ 'অমর সিংহ' মাঘ ১২৮১, 'মোগল সম্রাটগণের তালিকা', পৌষ ও মাঘ ১২৮১ ] কিন্তু যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক রচনায় সাফল্য লাভ করেননি। টডের রাজস্থান গ্রন্থটি তিনি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু রাজপুত ইতিবৃত্ত তাঁর কবি-কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছিল বলে মনে হয় না। জনশ্রুতি অবলম্বনে নাটক রচনাকালে নাট্যকারের স্বাধীনতা অনেক বেশি—রাজকৃষ্ণ পৌরাণিক নাটক রচনাকালে যে স্বাধীনতা পাননি, এই ধরনের ইতিবৃত্তাশ্রয়ী নাটকের ক্ষেত্রে তা পেয়েছেন। রাজকৃষ্ণের ভক্তিমূলক দু'টি নাটক—'মীরাবাই' এবং 'হরিদাস'কেও খুব ব্যাপক অর্থে ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়, কারণ প্রধান চরিত্র দুটি ঐতিহাসিক। কিন্তু ভক্তিমূলক নাটকে অলৌকিক প্রসঙ্গের অবতারণা সহজ ও স্বাভাবিক। সেখানে ঐতিহাসিক তথ্যানুগত্যের অনিবার্যতা নেই। কিন্তু 'ঐতিহাসিক' নামাঙ্কিত রাজকৃষ্ণের তিনটি নাটকের আলোচনায় ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যবহার ও নাট্যনীতির অনুসরণে তাঁর সাফল্য সতর্কভাবে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। সেখানে রাজকৃষ্ণের স্বাভাবিক নাট্যপ্রবণতা তাঁকে সাহায্য করেছে এমন মনে হয় না, অর্থাৎ 'ঐতিহাসিক রস' সৃষ্টিতে তাঁর সামর্থ্য প্রশ্নাতীত নয়।

লৌহ-কারাগার ॥ বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য লিখিত এবং ১৮৮০ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ রায়ের 'লৌহ-কারাগার'কে তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক বলা হয়। রাজপুতানার পুরাকাহিনী সে-কালে অনেকেরই রচনার প্রধান অবলম্বন ছিল। টডের রাজস্থান এবং কনটারের 'রোমান্স অফ্ হিষ্ট্রি' থেকে আখ্যান নিয়ে অসংখ্য নাটক, উপন্যাস, কাব্য লেখা হয়েছে। রাজপুত-ললনা জয়াবতীকে নিয়ে রাজকৃষ্ণের আগে বনোয়ারীলাল রায় লেখেন 'জয়াবতী কাব্য' ( ১৮৬৪ ), মনোমোহন বসু লেখেন 'জয়াবতী' উপন্যাস ( মধ্যস্থ ১২৭৯-৮০ ) এবং পরবর্তীকালে যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১২৯১ ), শশীভূষণ দত্ত ( ১৩৩৮ ) প্রভৃতি অনেকে লেখেন 'জয়াবতী' নাটক। রাজকৃষ্ণের নাটকে জয়াবতী চরিত্র

স্থান পেলেও তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভূমিকা দেওয়া হয়নি। জয়াবতীর সঙ্গে সঙ্গসিংহ, সূর্যসিংহ, বলসিংহ, ভুজসিংহ, সুবুদ্ধি, মহালক্ষ্মী, বনলতা চরিত্রগুলিও নাটকে সমান গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, "বনোয়ারীলাল রায়ের 'জয়াবতী' কাব্য হইতে নাটকটির উপাদান গৃহীত।"[১৬১] বনোয়ারীলাল তাঁর নাটকের ভূমিকায় জানিয়েছেন, "এই গ্রন্থ রোম্যান্স অফ্ হিষ্টরি' ও চিরাগত জনশ্রুতি অবলম্বনে লিখিত হইল।"[১৬২] রাজকৃষ্ণও নাটক রচনাকালে কর্নটারের কাহিনী দেখে থাকবেন, কিন্তু তাঁর নাটকে জয়াবতীর উল্লেখ থাকলেও অন্যান্য চরিত্রগুলি কাল্পনিক। কাজেই বনোয়ারীলালের কাব্য থেকে রাজকৃষ্ণ উপাদান সংগ্রহ করেছেন একথা বলা কঠিন। বিশেষত যেখানে নাটকের কাহিনীর সঙ্গে কাব্যের কাহিনী কিছুই মিলছে না। বনোয়ারীলাল তাঁর 'জয়াবতী'কে 'চিতোরের ইতিবৃত্তবিশেষ' বলেছেন। কিন্তু রাজকৃষ্ণের নাটকের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক যৎসামান্য—'লৌহ-কারাগার'কে নাট্যকার নিজে যে জন্য ঐতিহাসিক বা ইতিবৃত্তাশ্রয়ী নাটক বলেননি।

চিতোরাধিপতি সঙ্গসিংহের সঙ্গে অম্বররাজ সূর্যসিংহের বিরোধ নাটকের মূল বিষয়। বিরোধের সূত্রপাত সঙ্গ-কন্যা বনলতাকে ঘিরে। সূর্যসিংহের পাণিপ্রার্থনায়, অসম্মত চিতোররাজ সেনাপতি বলসিংহের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন। ফলে সূর্যসিংহের বিদ্রোহ ঘোষণা—"অম্বর অধীন ছিল চিতোরনাথের / চিতোর অধীন হবে অম্বরপতির।" (১/৪)। বলসিংহের অম্বর-আগমনে তাঁর মনে হয়—"পতঙ্গ আপনি প্রজ্বলিত অগ্নিমুখে উড়ি পড়ে আসি।" (১/৫)। কিন্তু পরিণামে "জয়শ্রী লভিয়া সুখে ধ্যানসিংহ সনে" (২/১) বলসিংহ চিতোরে ফিরে যান। পরাজিত সূর্যসিংহ মন্ত্রী ভুজসিংহের সঙ্গে কুপরামর্শ করতে থাকেন। ঘাতকের সাহায্যে সঙ্গসিংহকে হত্যারও চেষ্টা চালান—অবশেষে নিজেই সেই ঘৃণ্য কাজটি সম্পাদন করেন। সূর্যসিংহ চরিত্রের মধ্যে রাজপুত বীরোচিত দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায় না—প্রতি পদক্ষেপেই তিনি বন্ধু তথা মন্ত্রী ভুজসিংহের কূটবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল—স্বকীয় চিন্তা-ভাবনার সন্ধান মেলে না। তাঁর সাধ আছে, সাধ্য নেই। মন্ত্রী ভুজসিংহ নিজের বুদ্ধিকে আশ্রয় করে স্বপ্ন দেখে রাজ্যলাভের। অম্বর-রাজ সূর্যসিংহ তাকে বন্ধু ভেবে তার পরামর্শ অনুযায়ী চললেও ভুজসিংহ তাকে ছলনা করে। মনে মনে বলে,—"মহামূর্খ সূর্যসিংহ প্রকৃত বিশ্বাসে / হৃদয়ের সখা বলি ভাবে সদা মোরে, / কিন্তু আমি স্বার্থ-সখা, সত্য-সখা নহি। / নিজ কার্য্য-সিদ্ধি তরে উৎপত্তি আমার।" (৫/১) তারই কুমন্ত্রণায় যেন সকলের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে। নাটকে সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছে চিতোররাজের সেনাপতি তথা জামাতা বলসিংহ চরিত্রটি। রঘুবরসিংহ সিন্ধুরাজ্যের প্রতাপগড় স্বাধিকারে পেতে চান। অম্বরবিজয়ী বলসিংহ প্রতাপগড়ে রঘুবরের সমরাহ্বানের মোকাবিলা

করতে যান। সিন্ধুজয় করে চিতোর প্রত্যাবর্তনকালে বলসিংহ অরণ্যপথে দলচ্যুত হন। সন্ন্যাসিনীর সহায়তায় চিতোরে ফেরেন এবং সমস্ত দুঃসংবাদ অবগত হন। সূর্যসিংহের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহা তীব্রতর হয়। 'লৌহ-কারাগারে' সে-তীব্রতার অবসান ঘটে। বনলতার কারাবাসের সংবাদে বিচলিত বলসিংহ পত্নীকে উদ্ধার করতে গিয়ে দেখেন, বনলতাই সূর্যসিংহকে হত্যা করেছে। সমস্ত কাহিনী জুড়ে তাঁর উজ্জ্বল-উপস্থিতি এবং চারিত্রিক বীর্যবত্তা, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে। চিতোরাধিপতি সঙ্গসিংহকে সেনাপতি বলসিংহের বীরত্বের পাশে নিতান্ত নিষ্প্রভ মনে হয়। কাহিনীব্যাপী তাঁর নিষ্ক্রিয়তা নাট্যরচনার দুর্বলতাকেই মনে করায়। নাটকে বলসিংহের মিত্র রত্নসিংহের ভূমিকা সামান্য—কিন্তু পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে স্বার্থান্ধ ভুজসিংহকে কালিমন্দিরে খড়্গাঘাতে তাঁর হত্যা—দর্শক-পাঠককে চমকিত করে। সঙ্গসিংহের মন্ত্রী সুবুদ্ধিভট্ট, চিতোরের সহকারী সেনাপতি ধ্যানসিংহ যথাযথ চিত্রিত হয়েছে।

'লৌহ-কারাগার' নাটকে নারী চরিত্রগুলির মধ্যে সঙ্গ-মহিষী মহালক্ষ্মী রাজপুত রমণীর বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বলসিংহের অনুপস্থিতিতে সঙ্গসিংহের মৃত্যুর অনতিপরেই শত্রুর হাতে ধরা না দিয়ে তিনি কূপে আত্মবিসর্জন দেন। তাঁরই কন্যা চিতোরের রাজকুমারী ও বলসিংহের পত্নী বনলতা বরং কিছুটা দুর্বল চরিত্র। বীরের পত্নী হয়েও সে বলসিংহের সমরযাত্রাকালে তাকে বাধা দেয় এবং নিরন্তর ভীম ভৈরবের পূজায় বিপন্মুক্তির চেষ্টা করে। অম্বরে কারারুদ্ধ বনলতা নাটকের অন্তিম মুহূর্তে সূর্যসিংহকে হত্যা করে নাটকীয় চমক সৃষ্টি করেছে—তার চরিত্রের আকস্মিক পরিবর্তন দর্শক-পাঠকের বিস্ময় উদ্রেক করে। আত্মনিবেদনের মহিমায় ভাস্বর সূর্য-মহিষী 'জয়াবতী'। প্রথমাবধি তিনি অম্বররাজকে চিতোরের সঙ্গে অন্যায় বিবাদে বাধা দেন। সকাতর অনুনয় করে বলেন—"মম শ্বশুরের মত তুমিও সর্ব্বদা / চিতোরপতিরে দেখ পূর্ব্বের মতন। / ত্রুটি স্বীকারিয়া পত্র পুনঃ লিখ তাঁরে।" ( ১/২ ) কিন্তু তাঁর সে অনুরোধ উপেক্ষিত হয়। শেষে সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশে জয়াবতী সিন্ধুদেশ-প্রত্যাগত বলসিংহকে ভ্রান্ত অরণ্যপথ থেকে উদ্ধার করেন এবং পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করে বলসিংহের কৃতজ্ঞতার পুরস্কারস্বরূপ স্বামী সূর্যসিংহের জীবনভিক্ষা করেন। বলসিংহ তাঁর প্রার্থনা রক্ষা করলেও শেষ রক্ষা হয় না। লৌহকারায় হত বলসিংহের শোকে উন্মাদিনী জয়াবতী আত্মহননের পথ বেছে নেন। স্বামী এবং দেশের স্বার্থে জীবন বলিদান করে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকেন।

নাটকের ২/২, ২/৪, ৪/২ দৃশ্যে দেবল, জগন্নাথ, পরিচারিকা, নাগরিক, সৈনিক প্রভৃতি চরিত্রের উপস্থিতিতে 'কমিক্ রিলিফ্' সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। 'লৌহ-কারাগার' নাটকে মূলত বনলতার কণ্ঠেই গানের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

নাটকটির 'লৌহ-কারাগার' নামকরণের সার্থকতা বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে নাট্যকাহিনীর পরিসমাপ্তি হয়েছে কারাগারের অভ্যন্তরে। সূর্যসিংহকে হত্যা, জয়াবতীর আত্মহত্যা, বলসিংহ-বনলতার মিলন কারা মধ্যেই ঘটেছে। সর্বোপরি, এ-সব ঘটনার পরিণতি চিতোরের পুনরুদ্ধার।

'লৌহ-কারাগার' ঠিক বিয়োগান্ত নাটক নয়। কারণ বলসিংহ-বনলতার পুনর্মিলনে আনন্দস্বর ধ্বনিত হয়েছে। তবে নাটকে একাধিক মৃত্যুতে বিষাদ ঘনিয়ে এসেছে। রাণা সঙ্গসিংহ, সূর্যসিংহ, ভুজসিংহ, মহালক্ষ্মী, জয়াবতী এতগুলি প্রাণবিসর্জন নাটকে করুণরসের সঞ্চার করেছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য ॥ "এদেশে একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি শকগণকে পরাভূত করেন এবং ৫৮ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বিক্রম-সম্বতের প্রচলন করেন।…বর্তমানে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়া থাকেন যে, জনপ্রবাদের এই বিক্রমাদিত্য এবং মালব ও সৌরাষ্ট্রের শকরাজবিজেতা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য একই ব্যক্তি।"[১৬৩] রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকের 'রাজা বিক্রমাদিত্য' ( ১৮৮৪ ) অবশ্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নন, কিংবদন্তী প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য বলে তাঁকে গ্রহণ করাও কঠিন। রাজকৃষ্ণ তাঁর নাটকের কাহিনী গ্রহণ করেছেন সংস্কৃত কথাসাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' থেকে, সেই সঙ্গে 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা' নামে বহুপরিচিত কথাগ্রন্থ থেকেও তিনি কিছু উপাদান গ্রহণ করেছেন। মনোমোহন বসুর জীবনীকার জানিয়েছেন, মনোমোহন 'বিক্রমাদিত্য বা ভোজরাজার ব্যাপার' নিয়ে একটি নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করেন নি।[১৬৪] 'বেতালপঞ্চবিংশতি'তে গন্ধর্বসেনের তিন পুত্রের কথা বলা হয়েছে—শঙ্কু, বিক্রমাদিত্য ও ভর্তৃহরি। শঙ্কুকে হত্যা করে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করেন। পরে তিনি সন্ন্যাসীর বেশে দেশভ্রমণে বহির্গত হলে ভর্তৃহরি রাজপদে অভিষিক্ত হন। ব্রাহ্মণপ্রদত্ত অমরফল রাজা তাঁর মহিষীকে দেন, সেই ফল মহিষীর কাছ থেকে নগরপাল, এবং নগরপালের কাছ থেকে এক বারাঙ্গনা পায়। পরে তা আবার রাজার কাছে ফিরে এলে ভর্তৃহরি "পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন; এবং সাংসারিক বিষয়ে নিরতিশয়ে বীতরাগ হইয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই; অতএব বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, আর ইহাতে লিপ্ত থাকা কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কর নহে।"[১৬৫] ভর্তৃহরি এরপর গৃহত্যাগ করলে এক যক্ষ রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে ফিরে এলে যক্ষের সঙ্গে নগরদ্বারে সাক্ষাৎ হয়, এবং যক্ষের কাছ থেকে বিক্রমাদিত্য 'তদীয় জীবনসংক্রান্ত গূঢ় বৃত্তান্ত' জানতে

পারেন। এইভাবে চন্দ্রভানু ও যোগীর কাহিনী বেতালপঞ্চবিংশতির উপক্রমণিকায় সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। পঁচিশটি কাহিনী বর্ণনার শেষে বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জানিয়েছে, "যে যোগী তোমায় শবানয়নে নিযুক্ত করিয়াছে, সে কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন; তাহার নাম শান্তশীল। আর যে শব লইতে আসিয়াছে, উহা ভোগবতীর অধিপতি রাজা চন্দ্রভানুর মৃতদেহ। শান্তশীল, যোগসিদ্ধির নিমিত্ত, অনেক কৌশলে, চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করিয়া, প্রায় কৃতকার্য্য হইয়া আছে; এক্ষণে তোমার প্রাণসংহার করিতে পারিলেই, উহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।"[১৬৬] বিক্রমাদিত্য বেতালের নির্দেশ মতো খড়্গাঘাতে যোগীর শিরশ্ছেদন করলেন। বেতাল-পঞ্চবিংশতিতে বর্ণিত ভর্তৃহরি-বৃত্তান্ত দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাতেও পাওয়া যায় তবে সেখানে বিক্রমাদিত্যের বত্রিশসিংহাসন-প্রাপ্তির বিবরণ বেশি প্রাধান্য পেয়েছে— "তৎসিংহাসনে খচিতা দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাঃ সন্তি। তাসাং শিরসি পদং দত্বা তৎ সিংহাসন-মধ্যাসিতব্যম্। তদতিমনোহরং সিংহাসনমিন্দ্রাজ্ঞাং চ গৃহীত্বা বিক্রমার্কো নিজাং পুরীমগমৎ। তদনন্তরং শুভে মুহূর্ত্তে শুভে লগ্নে সিংহাসনমধিষ্ঠায় রাজ্যং করোতি স্ম।"—"সেই সিংহাসনে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা খচিত ছিল। ঐ পুত্তলিকা-গণের মস্তকে পদবিন্যাস করিয়া সেই সিংহাসনে আরোহণ করিতে হয়। রাজা বিক্রমাদিত্য সেই অতি মনোহর সিংহাসন লইয়া, ইন্দ্রের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজপুরীতে আগমন করিলেন। তদনন্তর শুভমুহূর্ত্তে ও শুভলগ্নে সেই সিংহাসনের বসিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।"[১৬৭] নাটকে রাজা বাহুবল বিক্রমাদিত্যকে বত্রিশসিংহাসন দান করেছেন।

রাজকৃষ্ণ 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটক রচনাকালে বেতালপঞ্চবিংশতি ও বত্রিশসিংহাসনে পূর্ববর্ণিত কাহিনী বিশ্বস্তভাবেই অনুসরণ করেছেন। অনেক জায়গায় সংলাপ রচনায় তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদের ভাষা প্রায় আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করেছেন, যেমন—

"তুমি আমায় পরাভূত করিয়াছ। তোমার প্রভাব ও পরাক্রম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তুমি যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য। এক্ষণে আমায় ছাড়িয়া দাও; আমি তোমায় প্রাণদান দিতেছি। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, তুই বাতুল, নতুবা এরূপ অসঙ্গত কথা বলিবি কেন। তুই আমার প্রাণদান কি দিবি; আমি মনে করিলে, এখনই তোর প্রাণদণ্ড দিতে পারি।"[১৬৮]

যক্ষ।—আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমিই রাজা বিক্রমাদিত্য বটে। / তোমায় প্রাণদান করবো।

বিক্রম।—( সাহাস্যে )—হাঃ হাঃ! / তুমি আমায় প্রাণদান করবে? / এখনি মনে করিতো / তোমায় মেরে ফেলতে পারি। (৩/৫)

তবে রাজকৃষ্ণ নাটকের ভূমিকায় ('বিজ্ঞাপন') দাবি করেছেন, "বত্রিশ

সিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বিষয় যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে, এ নাটকের আদ্যোপান্ত তদনুরূপ নহে। ইহার কোন কোন স্থানে ঐ দুইখানি গ্রন্থের গল্পভাব আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আমার স্বকপোল-কল্পিত ঘটনা বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পাঠকগণ এই নাটকের সহিত ঐ দুইখানি পুস্তক মিলাইয়া দেখিলেই তৎসমস্ত বুঝিতে পারিবেন।" বলাবাহুল্য নাটকের প্রয়োজনে কথাকাব্যের কাহিনীর পরিবর্তন অপরিহার্য। তবে সবসময় 'স্বকপোল-কল্পিত ঘটনা'র সংযোজন নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ করে না,—মৌলিকতা প্রদর্শন বা চমকসৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন লাভ হয় না। রাজকৃষ্ণ অধিকাংশ নাটকে চক্রান্ত-প্রতিহিংসা-হত্যা দৃশ্যের অবতারণা করেছেন ( 'মীরাবাই' নাটকের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে )। আর এই চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের প্রয়োজনেই তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়েছে দুর্বৃত্ত চরিত্রের বিশেষ একটি টাইপ। 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকে শঙ্কুর বিদূষক উদরেশ্বর এইরকম একটি চরিত্র। মুখ্যত কৌতুকরস সৃষ্টির জন্য সংস্কৃত নাটকে রাজার বয়স্য বিদূষক চরিত্রের অবতারণা করা হয়। কিন্তু রাজকৃষ্ণের নাটকে বিদূষক কখনও হাস্যরস সৃষ্টিতে সহায়তা করলেও তার মুখ্য ভূমিকা চতুর চক্রী এবং নীচ প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তির। আশানন্দের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ এবং পরিণামে মৃত্যুবরণ নাট্যদ্বন্দ্বের সহায়ক, তবে বিক্রমাদিত্যের মুখে শাস্তিবচন কোনো নাটকীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করেনি—"পাপিষ্ঠ প্রাণত্যাগ কল্লে! / আহা, যদি এরূপ পাপাচরণ না কত্তো, / তা হলে এর এরূপ পরিণাম হত না। / ওঃ, দুরাত্মা কতই পাপময়ী চেষ্টা কল্লে, / কিন্তু শেষে / নিজে পাপিষ্ঠ বন্ধুর দশা প্রাপ্ত হলো। / 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'।" ( ৫/৫ )

অন্যদিকে রাজকৃষ্ণ রাজা বিক্রমাদিত্যের তথাকথিত 'ঐতিহাসিক' বিবরণ অবলম্বনে নাটক রচনা করলেও পৌরাণিক নাটকের অনুসরণে শুধু অলৌকিক প্রসঙ্গ নয়, একাধিক দৃশ্যে স্বর্গের দেবদেবী এবং অপ্সরাদেরও স্থান দিয়েছেন। শিব কর্তৃক বিক্রমাদিত্যকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত করা ( ১/১ ), শঙ্কু-হত্যার সমর্থনে উজ্জয়িনীর রাজলক্ষ্মীর যুক্তিপ্রদান ( ১/৩ ), বিক্রমাদিত্যকে রাজলক্ষ্মীর আশীর্বাদ ( ১/৪ ); বিক্রমাদিত্যকে সিংহাসনদানে কৈলাসে শিবদুর্গার 'কৌশল' ( ২/১, ২/৩ ), তাল-বেতাল ও চামুণ্ডার সহযোগিতা ( ৪/৩ ) প্রভৃতি দৃশ্য বিক্রমাদিত্যের মহিমা বৃদ্ধি করেছে কি না সন্দেহ, কিন্তু নাটকের ঐতিহাসিকতা রক্ষা করেনি। আসলে কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ কাহিনীবৃত্তের অগ্রগতি ও অনিবার্য পরিণাম প্রদর্শন এখানে নাট্যকারের লক্ষ্য নয়, তিনি 'কিংবদন্তীমূলক' চমৎকারিত্বপূর্ণ এক আখ্যান রচনা করতে চেয়েছেন। নাটকের অন্তিম দৃশ্যে বিক্রমাদিত্য ও ভানুমতীর মিলন ঘটেছে 'মায়াস্বর্গে'—মিলন ঘটিয়েছেন দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। দেবী দুর্গা জানিয়েছেন—"বৎস বিক্রমাদিত্য! বৎসে ভানুমতি! / তোমরা দেবভক্তি ও

সৎকার্য্যের গুণে / মায়াস্বর্গ দেখ্‌লে। / যাবজ্জীবন ধর্ম্মাচরণ কর,/অন্তিমকালে এই মায়া-স্বর্গ অপেক্ষা / অনন্ত সুখ সৌন্দর্য্যময় প্রকৃত স্বর্গে / দেবগণের সঙ্গে অমর হয়ে অবস্থান করবে।" (৫/৬)। রাজকৃষ্ণ 'রাজা বিক্রমাদিত্য'কে 'A Romantic Tragi-Comedy' বললেও এর মধ্যে লৌকিক ট্রাজেডি বা কমেডি—কোনো কিছু সন্ধান করে লাভ নেই। উদয়েশ্বর বা আশানন্দের পরিণামকে ট্রাজেডি বলা যায় না; বিক্রমাদিত্যের দেবানুগ্রহলাভ পুরাণকাহিনীর পক্ষেই সংগত, আর পুরাণকে কমেডি বলা নিরর্থক।

নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের 'সাহায্য-রজনী' হিসাবে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর বেঙ্গল থিয়েটারে 'রাজা বিক্রমাদিত্যে'র প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

বনবীর ।। 'বনবীর' নাট্যকাহিনীর কাঠামো রাজকৃষ্ণ গ্রহণ করেছেন টডের রাজস্থান থেকে।[৬৯] তবে বনবীরের নামে নাটকের নামকরণ করা হলেও নাটকের প্রধান আকর্ষণ ধাত্রী পান্না। ধাত্রী পান্নাকে নিয়ে বাংলায় একাধিক নাটক রচিত হয়েছে।[৭০] 'বনবীর' নাটকের (১৮৯২) উৎসর্গপত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি ধাত্রীপান্নার অলৌকিক ত্যাগ এবং পরার্থপরতার আদর্শ নাট্যকারকে অভিভূত করেছে। তাঁর কাছে—"রাজধাত্রী পান্না! নিঃস্বার্থপরতার প্রতিমূর্ত্তি পান্না!··· ভারতের পরার্থপরা পান্না, তুমি এক্ষণে ভগবানকে পরার্থপরতা-পুষ্পমালায় পূজা করিতেছ, কিন্তু তোমার ভারতের আমরা হেন স্বার্থপর মানব আজি কি দিয়া তোমার পবিত্র আত্মার পূজা করিব, খুঁজিয়া পাই না; তবে তোমারই অলৌকিক স্বার্থশূন্যতা ও পরার্থপরতার অপূর্ব্ব চিত্রাঙ্কিত আমার এই যৎসামান্য 'বনবীর নাটক'-রূপ সৌরভহীন ক্ষুদ্র ফুলটি দিয়া তোমার পরম-পবিত্র আত্মার পূজা করিলাম।" রাজকৃষ্ণ প্রচলিত ধাত্রী পান্না কাহিনী গ্রহণ করেও সম্ভবত অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়োজনে বনবীরকে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভূমিকা দিয়েছেন। অন্যদিকে 'রাজরক্তপিপাসু বনবীরে'র চরিত্রাঙ্কণের মধ্যে শেকস্‌পীয়রীয় ঐতিহাসিক নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। নাটকটি প্রকাশের পর সমালোচক মন্তব্য করেন,—"From a perusal of the above work, it would appear that Babu Raj Krishna Ray, its author, is as good a hand at mythological and romantic plays as at historical ones.···The hero is a successful portrait of one who has struggled with the conflicting promptings of duty and ambition, and whose repentance has atoned for his atrocities in the past. Sikarbal the tool and dupe of Sitalseni, lends to the piece some humour, grim though it is, by his ravings, while under the

attack of money on the brains. In spite of the simplicity of its style and plot, the book under notice possesses many features that should render it attractive reading."[১৭১]

নাট্যকার 'বনবীর'কে 'ভয়ানক-রৌদ্র-বীর-হাস্য-করুণ-রসাশ্রিত ঐতিহাসিক নাটক' নামে অভিহিত করেছেন। ধাত্রীপান্নার কাহিনী করুণ-রসাশ্রয়ী সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজকৃষ্ণ 'বনবীর' নাটকটিকে মিলনান্ত পরিণাম দান করেছেন। নাটকের আখ্যাপত্রে 'প্রণেতা শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়' উল্লেখের পর 'ইন্‌ডিয়ান্ মিরর্' পত্রিকা প্রদত্ত বিশেষ অভিধাটি ব্যবহৃত হয়—'দি গ্রেট ট্র্যাজিও-কমেডিয়ান্ অফ্ দি ডে'। অভিনেতা হিসাবে রাজকৃষ্ণ হাস্য ও করুণরস সৃষ্টিতে সমান দক্ষ ছিলেন, কিন্তু নাট্যকার হিসাবে তাঁর অনুরূপ কৃতিত্ব হয়তো দাবি করা যায় না। তবে বনবীরের মতো ঐতিহাসিক নাটকে শিকরবলের মতো কাল্পনিক চরিত্রকে অস্বাভাবিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে। কূটবুদ্ধি, চক্রান্তপ্রিয় শিকরবলের পরিণাম এক হিসাবে ভয়ানক ও করুণরসের মিশ্ররূপ বলে পরিগণিত হতে পারে। যথার্থ রৌদ্র বা বীররসের সৃষ্টিতে রাজকৃষ্ণ আদৌ সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি। আসলে একাধিক রসের অবতারণার মধ্য দিয়ে নাট্যকার যেমন প্রত্যেকটি দৃশ্যকে চমৎকারিত্বময় করে তুলতে চেয়েছেন, তেমনি নাট্যকাহিনীর মধ্যে জটিলতা ও বিস্তার আনয়নও তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এই ধরনের একাধিক স্তর বা ধারা-বিশিষ্ট নাটকে ঘটনাগত ঐক্য-রক্ষার যে একান্ত প্রয়োজন সেদিকে রাজকৃষ্ণ মনোযোগ দেননি। টডের রাজস্থান গ্রন্থটি ক্রনিক্‌ল্-ধর্মী রচনা, অর্থাৎ সেখানে পরম্পরাক্রমে রাজকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিক্রমজিৎ, বনবীর এবং উদয়সিংহের তিনটি কাহিনীকে একই নাটকের মধ্যে পরিবেশন করতে যাওয়ার ফলে নাটকের নাম-চরিত্রটি যথোচিত গুরুত্ব লাভ করেনি। এবং ধাত্রীপান্নার 'অলৌকিক ধর্মপরায়ণতাও' অজস্র ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে কিছুটা অন্তরালবর্তী হয়ে পড়েছে।

বিক্রমজিতের কাহিনী বিশেষত সর্দারদের সঙ্গে তার বিরোধ এবং করমচাঁদকে অপমানিত করার ঘটনা টড্-অনুসরণে নাটকে বর্ণিত হয়েছে। বনবীরের ক্ষমতা-লাভ এবং উদয়সিংহের নিধন প্রয়াসও রাজস্থানের জনশ্রুতি সমর্থিত। উদয়ের ধাত্রী কর্তৃক একটি ফলের ঝুড়িতে শুইয়ে নাপিতের হাত দিয়ে উদয়কে দুর্গের বাইরে প্রেরণ এবং উদয়কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বনবীরের সেখানে প্রবেশ, সর্বোপরি সেই সংকট মুহূর্তে পান্নার আচরণ টড্ যেভাবে বর্ণনা করেছেন রাজকৃষ্ণ তা অবিকৃত ভাবে নাটকে গ্রহণ করেছেন।—"Her [ Panna's ] lips refused their office ; she pointed to the cradle, and beheld the murderous steel buried in the heart of her babe. The

little victim to fidelity was burnt amidst the tears of the rawula, the inconsolable household of their late soverign, who supposed that their grief was given to the last pledge of the illustrious Sanga."[১৭২]

পান্না। ( চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে শায়িত চন্দনকে প্রদর্শন )

বন। ঐ ঐ ষড়যন্ত্রবীজ পর্য্যঙ্কে ঘুমায়।
ঘুমাইবে এবে অনন্ত নিদ্রায়। ( চন্দনকে আক্রমণ )

চন্দন। ( ভগ্ননিদ্র হইয়া যন্ত্রণায় ) মা ! মা !

পান্না। ( উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ) দোহাই তোমার !
পায়ে ধরি ! ভিক্ষা দাও রক্ষা কর—
ভিক্ষা দাও। ( মূর্চ্ছা )

বন। ভিক্ষা !—ভিক্ষা !—নিমেষ অপেক্ষা।
এই করিনু নির্ম্মূল বিষ-কুল ! ( চন্দনকে ছোরাঘাতে হত্যাকরণ )
উৎপাটিনু প্রাণের কণ্টক।
নিভাইনু শ্মশান-অনল !
ঘুচাইনু দুশ্চিন্তার জ্বালা।
নে ধাত্রি, নে ভিক্ষা নে—
জীবিত উদয় নয়—নির্জ্জীব উদয় !
( পান্নার সম্মুখে চন্দনের মৃতদেহ নিক্ষেপ ) (৩/৩)

পান্নার বিপরীত চরিত্র হিসাবে নাট্যকার বনবীরের মাতা শীতলসেনীকে নাটকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। পান্না রাজপুত্রকে রক্ষা করার জন্য নিজের পুত্রকে বিসর্জন দিয়েছে; শীতলসেনী নিজের পুত্রকে রাজা করার জন্য সবরকম অন্যায় কর্মে নিয়োজিত হয়েছে। শীতলসেনীর উচ্চাভিলাষ লেডি ম্যাকবেথের কথা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু তার পরিণতি আকস্মিক ও সংগতিহীন। বনবীরের রূপান্তর সাধনে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এখানে বনবীরের মনস্তত্ত্ব তেমন স্পষ্টভাবে ফোটেনি। হঠাৎ যেন বনবীর রাজসিংহাসন লাভের পর আবিষ্কার করেন, "অবস্থায় মতিগতি বিবর্ত্তিত হয় / অবস্থাই সর্ব্বমূল।" (২/১) বিক্রমজিতের প্রথমদিকের উদ্ধত ও অমানবিক আচরণের সঙ্গে কারাগারে তার অনুতপ্ত ও বিনীত আচরণ মেলে না। তবে সিংহাসন লাভের পর বনবীর কর্তৃক বিক্রমজিৎকে হত্যার দৃশ্যটি সুপরিকল্পিত, এবং ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত-বিরোধী নয়। কিন্তু তারপর মায়ের চক্রান্ত জানতে পেরে বনবীরের আত্মঅনুশোচনা এবং বিদায়গ্রহণ নাটকীয় মুহূর্ত রচনা করলেও তার মধ্যে চরিত্রের পূর্বাপর সংগতি রক্ষিত হয়নি,—"যে যাহার কর্ম্মফল করিবে বহন। / যাই যাই, কলুষিত পাপীর জননী /

বিদায় জন্মের মত,/হতে পারে নরকে মিলন।" (৪/২) বনবীরের পরিণাম বর্ণনায় নাট্যকার কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকে কল্পনার কোনো অবকাশ নেই তা নয়, কিন্তু কল্পিত কাহিনী বা চরিত্র ইতিহাসের সম্ভাবনাপ্রসূত হওয়া প্রয়োজন। বনবীর অনেকাংশে নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি, কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকে যেন প্রক্ষিপ্ত চরিত্র।

নাটকের আখ্যাপত্রে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার উদ্ধৃতি মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাসের প্রভাবজাত—সীতারাম চরিত্র পরিস্ফুটনে বঙ্কিমচন্দ্র যে-শ্লোক ব্যবহার করেছেন, তা কিন্তু বনবীরের ক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্য হয়েছে এমন মনে হয় না।

উদয়সিংহের সিংহাসনলাভে নাট্যকাহিনীর সমাপ্তি। তবে বনবীর-কেন্দ্রিক নাটকে উদয় বা পান্না কেউই তেমন প্রাধান্য পায়নি।

স্টার রঙ্গমঞ্চে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর 'বনবীর' নাটকের প্রথম অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়—"New Play ! New play !! New play !!! / Star Theatre / Saturday, 26th November, at 9 p. m. / Baboo R. K. Ray's New Five Act Drama / BANABIR / splendedly staged ! / Magnificiently Dressed !! / Perfectly Rehearsed !!! / A guilty soul its own tormentor ! / A woman's self-sacrifice and loyalty unrivalled / in History or Fiction ! / Sweet and Original Songs !"[১৭৩]

## ।। প্রহসন ।।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশ করেন তখন আখ্যাপত্রে এগুলিকে 'প্রহসন' নামে চিহ্নিত করা হয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'প্রহসনে'র উল্লেখ আছে, যার দুটি ভাগ শুদ্ধ আর সংকীর্ণ। পরবর্তীকালে ধনঞ্জয় এবং বিশ্বনাথ দশরূপকের মধ্যে প্রহসনকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। প্রহসনের অঙ্গীরস বলা হয়েছে হাস্যরস, এবং বৃত্ত কবিকল্পিত নিন্দনীয়দের বৃত্ত। মধুসূদন তাঁর দুটি নাট্যরচনাকে 'প্রহসন' নামে অভিহিত করলেও চিঠিপত্রে সেগুলিকে সর্বদাই 'Farce' বলেছেন, এবং পাশ্চাত্য ফার্সের আদর্শেই তা রচনা করেছেন। এদিক থেকে ফার্সের প্রতিশব্দ হিসাবে 'প্রহসন' শব্দের প্রচলন মধুসূদনের হাতে ঘটেছে, এমন মনে করা যায়। অন্যদিকে মধুসূদন-পরবর্তী বাংলা-প্রহসনধারায় কমবেশি পরিমাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সম্মিলন প্রয়াস দেখা যায়।

ইংরেজিতে ফার্স শব্দের আদি অর্থ ছিল 'stuffing' অর্থাৎ শূন্যস্থান পূরণের জন্য কয়েকটি নাট্যদৃশ্যের সংযোজন। মূল নাটকের শেষে অথবা দু'টি নাটকের মধ্যে সময়ক্ষেপ বা বৈচিত্র্যের জন্য ফার্সের অবতারণা। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যাভিধানে ফার্স বলতে বোঝানো হয়, "low comedy, intended solely to provoke laughter through gestures, buffoonery, action, or situation, as opposd to comedy of character or manners."[১৭৪] বাংলা প্রহসনেও হাস্যরস বাহ্য অসংগতির উপর বেশি নির্ভর করে—সেখানে পদে পদে হাস্যকর ঘটনার সমাবেশ করে লোক হাসাবার আয়োজন করা হয়—এ হাসি উদ্দাম তরল, হয়তো কখনো নিতান্ত রুচিবিগর্হিত। নিকল ফার্সের আলোচনাকালে চরিত্র ও সংলাপ অপেক্ষা ঘটনাতিরেক, এবং ঘটনার মধ্যে আতিশয্য ও অতিরঞ্জনের উপর বেশি জোর দিয়েছেন, "The main characteristics of a farce are dependence in it of character and dialogue upon mere situation. This situation, moreover is of the most exaggerated and impossible kind."[১৭৫] বলাবাহুল্য, বাংলা প্রহসন একদিকে যেমন সমাজচিত্র হিসাবে রচিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে অট্টহাস্য সৃষ্টির প্রয়োজনে সেখানে অবাস্তব-অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সমালোচনাকালে মন্তব্য করেছিলেন, "প্রহসনের দুই অভিপ্রায়—এক অভিনয়ে দর্শকের মনোরঞ্জন, দ্বিতীয় পাপানুরাগ, দুষ্কৃতি অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি মন্দের তিরস্কার দ্বারা অপনোদন।"[১৭৬] রাজকৃষ্ণের প্রহসন রচনার পিছনে এই দু'টি অভিপ্রায়ই লক্ষ্য করা যাবে।

মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনোমোহন বাংলা প্রহসনধারাকে কমবেশি পরিমাণে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছেন,—অমৃতলাল বসুর হাতে বাংলা প্রহসন পরিণতি ও সার্থকতা লাভ করেছে। রাজকৃষ্ণের অবস্থান এঁদের মধ্যস্থলে—তিনি দীনবন্ধু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের দ্বারা প্রভাবিত হলেও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সক্ষম হয়েছেন এবং এখানেই তাঁর কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুকুমার সেনের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, "রাজকৃষ্ণের প্রহসনে হাস্য-রসের উৎকট কৃত্রিমতা অথবা গ্রাম্যতার আতিশয্য নাই।"[১৭৭] রাজকৃষ্ণের প্রহসনে কোথাও কৃত্রিমতা বা গ্রাম্যতা নেই তা নয়, কিন্তু সাধারণভাবে সেগুলি সংযত রচনা এবং কোথাও কোথাও উৎকৃষ্ট হাস্যরসের নিদর্শন। ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা না থাকলে প্রথম শ্রেণীর সামাজিক নাট্যকার হওয়া যায় না। সেইসঙ্গে মানব-চরিত্রের জটিল ও দুজ্ঞেয় রহস্য সম্পর্কে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে মমত্ববোধ ও সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন। প্রহসন রচনাতেও সমাজ ও ব্যক্তি দুই-এরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কারণ সামাজিক সমস্যা এবং ব্যক্তিসমস্যা পরস্পর জড়িত।

রাজকৃষ্ণ রায়ও প্রহসনের মধ্য দিয়ে "সে যুগের নানা আতিশয্য ও সামাজিক ব্যাধির প্রতি ব্যঙ্গের কষাঘাত হেনেছেন।"[১৭৮] তাঁর সব প্রহসনই কমবেশি পরিমাণে উদ্দেশ্যমূলক।

রাজকৃষ্ণের রচনায় ভাষাপ্রয়োগে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। চরিত্র অনুযায়ী তিনি ভাষার ব্যবহার করেছেন। সে-ভাষাপ্রয়োগ যথেষ্ট প্রশংসা পেতে পারে। তবে যে ব্যাপারটা শ্রুতিকটু, তা হলো স্থানবিশেষে নিতান্ত গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার, কখনও শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনের সমালোচনাকালে বলেছিলেন—"...এ প্রহসনের কোন কোন স্থলে এমত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যে ভদ্রলোক পরস্পরের সাক্ষাতে উচ্চারণ করেন না। ইহাকে অশ্লীলতা বলা যাউক বা না যাউক ; একটু দোষ বটে। কিন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারা যায় যে, ইহাতে কদর্য্যভাবজনক কথা কিছুই নাই। এমন কোন কথা নাই যে তাহাতে পাঠকের বা দর্শকের মন কলুষিত হইতে পারে।"[১৭৯] আমরা রাজকৃষ্ণের প্রহসন সম্পর্কেও অনুরূপ উক্তি করতে পারি।

রাজকৃষ্ণ প্রায় বারো-তেরোটি প্রহসন রচনা করেন। তার মধ্যে অধিকাংশই 'বীণা' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। অন্য যে সব প্রহসন মঞ্চস্থ হয়—সেগুলি 'স্টার' এবং 'বেঙ্গল' থিয়েটারে। রাজকৃষ্ণ রায় এমন কিছু প্রহসন লেখেন, যাদের কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেন তাঁরই পূর্বরচিত নানা গল্প থেকে। ফলে গল্প এবং প্রহসনের বিষয়বস্তু অনেক সময় অভিন্ন।

দ্বাদশ গোপাল ( ১৮৭৮ ) ।। এ-গ্রন্থে রাজকৃষ্ণ রায় 'জ্ঞানগর্ভ শিক্ষামানী' রূপে চিহ্নিত। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য প্রহসনটি লেখা।

সে-কালে নানা উৎসব উপলক্ষ করে শিক্ষিত বাবু সমাজের মদ্যপান চরম আকার ধারণ করতো। আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যভিচারও প্রকাশ পেতো। হুগলি জেলার মাহেশে 'দ্বাদশ-গোপাল' দর্শন উপলক্ষেও এ-ধরনের অনাচারে উন্মত্ত হয়ে উঠতেন তাঁরা। এ-প্রহসনে তার পরিচয় পাই। এ-ধরনের আচরণকে ব্যঙ্গ করেই প্রহসনটি লিখিত।

নৌকা করে চার বন্ধু নন্দলাল, হরলাল, জহরলাল ও বিধুভূষণ, স্খলিতা নারী তিলোত্তমাকে নিয়ে দ্বাদশ গোপাল দর্শনে চলেছে। নৌকায় সুরার ফোয়ারায় সঙ্গে নারীকণ্ঠের সুরের ধারা মিলে তাদের চঞ্চল করে তুলেছে। এমন অবস্থায় নেশাগ্রস্ত বিধুভূষণ হঠাৎ রবার্ট বার্ণসের Bonny Peggy Alison থেকে কয়েকটি পংক্তি চিৎকার করে বলতে থাকে—

"I' ll kiss thee yet, yet
And I 'll kiss thee o'er again ;
And I 'll kiss thee yet, yet,
My bonniy peggy Alison !"

শেষ পংক্তির প্রথম শব্দটি My হবে কি Our হবে, তা নিয়ে কলহ শুরু হয় হরলালের সঙ্গে। কোলাহল শুনে পাহারাওয়ালা সমেত পুলিশ ইন্সপেক্টর এসে নদীতীরে নৌকা ভেড়াতে আদেশ করে মাঝিদের। সবাই মুক্তিভিক্ষা করে। তিলোত্তমা কেঁদে বলে, "আমি কিছু করিনি, সাহেব। আমি মাহেশে ডোয়াডশ গোপাল ঠাকুর দেক্তে এসেছিলুম, সাহেব।" ইন্সপেক্টর মন্তব্য করে—"এই চারজন বুঝি টোমার ডোয়াডশ গোপাল বাবাঠাকুর !" পুলিশের কাছে সকলকেই ধরা দিতে হয়। কাহিনী শেষে সাহেবের মুখে কিছু কটূক্তি উচ্চারিত হয়েছে— "টোম্ রাসকেল লোক বরষ বরষ ইঁহা আয়কে ইসিটরে কি বড্‌মাসী করটা হ্যায়। টোম লোক্‌কা মাফক আওর আওর ডোয়াডশ গোপাল ডেক্‌নেকে লিয়ে মাহেশমে আটা হ্যায় ; লেকেন শালা লোককো ঠাকুর ডেক্‌না খালি মুঃ কি বাট হ্যায়।… শালা লোক হিণ্ডু হোয় কে, ঠাকুরা পাশ রেণ্ডী নাচওয়াতা আওর দারু পিটা হ্যায়। এই ক্যা টোমলোক্ কো হিণ্ডুয়ানী !!"

প্রহসনটির প্রচ্ছদের উদ্ধৃতি-দু'টির মধ্য দিয়ে মদ্যপানের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। একটি হলো—

'Rosy Bacchus, give me wine ;
Happiness is only thine."—Chatterton.

অন্যটি দীনবন্ধু মিত্রের রচনা থেকে—

"ভোলারে ভুল না মাতা এই ভিক্ষা চাই।"

উদ্দেশ্য স্পষ্ট করার পক্ষে প্রহসন-শেষের বাউল গানটির ব্যবহার সুন্দর।

"তোদের মতন অনেক বদ্ ইয়ার
দ্বাদশ-গোপাল দেক্তে এসে, দেখে কারাগার,
তবু কি হয় না সরস ? ( ও শালারা )
যা শালারা রসাতল।"

'দ্বাদশ-গোপাল' প্রহসনের মধ্য দিয়ে রাজকৃষ্ণ বাবুশ্রেণীর লোকেদের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়েছেন। তাদের নৌকাবিহার, সুরাপান প্রবণতা, গণিকাসক্তি এবং চারিত্রিক শিথিলতা—সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। মদ্যক্রয়ে অর্থসংগ্রহের জন্য তারা চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করাকেও অপরাধের বলে মনে করে না। তাই নন্দলাল বাড়ির শালগ্রাম শিলার সোনার পৈতে চুরি করে ৩০ টাকায় বেচে মদের অর্থসংগ্রহ করে। হরলাল ভবিষ্যতের মদের কড়ি ঠিক রাখে স্ত্রীকে মেরে তার হার কেড়ে এনে। বিধুভূষণ স্ত্রীপুত্রকন্যাকে অনাহারে রেখে Peley & Co. চাকরির দেড়শো টাকার সবটাই তিলোত্তমাকে দেয়। কিন্তু তৎকালীন বিদেশি শাসন এদের কঠোর হাতে দমনও করতো। যেমন এখানে সকলেরই অন্তিম পরিণতি শ্রীঘর-যাত্রা। ইংরেজ এখানে হিন্দু জাতি ও ধর্মের তীব্র নিন্দা করেছে। হিন্দুর চরিত্র এখানে ম্লান হয়ে গেছে অনেকাংশে।

রাজকৃষ্ণ রায়ের নাট্যচিত্রের বীজ লক্ষ্য করা যাবে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নক্শা'তে মাহেশের স্নানযাত্রার বর্ণনায়। আমোদ-উল্লাস তখনও সমানভাবে হতো। সেই চূড়ান্ত আমোদের চিত্রের নিপুণ উপস্থিতি এইভাবে হয়েছে—"গঙ্গারও আজ চূড়ান্ত বাহার ; বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজগিজ কচ্চে, সকলগুলি থেকেই মাতলামো রং, হাসি ও ইয়ার্কির গর্‌রা উঠ্‌চে, কোনটিতে খ্যামটা নাচ হচ্চে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায় ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন...।"[১৮০] এই বিষয়কে অবলম্বন করে সে কালে অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তবে রচনার গুণে রাজকৃষ্ণের প্রহসনের চিত্র বাস্তবরূপ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সে-কালের সমাজজীবনের বিকৃত রুচি এবং নৈতিক অধঃপতনের যে-পরিচয় এ প্রহসনে পরিস্ফুট হয়েছে, বাঙালির সামাজিক ইতিহাস-রচনায় তা সহায়ক বিবেচিত হতে পারে।

উৎকট বিরহ-বিকট মিলন বা আগমনী-বিজয়া ( ১৮৮৪ )।। নাটকটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত 'রাজকৃষ্ণ-গ্রন্থাবলী'র প্রথম ভাগে ( ১৮৮৪ ) নাটকটি পাওয়া যায় ; সুতরাং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে 'উৎকট বিরহ-বিকট মিলন' রচিত হয়েছে। পরে বসুমতী সাহিত্য

মন্দিরের 'রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী'র পঞ্চম ভাগে এই 'ঔপহাসিক হাস্যনাটক'টি স্থান পেয়েছে। রাজকৃষ্ণ নাটকের রচনাশৈলী নিয়ে সারাজীবন নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন। প্রহসনের প্রচলিত আঙ্গিকের একাধিক প্রকারভেদ তাঁর রচনাবলীতে দেখা যাবে। 'উৎকট বিরহ-বিকট মিলন'কে তিনি 'A Parodical Comedy বা ঔপহাসিক হাস্যনাটক' বলেছেন। কবি বা কাব্যবিশেষের ব্যঙ্গ-অনুকৃতিকে প্যারডি বলে। সাহিত্যাভিধানে এইভাবে প্যারডির লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে— "The imitative use of the words, style, attitude, tone and ideas of an author in such a way as co make them ridiculous. This is usually achieved by exaggerating certain traits, using more or less the same technique as the cartoon caricaturist. In fact, a kind of satitical mimicry. As a branch of satire its purpose may be corrective as well as derisive"[১৮১] বাংলায় 'প্যারডিক্যাল কমেডি' লেখার সূত্রপাত হয় রাজকৃষ্ণের হাতে, তবে এই ধারাটি পরবর্তীকালেও খুব বেশি অনুসৃত হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন 'আনন্দ বিদায়' লেখেন তখন তিনি তাকে 'প্যারডি' নামে অভিহিত করেন এবং 'প্রস্তাবনা'য় লেখেন—"এটা এক অভিনব নাটিকা। / ইংরাজি ভাষাতে একে বলে 'প্যারডি'— / জানেন ত পাঠক ও পাঠিকা। / প্যারডিতে প্রহসনে পিষিয়ে / গুলে নিয়ে, অপেরাতে মিশিয়ে / কটু ও মিষ্টে—/ (পরে) যা থাকে অদৃষ্টে / (কাব্যে) কুনীতির পৃষ্ঠে ঝাঁটিকা।"[১৮২] 'উৎকট বিরহ-বিকট মিলন'ও এদিক থেকে প্যারডি এবং প্রহসনের এক মিশ্ররূপ। রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়ে রাজকৃষ্ণ একসময় 'চতুরালী'-'চন্দ্রাবলী'র মতো কৌতুকনাট্য লিখেছেন, কিন্তু রাধাকৃষ্ণলীলা তো কৌতুকের সামগ্রী নয়। উনিশ শতকে এই বিরহ-মিলনের কাহিনী নিয়ে অনেক পালাগান লেখা হয়েছে, রাজকৃষ্ণ তারই প্যারডি রচনা করতে চেয়েছেন 'উৎকট বিরহ-বিকট মিলনে'। ধনী যুবক জগৎপ্রসন্ন লম্পট কৃষ্ণের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, শ্রীদাম-সুদামের মতো তাঁর নিত্য সাথী সুবলচন্দ্র ও যুগলকিশোর দুই ইয়ার। নিমাইচরণ যদি আয়ান হন, তাহলে তার স্ত্রী রাধামণির রাধা হতে দোষ কি? কিন্তু এখানে কাহিনীর অনুকৃতি তেমন প্রাধান্য পায়নি, কারণ 'সংশোধনী' উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা স্যাটায়ার নির্মল হাস্যরস সৃষ্টিতে কদাচিৎ সক্ষম হয়। মাইকেল মধুসূদনের 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের অন্তিম ভরতবাক্যের অনুসরণে রাজকৃষ্ণ রচনা করেন—"ধর্ম্মের কল হাওয়ায় নড়ে / পাপ কর্ম্ম ধরা পড়ে / পাপ কল্লে ভুগতে / হয় / সবার যেন মনে রয়।" (৪/১) কিন্তু মধুসূদনের প্রহসনে চরিত্র পরিকল্পনায় ও কাহিনীবৃত্ত নির্মাণে যে নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে, রাজকৃষ্ণের রচনায় তার সন্ধান মেলে না।

রাজকৃষ্ণের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সংলাপ রচনায়। সমগ্র প্রহসনটি ছন্দ-বদ্ধ রচনা; এবং একাধিক ছন্দের ব্যবহার শুধু নয়, ছন্দ নিয়ে নানা ধরনের খেলায় যেন মেতে উঠেছিলেন রাজকৃষ্ণ এই 'ঔপহাসিক হাস্যনাটক' লেখার সময়। দলবৃত্ত ছন্দের সমিল প্রবহমান রূপটি বাংলা কবিতায় বা নাটকে এর আগে আমরা দেখেছি বলে মনে হয় না। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্যারডি রচনায় রাজকৃষ্ণ বেশ সাফল্য লাভ করেছেন—

কলিকাতা মেডিক্যাল কালেজের ধারে
রেলিঙের বহির্ভাগে ফুটপাথে বসি,
খোঁড়াগণ থাকে যথা, উঠিতে হাঁটিতে
নাহি পারে, সেইরূপ মা লক্ষ্মী আমার
লোহার সিন্দুকে থাক্ চিরকাল তরে,
কি ভয় তা হোলে মোর? রোজ রোজ আমি
নব নব রমনীর প্রেম—কামরাঙা
রঙ্গে ভঙ্গে ভাঙ্গি খাব গপ্—গপ্ করি।
তেঁই বলি—
ধন্য রে বাছনি তুমি জগৎ চৌধুরী। (২/১)

গৈরিশ ছন্দের ব্যঙ্গ-অনুকৃতি রচনাতেও রাজকৃষ্ণের কৃতিত্ব লক্ষণীয়। আসলে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দকে এখানে কৌতুকসৃষ্টির কাজে প্রয়োগ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে জয়দেব থেকে মধুসূদন পর্যন্ত বিভিন্ন কবির কাব্য থেকে শুধু শব্দ নয়, চরণ পর্যন্ত অবলীলায় গ্রহণ এবং তাকে প্রহসনের অঙ্গীভূত করা রীতিমতো প্রতিভার কাজ। ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষা থেকে শব্দ যেমন তিনি যথেচ্ছ নিয়েছেন, তেমনি প্রয়োজনে তিনি রচনা করেছেন সেই ভাষাতেই সংলাপ। কৌতুকসৃষ্টির এই বিশেষ প্রকরণটি পরবর্তীকালে বাঙালি প্রহসনকারেরা অনেকেই অনুকরণ করেছেন।

কলির প্রহ্লাদ (১৮৮৮)।। বীণা রঙ্গমঞ্চে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর রাজকৃষ্ণের এই ব্যঙ্গনাটকটির প্রথম অভিনয় হয়। তৎকালীন জমিদার শ্রেণী অভিনেত্রীর লোভে নাট্যসম্প্রদায়কে কিভাবে বিব্রত করতেন, মদ্যপানের কুফল, ইংরেজি শিক্ষার পরিণাম ইত্যাদি বিষয় এখানে বর্ণিত হয়েছে। সেইসঙ্গে সুরা, পতিতা রমণী এবং গণিকা সেবিত রঙ্গমঞ্চের বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব অভিযানের পথ প্রস্তুত করা এ ব্যঙ্গ নাটকটির উদ্দেশ্য।

এই 'ব্যঙ্গ-নাট্য'টির আখ্যাপত্রে 'কলির প্রহ্লাদ' নামকরণের তাৎপর্য একটি

কবিতার সাহায্যে রাজকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিয়েছেন—"হরিনামে মত্ত সত্যযুগের প্রহ্লাদ। / মদপানে মহামত্ত কলির প্রহ্লাদ॥"

রাজকৃষ্ণের 'কলির প্রহ্লাদ' আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই একটি কথা মনে আসে, তা হলো ব্যঙ্গনাটক এবং প্রহসনকে তিনি পৃথকরূপে চিহ্নিত করেছেন। কাহিনীর সূচনাতেই দু'য়ের পার্থক্য বোঝানো হয়েছে। তাঁর মতে, ব্যঙ্গনাটক "ঠিক প্রহসন নয়, তবে প্রহসনের সঙ্গে কতকটা মিল আছে। প্রহসনকে ইংরেজিতে Farce ( ফার্শ ) বলে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে হাস্যরসের সহিত স্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা ক'রে লোকসমাজকে নীতি-শিক্ষা দেওয়া।...ব্যঙ্গনাটকের অন্য নাম ব্যঙ্গহাস বা প্রহাসিকা। ব্যঙ্গনাটক, ব্যঙ্গহাস বা প্রহাসিকাকে ইংরেজিতে Burlesque ( বর্‌লেস্ক্ ) বলে। তার উদ্দেশ্য হচ্চে, অদ্ভুত ও হাস্যরসের সহিত স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ও পরিহাসাত্মক ঘটনার অবতারণা ক'রে লোকসমাজকে নীতি-শিক্ষা দেওয়া। ফল কথা—প্রহসন ও ব্যঙ্গনাটকের উদ্দেশ্য একই, কেবল ঘটনা ও রচনাপ্রণালী স্বতন্ত্র।" ( ১/১ )।

তবে 'কলির প্রহ্লাদ'কে 'ব্যঙ্গ-নাট্য' বলে লেখক উল্লেখ করলেও নাটকের থেকে যাত্রা বা গীতাভিনয়ের লক্ষণই এতে প্রাধান্য পেতে দেখা যায়। রাজা-হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে সম্বোধন করতে হলেই বলেন,—"আরে রে প্রহ্লাদ" —এ-যেন একেবারেই যাত্রার ঢঙ।

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিরণ্য-পুত্র প্রহ্লাদ, অসম্ভব সুরাসক্ত। সে বলে, "মদ মোর সঙ্গের দোসর।" ( ২/১ )। নিজে তো পান করেই, এমন কি নিজ জন্মদাত্রীকেও জোর করে মদ্যপান করায়। মা কয়াধু প্রথম সুরাপানের ফলে জ্বলনের কথা যখন জানান, পুত্র প্রহ্লাদ আরও এক পাত্র মাকে দিয়ে বলে, 'বিষস্য বিষমৌষধম্' এবং 'যে আগুনে পোড়ে হাত, তাতেই লাগাও তাত' ( ১/২ ) এরপর মা মদ্যপান করে বলেন—

"কি সুধা করালি পান আনন্দে মোহিল প্রাণ,
ব্রহ্মানন্দ খেলে মোর চিতে।" ( ১/২ )

ফলস্বরূপ উন্মত্ত অবস্থায় কয়াধু স্বামীকেও চিনতে পারেন না, বলেন—"Beware you Rascal! Don't you be braying like that. Be off be off you noisy Ass!" ( ১/২ ) মহিষীর মুখে প্রথম ইংরেজি বুলি শুনে রাজ-বিদূষক অণ্ডকুম্মাণ্ড বলে ওঠে—"পেটে না ঢুকিলে মদ, / এহেন ইংরিজি গদ নাহি বাহিরায়।" ( ১/২ ) এবং যখন জানতে পারে প্রহ্লাদ কয়াধুকে মদ্যপান করিয়েছে,—তখন অণ্ড মন্তব্য করে,—"বাপমার আবদারের চোটেই ছেলে মাটী হয়। ছেলেবেলায় ছেলেকে লেখাপড়া না শেখালে, বাপ মাকে এই রকম জ্বালাতন হ'তে হয়। বিশেষতঃ বড়মানুষের ঘরে আপনার পেজাদের মতন আহ্লাদে এঁড়েই

চের। আমরা গরীবগুর্ব্বো, ছেলেপিলেকে অত কুঁচকিকণ্ঠা নাই দিই না বাপু!" ( ১/২ )

প্রহ্লাদের এই অধোগতি-রোধ এবং বিদ্যাভ্যাস করানোর জন্য হিরণ্যকশিপু তাকে 'ষণ্ডামার্কের জুবিলি বোর্ডিং স্কুল'-এ পাঠান। কিন্তু প্রহ্লাদ সেখানেও ছাত্রদের নিজের বশে আনে, সুরার স্বাদে মাতিয়ে তোলে। প্রথমে অবশ্য তারা আপত্তি জানিয়ে বলে—"মদ্যমপেয়ম দেয়মপ্য-গ্রাহ্যম্।" (১/৪) অর্থাৎ মদ্য পানের অযোগ্য, দানের অযোগ্য, গ্রহণেরও অযোগ্য। কিন্তু তার উত্তরে প্রহ্লাদ যখন বলে—

"A bottle is a very good thing,
With a good deal of good wine in it." ( ১/৪ )

তখন তাদের আর কোন দ্বিমত থাকে না, তারাও প্রহ্লাদের সমগোত্রীয় হয়ে ওঠে।

বোর্ডিং-এর শিক্ষক ষণ্ডর স্ত্রীকে 'গুরুমা' বলে ডেকে মুক্তোর মালা ঘুষ দিয়ে ন'বোতল মদ আদায় করে প্রহ্লাদ। গুরুমাকেও মদ্যপান করতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন,—"ছি ছি বাপ, এ কি কথা কও, যাদুমনি? / কেমনে খাইব মদ হইয়ে ব্রাহ্মণী? / শাস্ত্রে বচন আছে, / গোরক্ত হিন্দুর কাছে / ঐ ব্রাণ্ডী পানি;" ( ১/৬ )। কিন্তু হীরের আংটির লোভে তিনিও মদিরাপান করেন। ষণ্ড এ-দৃশ্য দেখে প্রথমে ক্রুদ্ধ হলেও পরে তিনিও তাদের সঙ্গী হন। যমজ ভাই অমর্ক এ-ঘটনায় বিস্মিত হলেও দাদাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করে তাঁর নির্দেশে তিনিও মদ্যপান করেন।

সুরাসক্তির কারণ হিসেবে প্রহ্লাদ জানায়—"শত শত খোলভাটি ইংরেজ কৃপায় / ভারতের গলিতে গলিতে বিরাজিত। / দু'টাকা পাইবে বলি ইংরেজ কোম্পানি / ভারতে মদের সিন্ধু বহাইল জোরে।" ( ২/১ ) এখানে সে কালের সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে। ব্রিটিশ আমলে এ-দেশে সুরার কিরকম অনায়াস ব্যবসা গড়ে উঠেছিল, তা অনুমান করতে পারা যায়। বর্তমানেও এ-ছবি আমাদের কাছে অপরিচিত নয়, শুধু তফাৎ যুগের—তখন দেশ ছিল পরাধীন, এখন স্বাধীন। প্রহ্লাদ জানায় যে, ইংরেজের হিত-সাধনের নিমিত্ত সবাইকে সে এ-নেশা ধরায়।

প্রহ্লাদ যেমন সুরাসক্ত, তার পিতা রাজা-হিরণ্যকশিপু মদ স্পর্শ না করলেও তেমনি নারীআসক্ত। তাঁর মতে থিয়েটারের অভিনেত্রীরা 'টোপ'-স্বরূপ। তারা এতই আকর্ষণীয় যে, "…হাতে টাকা না থাকলে ঘটী বাটী বাঁধা দিয়ে অন্ততঃ একটা আধুলীর যোগাড় ক'রে তোমাকে ঐ মনোহর টোপ গিলতে হবে।" ( ২/১ ) প্রহ্লাদের এ-ব্যাপারে ঘোর আপত্তি। সে বলে,—"তুমি যদি ছাড় বাবা বেশ্যা কেলেঙ্কারী, তা হ'লে আমিও মদ ছাড়িবারে পারি।" ( ২/১ ) হিরণ্যকশিপু তাতে

সম্মত হন না, বরং ছেলেকে মদ্যপান করতে নিষেধ করেন। প্রহ্লাদ জানায় প্রকৃতপক্ষে সে পিতারই অনুসারী।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।" (২/১)

বলে,—'মাদী আর মদে ভেদ নাই। যে মাদী সেই মদ—যে মদ সেই মাদী।" (২/১) বক্তব্যের সমর্থনে অণ্ড যা বলে তা বহিরঙ্গে লঘু হাস্যরসের সৃষ্টি করলেও, এর অন্তর্নিহিত অর্থটি যে অত্যন্ত গূঢ় তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অণ্ড বলে, "যা আকার ঈকারের সূক্ষ্ম ভেদাভেদ মাত্র। তা আসলে কিছু তফাৎ নেই। এই বুঝুন না কেন—আকার ঈকার নেই বলে 'মদ' তরল; আকার ঈকার আছে বোলে 'মাদী' অতরল, আসলে কিন্তু উভয়েই গরল।" (২/১)

নাটকে অভিনেত্রীদের ন্যায্য অর্থপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নেওয়ার কুপ্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় 'ওলকচু' থিয়েটারের ম্যানেজারের কার্যকলাপে। অশিক্ষিত, অভাবী মেয়েদের দিয়ে এ ধরনের ব্যবসা আজও চলতে দেখা যায়। সে কালে অধিকাংশ রঙ্গমঞ্চে মহিলা-চরিত্র পুরুষদের দ্বারা অভিনীত হতো। মহিলা দ্বারা অভিনীত নাটক সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ রায়ের এক ধরনের সংস্কার ছিল। তিনি নিজ রঙ্গমঞ্চে বহুকাল নারীদের না নিয়ে অভিনয় কার্য সম্পাদন করেছেন। পরবর্তীকালে ঋণগ্রস্ত হলে বাধ্য হয়ে তাঁকে রঙ্গমঞ্চে মহিলা অভিনেত্রী গ্রহণ করতে হয়। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে বিদূষক অণ্ডের জবানীতে—"আমার বোধ হয়, বেটা-মানুষওয়ালা থিয়েটারই খাসা; কারণ, ভগবদ্‌ভক্তিমূলক নাটকাদির অভিনয় দেখবার সময় মনটা চঞ্চল হয় না—বাপ-বেটাতে, বাপ-মেয়েতে, ভাই-ভগ্নীতে, পতি-পত্নীতে এক সঙ্গে বোসে মেয়ে-মানুষওয়ালা থিয়েটার দেক্তে লজ্জা পায়।" কিন্তু দর্শক সুরুচিসম্পন্ন না হওয়ায়—"…ফিমেলী থিয়েটারে জায়গা হয় না, আর মেলী থিয়েটারে জায়গা যায় না।" (১/৩)

প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখ করা যায়। তা হলো, 'ওলকচু' থিয়েটার হিরণ্য-কশিপুকে 'হনুমানের বস্ত্রহরণ' নামে যে পালা অভিনয়ের কথা জানিয়েছে—তা তৎকালীন লেখক বেচুলাল বেনিয়া রচিত একটি প্রহসন, রচনাকাল ১৮৮৫

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের মদ্যপান রোধ করতে না পেরে এবং মহিষী কয়াধুকে অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত করার অপরাধে পুত্রের প্রাণনাশ করার হুকুম দিলেন। বধ করতে সফল না হয়ে ঘাতক দৈত্য বলেছে—"সত্যি যুগের পেল্লাদ হরি বোলে তোরে গেছলো, কলির পেল্লাদ মদ গিলে তোরে যায় যে!" (২/২)। কিন্তু না, শেষাবধি সারজন্ সাহেব, দারোগা ও পাহারাওয়ালা-

গণের অকস্মাৎ আবির্ভাবে সবাই ধরা পড়ল এবং তখন প্রহ্লাদ, অণ্ড, হিরণ্যকশিপু সকলেই খোদোক্তি করেছে।

"প্রহ্লাদ। হা, আমি না রাজপুত্র! ছি ছি, সে কথা ভাবতেও এখন লজ্জায় মুখ নত হয়। আমি মহাপাপী—আমি নরকের বিষ্ঠা—আমার মন সেই নরক-বিষ্ঠার কীট! হা, আমি মাননাশক, প্রাণনাশক, সর্ব্বনাশক ও সর্ব্বগ্রাসক মদের বশীভূত হয়ে কি পাপকার্য্যই না করেছি। পাপের ফল অতিশয় ভয়ঙ্কর—যার-পর-নাই যন্ত্রণাদায়ক। আজ পূর্ণরূপে তা ফললো। কলিকাল বটে—আমিও কলির প্রহ্লাদ বটে, কিন্তু আজিও ধর্ম্মরূপী হরি আছেন।

"অণ্ড॥ আমার যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল হলো। আমি যেমন নিমকহারাম-প্রভুদ্রোহী-কৃতঘ্ন-পিশাচ, হাতে হাতে তার শাস্তি পেলেম। কলিকাল বটে, কিন্তু আজিও—ধর্ম্মরূপী হরি আছেন।

"হিরণ্য॥ হা, আমি রাজাধিরাজ মহারাজ হয়ে সামান্য প্রহরীর হস্তে প্রহারিত হচ্চি! তা তো হবই, পশুস্বভাব কামুক লম্পট আবার কোন্‌কালে দণ্ডভোগ না করে? কলিকাল বটে, কিন্তু আজিও ধর্ম্মরূপী হরি আছেন।" (২/২)

দারোগার জবানীতে রাজকৃষ্ণ একটি আপ্ত বাক্য উচ্চারণ করিয়েছেন—"দুখ্‌মে সব্‌ কোই হরি ভজে / সুখ্‌মে ন ভজে কোই। / সুখ্‌মে যো হরি ভজে, / তো দুখ্‌ কাঁহাসে হোই?" (২/২)

দীর্ঘ ব্যঙ্গ-নাটকে হাসির উপাদান নানারকম আছে। যেমন যণ্ডপত্নী যখন যণ্ডমাষ্টারের খেতাবের ফিরিস্তি দিয়ে বলে—"বিশ্বেনদ-বিশ্বেগোষ্পদ-বিশ্বেচতুষ্পদ-বিশ্বেবিপদ—A. S. S.,—H. O. G.,—M. O. N. K. Y.,—F. O. O.L.,—D.O.G.,—Honorary Member of the Humbug Society, —Member of the Swindlers' Association,—Fellow of the Tribhanga Theatre's Female Party, তা ছাড়া, ভারতরাহু-ভারত-দুর্ভিক্ষ-ভারত-ভুজঙ্গ-ইংলণ্ডযণ্ড বা John Bull—বোলতা হুল্‌-স্বার্থমূল নাকের দুল —Cook-rooms ঝুল প্রভৃতি গণ্ডা গণ্ডা খেতাব।" (১/৫) তখন তার মর্মার্থ অনুধাবন করে হাসির লহরী ওঠে পাঠক-শ্রোতাদের মনে। হিরণ্যকশিপু যখন অভিনেত্রীদের দেখিয়ে থিয়েটারের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেন "এরা কি আসামী?" ম্যানেজার ভীত হয়। হিরণ্যকশিপু জানান—"ফৌজদারী আসামী নয়; আসাম দেশের বাসিন্দাকে আসামী বলে। ..." (২/১)—তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে 'অসমীয়া'-দের 'আসামী' বলে হাসির উদ্রেক করেছেন। রানী কয়াধুর মৃত্যু সংবাদ জানতে পেরে হিরণ্যকশিপু যখন বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠেন—"এ ভারি অন্যায় তাঁর। / আমারে না বোলে কোয়ে / হঠাৎ এরূপে মরা উচিত কি তাঁর?" (২/১) তখন করুণরসকে ছাপিয়ে হাস্যরসের ধারা প্রবাহিত

হয়। থিয়েটারের দলের নাম 'ওলকচু' শুনলে কার না হাসি পায়? অথবা 'দম্' শব্দটির বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ দেখিয়ে প্রহ্লাদ যখন বলে, "সবি দম্, খোড়কে কাঠি থেকে হিমালয় পর্ব্বতের দম্।" তখন দমকে দমকে হাসিই আসে। যদিও এ-হাস্যরস অত্যন্ত নিম্নমানের এবং দীর্ঘ সময় ধরে এভাবে হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা অত্যন্ত ক্লান্তিকর।

নাটকে অধিকাংশ চরিত্রকেই লেখক ইংরেজি বলিয়েছেন—যেমন প্রহ্লাদ, অণ্ড, কয়াধূ, যণ্ড-পত্নী, ছাত্ররা, সারজন। বিশেষত মদ্যপানের ফলে যে স্ত্রীলোক ইংরেজি ভাষা জানে না, সেও ইংরেজি বলেছে—এটা মদের গুণ বলেই অণ্ড-কুষ্মাণ্ড জানিয়েছে। ভাষা অত্যন্ত নাটকীয়, বহুস্থানে সংলাপে পদ্যের আশ্রয় নিয়েছেন রাজকৃষ্ণ। রাজকৃষ্ণ প্রকৃতিতে যে কবি ছিলেন, সে কথা আমাদের স্মরণে এসে যায়। তবে ভাষা কোথাও কোথাও শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে গিয়েছে, কুরুচির পরিচায়ক হয়েছে।

নাটকটিতে ছ'টি বাংলা এবং একটি ইংরেজি গানের ব্যবহার হয়েছে। এছাড়া বহু ইংরেজি ও বাংলা কবিতার উপস্থিতি লক্ষণীয়।

কাণাকড়ি ( ১৮৮৪ )॥ রাজকৃষ্ণ রায় এটিকে 'বিদ্রূপহাসক' বলেছেন। 'নীলাম'-এর রূপকে সমাজস্থ বিভিন্ন বৃত্তির ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাগত মূল্যায়ণ করা হয়েছে। বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে তার উপস্থাপন করা হয়েছে। নীলামের 'চিজ'—বিভিন্ন। তার মধ্যে আছে এটর্নি, ডাক্তার, সংবাদপত্রের সম্পাদক, অফিসের হেডবাবু এবং সমালোচক। সমাজে তাদের স্থান ভিন্ন—মূল্য ভিন্ন,—তাই এটর্নি আট কড়া কাণাকড়িতে, ডাক্তার তিন কড়া কাণাকড়িতে, সম্পাদক একটা কাণাকড়িতে, হেডবাবু দু'কড়া কাণাকড়িতে এবং সমালোচক আধখানা কাণা-কড়িতে বিক্রীত হয়। প্রহসনটিতে লেখক এদের প্রতি বিদ্রূপবাণ হেনেছেন। অযোগ্য ব্যক্তি হয়েও যারা সমাজে বিশিষ্ট স্থান লাভ করে থাকে—তাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন। পাঁচটি চরিত্রের মুখ দিয়ে এমন কিছু কথা বলিয়েছেন, যে সত্যভাষণ আবহমান কাল ধরে অনুধাবন করা যায়।

সমাজে একশ্রেণীর লোক চিরকাল সুবিধা ভোগ করে আসছে, শোষণ করছে অপরকে,—তাদের স্বরূপ চিত্রিত করেছেন এই প্রহসনে। চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে, স্পষ্টভাষণে—তাদের জবানীতেই। 'এটর্ণী' শব্দটি নিয়ে কিছু কৌতুকরসের সঞ্চার করেছেন। এটর্নিকে বিশ্লেষণ করে করেছেন 'অতরণী'। "তরণীর বিপরীত অতরণী। তরণী হচ্ছে নৌকো। মানুষকে নদ নদী হ্রদ তরায় অর্থাৎ এপার থেকে ও পারে নিয়ে যায় ব'লে নৌকোকে তরণী বলে।...আমরা

মক্কেলকে অত্তরাই অর্থাৎ ডোবাই ব'লে লোকে আমাদের অত্তরণী বা এটর্ণী বলে।" এটর্নির মুখ দিয়ে লেখক আরও জানিয়েছেন—"এটর্ণী খেল্‌লে ফিকির, মক্কেলের পো অমনি ফকির।"

ডাক্তার তার নিজের পেশার প্রকৃত কৌশলটা জানায় এইভাবে—"যে দিন আমি সর্ব্বপ্রথম Anatomy অর্থাৎ অস্থিবিদ্যা শেখবার জন্য মড়ার হাড়গোড় ঘাঁটতে আরম্ভ করি, সেই দিন থেকেই পেসেন্টের অর্থাৎ রোগীর হাড়ে দূব্বো গজাবার ফিকিরটে শিখে নি। তারপর যখন ডিসেক্‌সন্‌ অর্থাৎ শবচ্ছেদ বা মড়াকাটা বিদ্যেটা হজম কোত্তে লাগলুম, তখনই রুগী ও রুগীর ফ্যামিলির টুঁটী কাটাটাও বিধিমত প্রকারে অভ্যাস ক'রে নিলুম।" হরিবল্লভ কেরানী এরপর মন্তব্য করে, "মক্কেলের যম মোক্তার, রুগীর যম ডাক্তার।"

ডাক্তারের পর নীলামের 'চীজ' হিসেবে এল এডিটর। 'Editor'—কে Aid-eater বলে ব্যাখ্যা করে যেভাবে পরিহাস করেছেন, তা লক্ষণীয়। শব্দগত অর্থ হচ্ছে সাহায্য ভক্ষক, ব্যবহারিক অর্থ তাঁর মতে 'জুয়াচোর'। সম্পাদকও সংবাদপত্রকে "আমার মহাদীর্ঘ লাঙ্গুল স্বরূপ" বলেছেন। বলেছেন "আমি এই ল্যাজের গর্জ্জনে অর্থাৎ খবরের কাগজের তর্জ্জনে ত্রিভুবন আবাহন বিসর্জন কত্তে লাগলেম। কৌশল ক'রে মাথা-মুণ্ডু ছাই-ভস্ম যা লিখি, তাতেই পোয়া বারো! আজ যা লিখি, কাল তা নিজেই কাটি—অর্থাৎ থুথু ফেলে আবার চাটি!" অর্থাৎ সম্পাদকের চরিত্রবৈশিষ্ট্য নির্দেশিত করা যায় এইভাবে, সম্পাদক ব্যক্তিত্বহীন, অস্থিরচিত্ত, সুবিধাবাদী, নীতিহীন।

রাজকৃষ্ণ 'আফিসের হেডবাবু'র চরিত্রটি চিত্রিত করেন অত্যন্ত সুনিপুণ'ভাবে। এ-ক্ষেত্রে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় পাই। মনে হয় অনাগত ভবিষ্যতের সমাজ-চিত্র যেন সুদূর অতীতেই তাঁর অভিজ্ঞতায় ছিল। সমাজে একশ্রেণীর লোক আছে যারা অসৎ, সুযোগসন্ধানী, লোভী—অন্যায় করে এবং অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়—বড়বাবু তাদেরই প্রতীকী চরিত্র। বর্তমানকালের মতো তৎকালেও 'ঘুষ' ব্যাপারটার প্রচলন ছিল। "আগে খাইবার পাঁশ না দিলে, গরীব কেরানী বেচারাদের হেডবাবুরূপ খাইবার পাশ পার হওয়া নেহাৎ অসাধ্য।" বড়বাবু নিজের চরিত্র নিরূপণ করেছেন এইভাবে—"...সাহেবের জুতোয় আমি, আমার জুতোয় কেরাণী। আমি নিতান্ত পরোপকারী, তাই প্রকৃত কার্য্যদক্ষ গরীবদের চাক্‌রী না দিয়ে, কেবল আমার শালা-সম্বন্ধী, শালা-পো, শালী-পো, খোসামুদে মোসাহেব, ভগ্নীপতি, এক গ্লাসের ইয়ারদের অনুপযুক্ত জেনেও উপযুক্ত বোলে কোলে টানি—এক পয়সার যোগ্য না হলেও পঞ্চাশ ষাট টাকার পোষ্ট দি।"

নীলামের জন্য সর্বশেষ 'লাট' হলো—'ক্রিটিক্‌বাবু'। তিনি নিজেই নিজের সমালোচনা করে বলেছেন—"আমরা হচ্ছি সমালোচক—দ্বিতীয় বিধাতা-স্বরূপ।"

প্রহসনের অন্যতম চরিত্র কেরানী হরিবল্লভ জানিয়েছেন, “এঁদের বিত্তেশূন্য ইয়ারবন্ধুরা ছাইভস্ম মাথামুণ্ডু যা লিখুক, এঁরা তাদের স্বর্গে তুলে দেন। কেউ কিছু ঘুষ-ঘাস দিলে তাকেও মাথায় ক'রে ঢাক বাজান। কিন্তু 'একগ্লাসের ইয়ার' না হ'লে, বা 'যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা' গোছের গ্রন্থকারেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, ভাল ভাল পুস্তকাদি লিখলে এঁরা কঞ্চি-কলমের এক খোঁচায় সাত কুঁচি করে জবাই করেন।”

লেখকের প্রখর দূরদৃষ্টি লক্ষ্য করা যায় প্রহসনের শেষাংশে। যখন নীলাম সমাপ্ত, তখন 'জগু জেনা' নামে এক কৃষকের আগমন হয়। সে জানায় কিছু উৎকোচ দিয়েও সে বিক্রীত লাটগুলি নিতে চায়। এই বিপথে ঘুষ দিয়ে কার্যোদ্ধার—সমাজে চিরকাল ধরে একশ্রেণীর লোক করে আসছে। বর্তমান কালেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অথচ উক্ত 'লাট'-গুলিকে “পচা ধসা ঘষা অসার অপদার্থ নিরেট মূর্খ জানোয়ার” বলে বিশেষিত করা হয়েছে।

আমাদের সমাজে যে শ্রেণীবৈষম্য আছে, তা দূর হয়ে যাবে। অনাগত ভবিষ্যতে সমাজ যে উচ্চবর্ণের মানুষের অধিগত থাকবে না—শূদ্রশাসিত সমাজের প্রবর্তন হবে—তারাই সমাজে পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করবে—তার আভাস প্রহসনকার অন্তিমে দিয়েছেন। এ-প্রহসনে রাজকৃষ্ণের সুগভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় মেলে।

এ-প্রহসনে সংগীতের কোন স্থান নেই। 'কাণাকড়ি'-তে বিভিন্ন ভাষাভাষী-লোক একত্রিত হয়েছে। তাদের বাক্‌ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজকৃষ্ণের পারদর্শিতা বেশ প্রশংসনীয়। পূর্ব-বাংলা, পশ্চিম-বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, ইংরেজি ভাষার সহাবস্থানে নাট্যকার যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন।

প্রহসনটির নানা চরিত্র হাস্যরসের সঞ্চার করেছে। সে হাসির মধ্য দিয়ে কোথাও বিদ্রূপের জ্বালা নির্মমভাবে প্রকাশিত, কোথাও বা বাগভঙ্গির মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গোক্তি উচ্চারিত। উইট-এর প্রাধান্য থাকলেও, স্যাটায়ার বা স্থানে স্থানে আয়রনি-র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

খোকাবাবু (১৮৯০)।। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর বীণা রঙ্গমঞ্চে 'খোকাবাবু'র প্রথম অভিনয় হয়। প্রহসনটিতে দয়ালবাবু নামে এক স্ত্রৈণ ধনীব্যক্তির লাঞ্ছনা চিত্রিত হয়েছে। সেইসঙ্গে তার সংসারের চিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে। পারিবারিক শাসনকে দৃঢ় করতে হলে পুরুষের পৌরুষ, তথা ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়, স্ত্রী-সর্বস্বতা পারিবারিক শৃঙ্খলাকে শিথিল করে। এর ফলে সংসার পালন বা সন্তান-শাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এতে শুধু সাংসারিক ক্ষতি তাই নয়, সামাজিক ক্ষতিও। কারণ সমাজ গড়ে ওঠে সংসারগুলির সমবায়ে।

অধৈর্য, খামখেয়ালী, বড়লোকের আদুরে ছেলে খোকাবাবুর অন্যায় আবদার, উৎপাত এবং তার প্রতি পিতামাতার অন্ধবাৎসল্য, স্নেহানুরাগ—এ-প্রহসনের বিষয়বস্তু। ছেলেকে প্রশ্রয় দিয়ে অধঃপাতের পথে যেতে সাহায্য করা, তার অসম্ভব অনুরোধ রক্ষা করা—দয়ালবাবুদের নিত্যদিনের স্বভাবধর্মে পর্যবসিত হয়েছিল। এমন কি খোকাবাবুর অনুরোধে মনিব দয়ালবাবু কাঁধের ওপর তুলতে বাধ্য হন মোসাহেব মনসারামকে। দয়াল তখন স্বগতোক্তি করেন, "যার কপালে যা, ভোগ করে সে তা।" (প্রথম দৃশ্য)। স্ত্রী-ভয়ে শঙ্কিত দয়াল সর্বদা তটস্থ। ছেলের আবদার রাখতে স্ত্রী তাঁকে পৌষের রাত্রে তাঁবু আনতে হুকুম করে। আদেশ পালনে দেরি করলে দয়ালবাবুকে গিন্নি ভয় দেখিয়ে বলে—"বটে, আমার হুকুম অমান্যি! এখনি যাবে তো যাও, নৈলে সারা রাত ছাদের হিমে দাঁড় করিয়ে রাখবো।" (দ্বিতীয় দৃশ্য)। চঞ্চল প্রকৃতির, বিলাসিনী, শহুরে স্ত্রী বিবিয়ানা পছন্দ করেন। তিনি তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব নিয়ে থাকেন, স্ত্রৈণ স্বামী তার অনুগামী হন, আজ্ঞাবহন করেন।

বুল সাহেব বাগানে বড় এক তাঁবু খাটিয়ে যান দয়ালবাবুর নির্দেশে—দক্ষিণা মাত্র পঞ্চাশ টাকা। বাগানের এক মালী তাই দেখে অন্য মালীকে বলে, "বড় মানুষের খেয়ালই ওই। আমরা এক মাস খাটি, পাঁচ টাকা মাইনে পাই, আর তাঁবুর বেলা একদম পঞ্চাশ টাকা। সাহেব না হোলে বাঙালী ঠকে কই? বাঙালী যেমন বুনো ওল, সাহেব তেম্নি বাঘা তেঁতুল।" (তৃতীয় দৃশ্য)। ধনী-দরিদ্রের এই অর্থ নৈতিক বৈষম্য চিরকাল আমাদের সমাজে লক্ষ্য করা যায়।

খোকাবাবু অসম্ভব অনুরোধ করে—লাফ মেরে সূর্য ধরে এনে তাকে পুকুরে ডুবিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা নামাতে বলে। তার উৎপাতে মোসাহেব মনসারাম নাস্তানাবুদ। রেগে গিয়ে মনে মনে বলে—"আমার এমন ছেলে হ'লে কানে তালপটকা, নাকে ছুঁচোবাজী গুঁজে দিয়ে মেরে ফেলতুম। বড়মানুষ এক অদ্ভুত জীব!" (চতুর্থ দৃশ্য)।

প্রহসন-শেষে অবস্থা চরমে ওঠে। খোকাবাবুর আবদারে গিন্নির আদেশে দয়ালবাবুকে হনুমান সেজে পুত্রকে খুশি করতে হয়। গিন্নিও কর্তার কোমরে দড়ি বেঁধে নাচাতে নাচাতে বলে,—"নাচ রে আমার হনুমান্, খেতে দেবো মর্ত্তমান্!" নৃত্যরত দয়ালবাবু বলেন,—"...আমার মত যারা মেগের বশ, ভাগ্যে তাদের এম্নি যশ!" (চতুর্থ দৃশ্য)।

'খোকাবাবু' প্রহসনটির কাহিনী পূর্বে লিখিত 'আদুরে ছেলে' গল্পের (১৮৮৫) সঙ্গে অভিন্ন। চরিত্রগুলিও এক।

বেলুনে বাঙালী বিবি ( ১৮৯০ )।। প্রহসনটিকে 'খোকাবাবু' প্রহসনের পরিশিষ্ট বলা যেতে পারে। এ-প্রহসনটিতেও তৎকালীন সমাজের ধনী গৃহের চিত্র পাই। ধনবান দয়ালবাবু মেরুদণ্ডহীন, ব্যক্তিত্বশূন্য, স্ত্রৈণ—স্ত্রীর ভয়ে সদা ত্রস্ত, তার পরিচালনাধীন গিন্নি ইংরেজি পড়া, স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবক্তা। দয়ালবাবুর দুই মোসাহেব ফেলারাম এবং মনসারামের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই চিরন্তন পদলেহনকারীদের, যারা বড়লোকের তোষামোদ করে দিন কাটায়। কিন্তু তাদের মনেরও যে ভাবান্তর ঘটে তা স্পষ্ট হয় ফেলারামের স্বগতোক্তিতে—"...কখন কুকুর হচ্চি, কখন মেথর হচ্চি, কখন ধাঙ্গড় হচ্চি। এইবার যদি মরি, তবে যমের কাছে আর্জ্জী কোরবো, যেন আর-জন্মে আর খোসামুদে মোসাহের হয়ে জন্মাতে না হয়।" ( ১/১ )

সে-যুগের একটি ঘটনার স্মৃতিও এ-প্রহসনের সঙ্গে জড়িত। প্রহসনটির প্রথমে একটি বাউল গান আছে—তার শেষ ক'টি চরণে ঘটনাটি বিধৃত—"...বেলুনবাজ সাহেব ভায়া, / বেলুনে তুলবে কায়া, / উড়বে খুব লাগিয়ে হাওয়া, / লুটবে টাকা পাই ॥" ( ১/১ ) বলাবাহুল্য, কলকাতার টিভলি গার্ডেনে পার্সিভাল স্পেনসার-এর বেলুনে চড়ে আকাশে ওড়ার কথাই এখানে আভাসিত হয়েছে। এই গান শুনেই দয়াল-তনয় খোকাবাবু বেলুনে চড়ার বায়না ধরে—যাকে কেন্দ্র করে প্রহসনের ঘটনার বিস্তার। ধনীর দুলাল অত্যধিক আদর এবং প্রশ্রয়ে কিভাবে অধঃপাতে যায়, 'আদরে বাঁদর'-রূপে পর্যবসিত হয়, তা খোকাবাবুর চরিত্রচিত্রণ থেকেই উপলব্ধি করা যায়। তার আবদার রক্ষার্থে বাবাকে হনুমান সাজতে হয়, মাকে বেলুনে চড়ে আকাশে উঠতে হয়। প্রসঙ্গত পার্সিভাল সাহেবের বেলুনে ওড়া-প্রসঙ্গে সে কালের একজন প্রবন্ধকারের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়—"The tenth attempt at ballooning in Calcutta was the one made by Mr. Percival Spencer from the Ballygunge Race Course but which unfortunately ended in failure. His next attempt, was more successful for he ascended in a balloon from the Calcutta Race Course and rose to a great height whence he was blown away by a strong current of wind to the Sunderbans where he alighted at a place named Hastalipad teeming with tigers and muggers.···The third from the stables of Tramway Co. at Cossipur···Mr. Spencer's fourth attempt will be ever memorable for, on this occasion a native of India—a Bengale gentleman named Babu Ramchandra Chatterji for the firsttime in the annals of India,

ascended with Mr. Spencer in a balloon from the grounds of the Calcutta Gas Works in Narikeldanga."১৮৩

বর্তমান প্রহসনে খোকাবাবুকে বেলুনে-চড়া সম্বন্ধে জানাতে গিয়ে দঁয়াল-গিন্নি এই রামচন্দ্র চ্যাটাৰ্জ্জীর কথা বলেছেন। তাঁর মুখ দিয়ে সে-সময়কার সমাজের বাঙালি-মানসিকতা ব্যক্ত করা হয়েছে। বাঙালির কাজে বাঙালি উৎসাহ দেয় না, সাহেবদের কাজে প্রেরণা দান করে—"…বাঙালী পুরুষ বেলুনে উঠলে বাঙালীরে তাকে উৎসাহ দেয় না, বরং নিরুৎসাহ কর্‌বার জন্যে ঠাট্টা-বটকিরে করে। তার সাক্ষী বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বেচারী প্রাণের মায়া ভুলে, আত্মীয়জনের মায়া ভুলে, বাঙালী জাতকে উচুঁতে তোল্‌বার জন্যে বেলুনে চোড়ে উচুঁতে উঠলো, কিন্তু কটা বাঙালী বাহবা দিলে, দুদশ টাকা দিয়ে সাহায্য কোল্লে? আর ও দিকে স্পেন্‌সার সাহেব এক পলকে বাঙালীর কাছাবাঁধা লুকুনো টাকাও টেনেটুনে লুটে নিয়ে চল্লো। বাহা রে বাঙালী! সাহেবের ফাঁকির কাঙালী!"

গিন্নির কথার মধ্যে কোন কোন স্থানে শব্দ ব্যবহার কানে লাগে। দয়ালবাবুকে যখন বলেন—"…শীগ্‌গির ছেলেকে কোলে তোলো, নৈলে দুরবীণ ছুড়ে তোমারো মাথা কাণা কোরে দেবো।" (১/২) তখন 'মাথা কাণা' আমাদের চমক লাগায়, —কারণ আমাদের অভিজ্ঞতায় 'চোখ কাণা' হওয়ার কথাই জানা আছে।

প্রহসন শেষে আমরা জানতে পারি, আদুরে আবদারে ছেলে খোকাবাবুর খেয়ালে তার মা-কে বেলুনে চড়ে আকাশে উঠতে হয়। তিনি হন 'বেলুনে বাঙালী বিবি'। এ-প্রহসনে অমৃতলাল বসুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্যাটায়ার-এর নির্মমতা যেমন আছে, তেমনি হিউমার-এর অশ্রু-মিশ্রিত হাস্যরসের ধারাও প্রবাহিত হতে দেখি এ-প্রহসনে।

ডাক্তারবাবু (১৮৯০)॥ বীণা রঙ্গমঞ্চে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি 'ডাক্তারবাবু' প্রহসনের প্রথম অভিনয় হয়। এ-প্রহসনে চরিত্রহীন ডাক্তারের লাঞ্ছনা, তার দুর্নীতিমূলক আয়নীতি এবং পরিণামে সততার জয় বর্ণিত হয়েছে।

কালব্যাধির মত সমাজে কিছু দুশ্চরিত্র লোক থাকে। তারা শিক্ষিত, ভদ্রবেশী —কিন্তু সময় বিশেষে তাদের সেই মুখোস খুলে গিয়ে কলঙ্কিত চরিত্রটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ-প্রহসনে জনৈক চিকিৎসক জয় ডাক্তার সেরকমই এক চরিত্রহীন, লম্পট। জগৎপুরের সৎ দোকানি গৌরের স্ত্রী নিস্তারিণীর প্রতি রূপমোহবশত সে অসুস্থ গৌরকে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় ভেজাল ওষুধ খাইয়ে। মরণোন্মুখ গৌরকে দেখে সে মনে মনে বলে—"ধন্য আমার ডাক্তারী শিক্ষা! ধন্য ইংরাজের মেডিকেল কলেজ স্থাপন! ধন্য আমার এল, এম্‌, এস্‌, ডিগ্রিভূষণ! সাবাস মেটিরিয়া মেডিকা! সাবাস্ সারজারি! সাবাস্ বোটানি! সাবাস

এলোপাথিক্ ট্রীট্‌মেণ্ট ! সাবাস্ ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট বক্‌স ! ততোহধিক্ সাবাস্ ভুয়ো মাল ভরা শিশির কোলে জল পোরা, ডাক্তারকুলের জল-জীয়ন্ত ফাঁদ ডিসপেন্সারি।" (১/৩) সেই দুঃসময়ে স্বামীকাতরা ক্রন্দনরতা নিস্তারিণীকে সে বলে—"তুমি বড় সুন্দরী, আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তুমি যদি আমাকে তার শতাংশের একাংশও ভালবাস, তা হ'লে আমি আকাশে চাঁদ হাত বাড়িয়ে পাই।" (১/৩)—এত বড় পাষণ্ড সে। এই কুপ্রস্তাব শুনে সতী নিস্তারিণী সীতার মতো প্রার্থনা করে, "...পিরৃথিবি দোফাঁক হও, আমি তোমার কোলে সুকুই।" (১/৩) এবং শেষে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

গৌরের ভাই নিতাই শ্যামপুরে থাকে—অত্যন্ত ধার্মিক এবং ব্যবসায়ে পোক্ত। বাবাজিকে, নেড়ানেড়িকে এক আনা পর্যন্ত দেয়, অথচ আধ পয়সার নুনও ধারে ছাড়ে না। গৌরের অসুখের খবর পেয়ে সে কবিরাজকে সঙ্গে নিয়ে দাদার বাড়ি হাজির হয়। সেখানে ভীতা বৌদির কাছে সব কথা শোনে। জয় ডাক্তার তার হাতে ধরা পড়ে—সমুচিত শাস্তি পায়। গৌরকে ভাল ওষুধে সুস্থ করে। নাকে খৎ দেয়। নিস্তারিণীকে মা বলে ডাকতে বাধ্য হয়। শেষে তার জবানীতে লেখক সাবধানবাণীটি বলিয়েছেন—"আজ আমার যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল! সতীর অপমান যারা করে, তাদের ভাগ্যে এইরূপ পদাঘাত! আমার মতন যারা, তারা সাবধান হও।" (১/৩)

এ-প্রহসনে ডাক্তারিবিদ্যার অপপ্রয়োগের কুফল বর্ণনা করা হয়েছে। সেই-সঙ্গে এক কবিরাজ ভজহরি ধন্বন্তরির চরিত্রও চিত্রিত হয়েছে সুনিপুণভাবে। ভজহরি কবিরাজ অর্থের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। আটক্রোশ দূরে রোগী দেখতে গেলে সে পনেরো টাকা চায়। তবে সুচিকিৎসক হিসেবে গর্বিত। ভজহরি চিকিৎসকদের চিকিৎসার কৌশল এবং অসৎ পন্থায় অর্থ উপায়ের কথা বর্ণনা করে বলেছে,—"কবিরাজ, বৈদ্য, ডাক্তার, হাকিমেরা টিপ রেখে রোগীর চিকিৎসা করে। যে রোগটা এক তিল, তাকে তাল কোরে রোগীর অর্থ শোষণ করে। আবার যে রোগটা আট আনা বা একটাকার ঔষধ খেয়ে সাত দিনে সেরে যেতে পারে, সে রোগটাতে তিন চার মাস ঔষধ খাইয়ে হপ্তায় হপ্তায় টাকা লোটে, একেই বলে হাতের টিপ।" (১/২) তাই নিতাই চিন্তান্বিত হয়ে তার কাছে ছুটে এলে সে উল্লসিত হয়ে ভাবে, "ওঃ লোকটা ছুটে এসেচে। তবে দেখচি, একটা বড় গোচের দাঁও পট্‌লো। মুখখানা শুক্‌নো, চোখ দুটো ছলছল, সুসংবাদ বটে!" (১/২) কিন্তু সেই ভজহরিই জয় ডাক্তারের লাম্পট্যের কথা জানতে পেরে বলে, "...বেটা চিকিৎসককুলের কলঙ্ক, লম্পট, কামুক, পাষণ্ড, নাস্তিক, ভণ্ড, অকালকুষ্মাণ্ড!" (১/২)

প্রহসনটিতে স্যাটায়ারের তীব্র জ্বালা আছে।

'ডাক্তারবাবু' প্রহসনের কাহিনী এবং চরিত্রগুলি পূর্বে লেখা 'কুপোকাৎ' গল্পকাহিনীর ( ১৮৮১ ) সঙ্গে এক।

টাটকা টোট্‌কা ( ১৮৯০ )॥ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি বীণা রঙ্গমঞ্চে প্রহসনটির প্রথম অভিনয় হয়। লম্পট ছাত্রের লাম্পট্য দূর করবার জন্য এটি একটি অভিসন্ধিমূলক প্রহসন।

পরস্ত্রীর প্রতি অনুরক্তির পরিণাম যে কী কঠিন, দুর্বিষহ হতে পারে—তার প্রমাণ পাই এ-প্রহসনে মদ্যপ ও লম্পট হেমচন্দ্রের মধ্য দিয়ে। কলকাতার 'কালেজীয় শিক্ষা' তাকে ইংরেজি বিদ্যায় শিক্ষিত করে তুললেও তার চরিত্রহীনতা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। কৃষক মাধব ঘোষের যুবতী স্ত্রী চন্দ্রমুখীর প্রতি তার অশোভন অনুরাগের সমুচিত শিক্ষা সে পেল গ্রাম্যবালক নিমাইচাঁদ এবং মাধবের মিলিত প্রচেষ্টায়। তাদের যুক্ত কূটকৌশলে হেমচন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত 'টাটকা-টোট্‌কা' অর্থাৎ সম্মার্জনীর প্রহার নির্বিবাদে সহ্য করতে হয়েছে। পরিশেষে, অনুতপ্ত হয়ে বলতে শোনা গিয়েছে, "আমার যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল। ধর্ম্ম কথনও মানুষের পাপকর্ম্ম সন না—অবশ্য তার বিধিমতে শাস্তি দেন—তাই আমার ভাগ্যে এই—'টাট্‌কা-টোট্‌কা!' আমার মত আর যদি কেউ থাক, তবে মনে রেখো—এই টাট্‌কা-টোট্‌কা।" ( পঞ্চম দৃশ্য )।

হেমচন্দ্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে তার চরিত্র চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। ব্রাণ্ডির গুণগান করে সে বলে,—"…বিকেলবেলা চন্দ্রাবতী নদীর ঘাটে গিয়ে, গোলাপী নেশায় গোলাপফুলদের সঙ্গে রঙ্গভঙ্গ কোরবো। সাদা চোখে রঙ ফোটে না—রাঙা চোখেই রঙ ফোটে।" ( দ্বিতীয় দৃশ্য )

প্রহসনটিতে তিনটি সম্পূর্ণ এবং একটি দুই পংক্তি-বিশিষ্ট আদিরসাত্মক গীত আছে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজকৃষ্ণ বেশ সচেতন—কৃষকের মুখে গ্রাম্য ভাষা এবং হেমের মুখে ইংরেজি ভাষার প্রকাশ। হেম নিজেকে 'hony fly' বলে।

অনুপ্রাসের ছটায় প্রহসনটি পরিপূর্ণ। মাধব যখন নিমাইচন্দ্রকে নকল স্ত্রী-লোক সাজিয়ে পরখ করেছে—তখন তাকে প্রণয়-সম্ভাষণ করে বলেছে—"বলি ও সুন্দরিণি! হে ঘোমটা টানুনি! রে মুচকি-হাসুনি! ভো পদ্মমুখিনি! হা বঙ্কিম-চোখিনি! আমি তোমার অনঙ্গশরে জরজর অঙ্গ, একবার রঙ্গে ভঙ্গে, ব্যঙ্গে ঢঙ্গে, আমার সঙ্গে, বিচ্ছেদ উচ্ছেদ প্রথম পরিচ্ছেদ সংঘটন ঘটাও—ঘোমটা উঠাও—থ্যাম্‌টা ফুটাও—প্রেমতুফান ছুটাও—দগড় ফাটাও—রগড় লুটাও।" ( তৃতীয় দৃশ্য )। কিন্তু কোথাও কোথাও এই অনুপ্রাসের চমক প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়। হেমের বদমাইসির কথা মাধব জানালে নিমাই বলে, এ-গাঁয়ে বদমাস্ তো একমাত্র সে। মাধব তার উত্তরে বলে—

"মাধব। তুই নিরিমিষ্যি বদ্মাস্; সে ব্যাটা আমিষ্যি বদ্মাস্।

নিমাই। কে সে আমিষ্যি? বল তো, হব্বিষ্যি কোরে ফেলি।

মাধব। অব্বিশ্যি অব্বিশ্যি। তার নাম হচ্চে হেমা বাম্না—ধাম হোচ্চে এই চণ্ডীপুর। (প্রথম দৃশ্য)

তখন আমরা বুঝতে পারি ইচ্ছাকৃত এই শব্দপ্রয়োগের প্রচেষ্টার মধ্যে একটু বাড়াবাড়ি আছে।

'টোট্‌কা' অর্থ মুষ্টিযোগ। মুষ্টিযোগের একটি বিকৃত সুপরিচিত অর্থ প্রহার—যা মুষ্টি দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রকৃত অর্থেও দণ্ডই সামাজিক ঔষধ হিসেবে প্রহসনকার স্বীকার করেছেন।[১৮৪] বাংলা প্রহসনের ইতিহাস রচনাকালে সমালোচকের মনে হয়েছে, "'টাটকা-টোটকা' প্রহসনে রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব বর্তমান। বইখানি রামনারায়ণের 'চক্ষুদান' ও 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি রচনা স্মরণ করাইয়া দেয়।"[১৮৫]

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায় 'পাঁচ ঝাঁটা' নামে একটি গল্প রচনা করেন। দীর্ঘ আট বছর পরে সেই কাহিনীকেই নাট্যরূপ দেন। লেখেন 'টাট্‌কা-টোট্‌কা' প্রহসন।

জগা-পাগলা বা জ্যান্তে মরা (১৮৯০)।। রাজকৃষ্ণ রায় এটিকে 'প্রাহসনিক নাট্যরঙ্গ' বা 'A Farcical Comedy' বলেছেন। প্রহসনটির কেন্দ্রীয় চরিত্র জগবন্ধু নামে এক ভাবুক পাগল। তার অভিনবত্ব এই যে, জাগতিক ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে সে এক ঐন্দ্রজালিক কুহক-বলে জগৎকে যে শিক্ষা দিয়েছিল তাতে দর্শক আমাদের ভিতর দিয়ে জগতের আসল রূপ দেখে নিতে পারে। জগবন্ধু নিজের সম্বন্ধে বলে, "আমি তো একটা জগা পাগলা—হ্যাঙ্‌লা, ন্যাঙ্‌লা, জন্মক্যাঙ্‌লা।" (ষষ্ঠ দৃশ্য)। ভাবভঙ্গিতে তার পাগলামী প্রকাশ পেলেও তার কথাবার্তা কিন্তু তাত্ত্বিকের মতো। তার মতে, "যার কিছু সার নেই, সেই এখনকার দিনে ভারি ভারি।" (প্রথম দৃশ্য)। জগা তার দিব্যচক্ষু দিয়ে মানুষকে 'মাটির জালা' ভাবে। মাটির জালার সঙ্গে শূন্যগর্ভ মানুষের তুলনা করে সে বলে, "মাটীর খালি জালাগুলোর ঠংঠংনির জালা বরং সয়, কিন্তু মানুষ-জালা-গুলোর জ্বালা সয় না আমার।" (প্রথম দৃশ্য) সুখ সম্পর্কে তার অভিমত,—"যে করে সুখের আশ, দুঃখু তার বারোমাস। / লোকে দেঁতো হাসি কেবল হাসে, মনের চোখে কেঁদে কাসে।" (প্রথম দৃশ্য) মা পার্বতীকে বলে,—"...দুনিয়ায় কি আর সুখ আছে? সুখ শুকিয়ে গেছে। কেবল দুঃখু-দুঃখু-দুঃখু। এ যে না বিশ্বেস করে, সে মুখ্যু-মুখ্যু-মুখ্যু।" (প্রথম দৃশ্য) তার পাগলামীতে অতিষ্ঠ হয়ে মা

তাকে ভৎ'সনা করে বলেন—"মর্ মর্।" সে মাতৃআজ্ঞা পালনে উদ্যোগী হয়। পথে পুরোহিত নরহরি ভট্টাচার্যকে প্রণাম করলে তিনি আশীর্বাদ করেন—"বেঁচে থাক"। এখানে দু'জনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নির্মল হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন লেখক এবং সার্থকতাও লাভ করেছেন। নরহরি যখন জানায়, পার্বতী জগাকে 'মিথ্যে মরতে' বলেছে, জগা তখন চতুর প্রশ্ন করে—"তবে তুমিও মিথ্যে মিথ্যে 'বেঁচে থাক' বোলে আশীর্ব্বাদ কোল্লে?" (দ্বিতীয় দৃশ্য) এরপর জগা 'জ্যান্তে মরা' হয়ে বেঁচে থাকে—অর্থাৎ জীবন্মৃত।

জগার জবানীতে রাজকৃষ্ণের নানা বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের অসদাচরণে দুঃখ পেয়ে সে বলে—"হায় হায়, দুনিয়াতে পৌনে ষোল আনা নরনারী নরকে যাওয়ার সুড়ঙ্গের অধিকারী।" (তৃতীয় দৃশ্য)। ব্রাহ্মণদের প্রতি তার অনাস্থা প্রকাশিত হয়েছে নরহরির সঙ্গে কথাবার্তায়,—"ভট্‌চায্যি মশায়, বিকেলবেলার আশীব্বাদটা সন্ধ্যের পরেই ভুলে গেলে? বামুনের এত ভুল, তাই তো আশীব্বাদ ফলে না।" (তৃতীয় দৃশ্য) অথবা নরহরির হাতে মার খেয়ে জগা রুষ্ট হয়ে বলে, "কি বলবো, তুমি চারকাকাটা সুতো গলায় দিয়েচো, নৈলে চৌচাপটে চরকীর মত ঘুরপাক খাইয়ে দিতুম।" (চতুর্থ দৃশ্য)

পথ চলতে গিয়ে জগা কল্পনার পাখায় ভর ক'রে সুদূরে ভেসে গিয়েছে। বাস্তব যে কত কঠিন তা মনে পড়ে যায় কলসভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে—পাঠকেরও চমক ভাঙে।

এ-প্রহসনে রূপকথা দ্বারা লেখক প্রভাবিত হয়েছেন। পরীদের আবির্ভাব কল্পরাজ্যে নিয়ে যায়। তবে তাদের অনুগ্রহেই জগা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের দেওয়া ভেল্কি মগ এবং লাল-সাদা দুটি লাঠির জোরেই জগা অসাধু ময়রা জীবনকে শায়েস্তা করে। কটুভাষী জীবনকে সে বলে—"লোভের মিষ্টি রসে তোমার কটকটে কথা মিষ্টি হল নাকি?" স্বগতোক্তি করে, "...দুনিয়ার মানুষের কাণ্ডই এই। স্বার্থে যদি পড়ে ঘা, বলে শালা; স্বার্থ যদি সাধন হয়, বলে বাবা।" (ষষ্ঠ দৃশ্য) জীবন তার ভেল্কি-মগ অপহরণ করে অস্বীকার করে, উল্টে মারতে উদ্যত হলে সে বলে—"...সরল সুজন মার খায়, ধূর্ত্ত কুজন বেঁচে যায়।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত জগার জাদু-ভূতের দৌলতে সে সবাইকে কাৎ করে—সবাই বলে, "বাপ ভূতের কি দাপ!" (ষষ্ঠ দৃশ্য)

জগার খপ্পরে পড়লে সবাইকে 'জ্যান্তে মরা' করে ছাড়ে সে। শেষে বলে—"এই দুনিয়াতে সব্বাই জ্যান্তে মরা।...অন্ততঃ একটা না একটা ঘটনা-ধাক্কার দাপটে দুনিয়ার মানুষ মাত্রেই জ্যান্তে মরা। আমি দেখে শুনে, ঠেকে ঠুকে এতক্ষণ বেশ বুঝলুম, এ দুনিয়া জ্যান্তর জন্যেও নয়, মরার জন্যেও নয়, কেবল জ্যান্তে-মরার জন্যে।" (ষষ্ঠ দৃশ্য) তখন সামান্য কথার মধ্যে দিয়ে জীবনের অসামান্য উজ্জ্বল চরম সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়।

ভাষা সর্বত্র প্রশংসনীয় ও স্বাভাবিক নয়। যেমন জগা যাকে বলে 'আবাগের বেটী'। স্থানবিশেষে ভাষা অশ্লীল, গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহার খুবই শ্রুতিকটু। লেখক অনেক জায়গায় স্থূল হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। তবে এ-প্রহসনে উইটের প্রাধান্য

লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র ( ১৮৯০ )॥ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২ নভেম্বর বীণা রঙ্গমঞ্চে প্রহসনটির প্রথম অভিনয় হয়। রাজকৃষ্ণ রায় এটিকে 'প্রহসন' না বলে 'সামাজিক ব্যঙ্গ নাটক' বলে চিহ্নিত করেছেন—'A Satirical Society-play'।

কন্যাপণের মত বরপণও সামাজিক সংকটকে জটিল করে তোলে। সেই "বরপণকে কেন্দ্র করে যে পৈশাচিকতা ও দুর্নীতি বাংলা দেশের সমাজ-জীবনে প্রকট হয়ে উঠেছিল লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র প্রহসনের ভিতরে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রহসন-কার সামাজিক ব্যাধির কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করে সেই ব্যাধির দুষ্ট বীজাণু সমাজ-দেহকে কি ভাবে পঙ্গু করে তুলেছে তা দেখিয়েছেন।"[১৮৬]

কলকাতাবাসী জনৈক লোভেন্দ্রবাবুর অর্থলোভের পরিণাম কী ভয়ানক মর্মঘাতী হতে পারে, তা এ-কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি। লোভেন্দ্রর মুখ থেকেই তার পরিচয় জানা যায়। লোভেন্দ্র বলেছে, সে হচ্ছে "Model Bridegroom's Father, যাকে বাঙলায় বলে আদর্শ-বরের বাপ। অন্য অন্য বাবারা আমার কাছে ছেলেরূপ পাঁঠা-বেচা শিখে নিক।" সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই 'আদর্শ বরের বাপ' বলে—এই পৈশাচিক বৃত্তিকে—এই দুষ্প্রবণতাকে—ব্যঙ্গ করেছেন লেখক। লোভেন্দ্র অর্থাগমের সহজ পন্থা আবিষ্কার করে—পণগ্রহণ।

দুর্জনের পুত্রও তার যোগ্য হতে পেরেছে—বরং সে বাবার থেকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক গুণবান। সে শুধু অসৎ নয়, বেশ্যাসক্তও বটে। সেই কারণে সে মায়ের কাছ থেকে ছলনা করে, কখনও বা জোর করে টাকা গয়না আদায় করে, এবং বারাঙ্গনা পান্নাবিবির কাছে ফূর্তি করতে গিয়ে সর্বস্ব খোয়ায়।

এ-কাহিনীর মূলে আছে কন্যার পিতা পরাণবাবুর কাছে পুত্র গবেন্দ্রর বিবাহ উপলক্ষে লোভেন্দ্রের চোদ্দ হাজার টাকা পণের দাবি। গোবিন্দপুরের পরাণবাবু জানান লোভেন্দ্র তাকে বলছেন, "…বন্ধকী বাড়ী দশ হাজার টাকার বিক্রী লিখে দিয়ে, তা ছাড়া আরও চারহাজার টাকা নগদ দিয়ে, আমার পুত্র শ্রীমান্ গবেন্দ্রচন্দ্রের সহিত তোমার তৃতীয় কন্যার বিবাহ দাও, নৈলে পনর দিনের মধ্যে নালিশ কোরে খরচা সমেত সাড়ে তের হাজার টাকার ডিক্রী কোরে বাড়ী সিল করবো।" (১/২)। এই পণ-আদায়ের ব্যাপারে পুত্র গবাও সম্মত। সে বলে, "আমার বাবা বরের বাবা, / লুটবে টাকা থাবা থাবা! / ক'নের বাবা বোকা হাবা, /

হাবুডুবু খাবি খাবা।" ( ১/১ )। গবেন্দ্র বিভিন্ন প্রকার নেশা করে—কখনও বা বই বেচে তার অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। পুত্রের স্বাস্থ্য, গাত্রবর্ণ, সাজ-পোষাক, প্রসাধনের প্রতি লোভেন্দ্রের সজাগ দৃষ্টি। এরজন্যে তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করেন—একে তিনি বলেন Investment—অর্থাৎ বিনিয়োগ। কারণটি বাড়ির ভৃত্যেরও অজানা নয়। ভৃত্য রঙ্গা তাই গবেন্দ্রকে বলে, এই 'অঙ্গমোটা', 'রঙ্গফোটা', 'বাহারঘটা'র বন্দোবস্তোর কারণ…"না তোমার বাবা ক'নের বাবার কাছে তোমাকে চড়ার ওপর চড়া দরে বেচবেন।" ( ১/১ )

পিতা লোভেন্দ্রের একটি সন্তানে সুখ নেই। তিনি আরও 'হৃষ্টপুষ্ট বীর বলিষ্ঠ ছেলে' চান, 'কিন্তু আধখানিও মেয়ে' না। তিনি বলেন, "…দশ পনরটা হ'লে গবা, / চালবো টাকা কেটে ডোবা।" (১/১)। তাই তিনি স্ত্রী-কে ষষ্ঠী ঠাকরুণ সাজিয়ে ষষ্ঠীর পুজো করেন। আমাদের সমাজে বিবাহ-ব্যাপারে 'বিয়ের বাজার' শব্দটি বিশেষ প্রচলিত। লোভেন্দ্র তাই ষষ্ঠীপুজোর আয়োজন করতে গিয়ে গান ধরেন—"এক এক ছেলে দশহাজারে / বেচবো কসে বে'র বাজারে / মেয়ের বাবার দফারফা / ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দেবো।" ( ১/১ )। মেয়ের বিয়েতে মেয়ের বাপের যে সত্য-সত্যই দফা-রফা হয়, 'কন্যাদায়' কথাটির মধ্যেই সে সত্য আভাসিত। এখানেও পরাণবাবুর সেই অবস্থা। যাইহোক্, এ-বাড়ির উপযুক্ত নফর রঙ্গা, তাই তারও মনে হয়, "…টাকাই কামরূপ-কামিখ্যের মন্তর।" ( ১/১ )।

অর্থপিশাচ লোভেন্দ্র সহধর্মিণীকে মা বলেন, স্ত্রী গোলাপ বিব্রত হলেও টাকার ভাগী হবে জানতে পেরে ষষ্ঠী ঠাকুর হতে রাজী হয়। লোভেন্দ্রও ভাবেন, যদি কুড়িটা ছেলে হয়, তবে তাদের বিয়ে দিয়ে রামদুলাল সরকার, মতিলাল শীলদের সমতুল্য হতে পারবে। পুত্র গবেন্দ্র কিন্তু পিতার ষষ্ঠীপুজোর ঘটনায় ক্ষিপ্ত। সে রঙ্গাকে ক্ষোভের সঙ্গে বলে, "…আমি হেন একমাত্র কুলের মুখোজ্জ্বল গ্যাস-লাইট ছেলে থাকতে, তিনি আবার ছেলের জন্য ষষ্ঠীপুজোয় মন দিয়েছেন।" ( ১/১ ) রঙ্গা তাকে পরামর্শ দেয়, "মালীর ঘরে, দিব্যি কোরে, / দম্ বেদমে টেনে গাঁজা। / বুদ্ধি খাটাও, ওষুধ খাওয়াও, / বাপ্‌কে তোমার কর বাঁজা॥" ( ১/১ ) এর পরিণাম স্বরূপ গবেন্দ্র একমাত্র পুত্র থাকবে, সে আরও জানায় তখন, "উজীর আমি, তুমি রাজা।" গবেন্দ্র এ-কাজে সম্মত হয় না—তার মতে এটা কাপুরুষের কাজ। সে সিদ্ধান্ত নেয়—"ছেলে পিণ্ডি দেয় মরা বাবার, আমি পিণ্ডি দেবো জ্যান্ত বাবার।" ( ১/১ ) শেষ পর্যন্ত যষ্টি এনে ষষ্ঠী পুজো পণ্ড করে।

ষষ্ঠীপুজোর কাহিনী বর্ণনা অত্যন্ত আদিরসাত্মক। এ-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মদের মূলমন্ত্র 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-কে নিয়ে কিঞ্চিৎ হাসি-তামাসার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। রঙ্গা এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে লোভেন্দ্র জানান—"এক বই দুই নাই।" তখন রঙ্গা যে মন্তব্য করে তা হলো,—"যদি এক বই দুই নেই, তবে ব্রহ্মসমাজের মাঝে, মেয়ে মদ্দ

কেন বিরাজে? হয় খালি মেয়ে থাক, নয় খালি মদ্দ থাক। এ বড় ভারি অন্যায় কথা, থাকে দুরকম, বলে এক রকম।" (১/১) এখানে বাগভঙ্গিজনিত হাস্যরস বা উইটের সঞ্চার করা হয়েছে। কোন ধর্মকে আঘাত নয়, নির্মল হাস্যরস সৃষ্টিই এখানে উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

গবেন্দ্র চরিত্রহীন, অসৎ, মিথ্যাভাষী। সে গণিকা পান্নাবিবির প্রণয়াসক্ত। তার সঙ্গে আছে চরস, আফিম, গাঁজা এবং মদ্যপান। সে বলে, "সোনাগাছী, রূপোগাছী, সে দুই গাছীর আমি মাছি, আশ মিটিয়ে মধু খাই।" (১/৩)। পান্নার দর্শনী সে মায়ের কাছে সংগ্রহ করে দান খয়রাৎ করার সময় বলে, "বাবা ব্যয়কুণ্ঠ, তাঁর বৈকুণ্ঠলাভের উপায় কল্লুম..." (১/৩) কিন্তু পান্না মক্ষীরাণী, তাই সে গবাকে অর্থপ্রাপ্তির পর বিতাড়িত করে। গবা তখন প্রতিজ্ঞা করে, "...পান্না শালীর মুখ দর্শন পর্য্যন্ত কোরবো না। দু'দিনে শালীর বেটী নগদে গহনাতে সাত শো টাকা ঠকিয়ে নিয়ে শেষে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিলে! শালী আর এক শালাকে নিয়ে, আমোদ আহ্লাদে মাতলো! ছি ছি, সাতশো টাকাই ঢাল্লুম নরককুণ্ডে।" (২/৪)

গবেন্দ্র এবং গোলাপসুন্দরীর কথোপকথনের ভাষা মাঝেমধ্যে শ্রুতিকটু ঠেকে। যেমন—"...বল্, বাবাকে টাকা দেওয়ার কথা বোলবি নি?

গোলাপ। না, বাবাটি!

গবেন্দ্র। তবে চল, মাটি!"

অন্ত্যমিলের ব্যবহার ইচ্ছাকৃত বলে বেশ বোঝা যায়।

রঙ্গার মুখে অনুপ্রাসের মালা কখনও বা হাসির লহর তোলে। যখন গবা, রঙ্গাকে প্রশ্ন করে পান্নাকে বল্‌নাচ শেখাতে পারবে কি-না, রঙ্গা জবাবে বলে,—"ছোট হুজুর! তোমার গোলাম মজুর, বল্‌তো বল্, অবল-সবল-পেবল-দুবল-সম্বল কম্বল-অম্বল ইত্যাদি কোরে রঙ-বেরঙের বল্‌নাচ নাচাতে পারে" (১/৪)। অথবা নন্‌সেন্সকে 'নিমসেন', বা ইন্সপেক্টরকে 'ইন্সিস্ পোক্তার' ইত্যাদি ভুল উচ্চারণ বিকৃতি প্রয়োগে হাসানোর চেষ্টা হয়েছে।

পরাণবাবুর চার বন্ধু শ্যাম, হরি, গোপাল ও মধু খুব সঠিক ভাবেই গবার চরিত্রচিত্রণ এভাবে করেন রঙ্গার কাছে—"তোর গবুটো আস্তো গরু, / মস্ত গরুর ছানা। / মানুষরূপে চোরুচে ভবে, / তাই যায় না চেনা॥" (১/৪)

লোভেন্দ্রর কাছে অর্থসম্পদের তুল্য পৃথিবীতে কিছুই নেই। তিনি বলেন টাকার জন্য "খুনখারাপি—চুরিচামারি—জুওচ্চুরি, বাটপাড়ী, জালজালিয়াতি—ফন্দি-ফিকির, কল-কৌশল-ফাঁকিমি ঠকামি—ধূত্তুমি মিথ্যেমি ইত্যাদি সমস্ত পুণ্যকর্ম্মই কোত্তে পারি।" এবং "...এ ব্রহ্মাণ্ডে আমার পক্ষে—টাকা ধর্ম্ম, টাকা মোক্ষ, টাকা হি পরমন্তপঃ। আমি টাকা পেলে স্ত্রী-পুত্র, বাড়ী-ঘর, এমন কি, পরমেশ্বর

পর্য্যন্ত ছাড়তে পারি।" ( ২/১ ) তাই পুত্রের প্রহারে ধরাশায়ী হলে গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য তিনি ঝাঁকায় চড়েন। কারণ "ভাড়াটে গাড়ীর ভাড়া ঢের। ঝাঁকার ভাড়া বড় জোর তিন চার পয়সা।" ( ২/১ ) কিন্তু মুটে জানায় তিন পয়সায় পাঁঠা, বক্‌রা, গোঁকা বাচ্চা ওঠানো যায়, মানুষ নয়। তখন লোভেন্দ্রর কার্যকলাপ দেখে পরাণবাবুর বন্ধু শ্যামবাবু মুটেকে বল্লেন, "ও মুটে, কেন ভয় কোচ্চিস্? এই বাবুটিও পাঁঠা, বক্‌রা, গরুর বাচ্চার শামিল…" ( ২/১ )। যথার্থই তাই, আকৃতিতে না হলেও, প্রকৃতিতে।

ঋণগ্রস্ত পরাণবাবুর কন্যাদায় উদ্ধারের ভার তাঁর বন্ধুরা নেন। তাঁরা কৌশলে লোভেন্দ্রর কাছ থেকেই অর্থ আদায় করেন। তার আগে পরাণবাবুকে তাঁর বন্ধু শ্যামবাবু কথা দেন, "হরি সাক্ষী, লোভেন্দ্রবাবুকে হাবুডুবু খাওয়াবো, অথচ আপনারও সমস্ত বিপদ ঘুচিয়ে দেবো।" ( ১/২ ) সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে শ্যামবাবু তামাকে সোনা করার ফাঁদে লোভেন্দ্রকে ফেলে এবং শেষপর্যন্ত তার ছেলে বৌকে ডাকিয়ে এনে লোভেন্দ্রর কাছ থেকে পরাণবাবুর বন্ধুরা কাফ্রীর ছদ্মবেশে মিলিত-ভাবে বিশ হাজার টাকা আদায় করে। লোভেন্দ্র অর্থশোকে আত্মহারা হয়ে মনে মনে বলে—"ব্যাটারা দফারফা কোল্লে, অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করা টাকার কাঁড়ি কেড়ে নিলে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু!" ( ২/৫ ) রঙ্গা তখন মন্তব্য করে "…কি ছাই কুড়ি হাজার টাকা! আপনার জীবন্তা ষষ্ঠী ঠাকুরোণের গবভকোষ টাঁকশাল! লাখ লাখ টাকা তোয়ের হবে।" ( ২/৫ ) কথাটায় বিদ্রূপের সুরই ধ্বনিত হতে শোনা যায়।

পরিশেষে ভৃত্য রঙ্গা সাবধানবানী উচ্চারণ করে—"আমার বড় হুজুরের মত এখানে যদি কেউ থাক বরের বাবা, তা হোলে হে ভগবান, এজের রাতেই যেন তারো ভাগ্যে কর এ দিকে চাঁপাতলার ঘাট, ও দিকে নিমতলার ঘাট, মাঝখানে বল হরি—হরিবোল।" ( ২/৫ )

এ-প্রহসনে অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে।

জজ্‌ জজ্‌ ( ১৮৯০ )॥ এই প্রহসনটি 'খোকাবাবু' কিংবা 'বেলুনে বাঙালী বিবি' প্রহসনের সমধর্মী। বস্তুত তিনটি প্রহসনকে একটি প্রহসনের ক্রমপর্যায় বলে গণ্য করা যেতে পারে। প্রহসনটির অধিকাংশ পাত্রপাত্রী 'বেলুনে বাঙালী বিবি' বা 'খোকাবাবু'র পাত্রপাত্রী। অর্থাৎ প্রধান চরিত্রগুলি—দয়ালবাবু, স্ত্রী, পুত্র খোকাবাবু, মোসাহেবদ্বয়,—এখানেও উপস্থিত। এছাড়া শিক্ষক সর্বভক্ষ মুখোপাধ্যায়, বাড়ির পরিচারিকা এবং অন্যান্য শিক্ষকদের চরিত্র সংযোজিত হয়েছে। বিষয়বস্তু পূর্বোক্ত প্রহসন সদৃশ। অর্থাৎ একমাত্র সন্তানের প্রতি পিতামাতার অন্ধ স্নেহ—পরিণামে পুত্রের অধোগতি। এ-প্রহসনে 'কাণ্ডজ্ঞানহীনা

আধিক্যেতাপূর্ণা বাৎসল্যপরায়ণা' 'গৃহিণীর ন্যাকামি'ও চিত্রিত হয়েছে।[১৮৭]

এ-প্রহসনে দেখি মা-বাবার অতিরিক্ত অন্যায় প্রশ্রয়ে খোকাবাবু শিক্ষকের সঙ্গে অসদাচরণ করে, বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রতি ন্যূনতম সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজন বোধ করে না। যে পরিচারিকা তাকে জন্মাবধি দেখাশোনা করেছে, তাকেও সে মানুষ বলে জ্ঞান করে না। তাকে চপেটাঘাত করে ভৎ'সনা করতে কুণ্ঠিত হয় না। তাকে জীবনে বিদ্যার্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গেলে সে জানায়,—"না, আমি লেখাপড়া শিখবো না, আমি কি মুটে মজুর, তাই বই সেলেট বয়ে বেড়াবো?" খোকাবাবু তার বাবা দয়ালবাবুকে এরপর একটি সাংঘাতিক প্রশ্ন করে—"বড় মানুষের ছেলে কোন্‌কালে লেখাপড়া শেখে? বড় মানুষ বাবা যা কোরে হোক কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমায় কি জন্যে?" এবং তারপরে সে নিজেই তার চমকপ্রদ জবাব দেয়—"বড় মানুষ ছেলে রঙ্গরসে ওড়াবে বোলে।" (দ্বিতীয় দৃশ্য)

এখানেই প্রহসনটির সার্থকতা। আমাদের সমাজজীবনে ধনবান ব্যক্তির অকালকুষ্মাণ্ড বখাটে পুত্রের মানসিকতা, তাদের চিন্তাভাবনার স্বরূপ ফুটে উঠেছে খোকাবাবুর এই উক্তিগুলির মধ্য দিয়ে।

সেকালে ওপরওয়ালার খোসামোদ করতে পারলে যে সাধারণ অযোগ্য ব্যক্তির ভাগ্যেও রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর, সি. আই. ই., সি. এস. আই., কে. সি. এস. আই., কে. সি. আই. ই. প্রভৃতি নানান 'খেতাব' জুটতো—তা জানতে পারা যায় দয়ালবাবুর কথায়। তিনি এই খেতাব প্রাপ্তিকে 'মস্ত লাভ' বলে মনে করেন, আর তাই ছেলেকে এই কারণেই লেখাপড়া শিখতে উৎসাহিত করেন। সাহেবদের কাছে খেতাব-প্রাপ্তির জন্য খোসামোদ করে বড় বড় দরখাস্ত লেখার বিদ্যেটুকু যাতে সে অর্জন করতে পারে। এই সত্যভাষণের মধ্য দিয়ে রাজকৃষ্ণের খেতাবধারীদের প্রতি তীব্র শ্লেষ-বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

প্রহসনকারের চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটে তাঁর রচনায়। রাজকৃষ্ণেরও অন্তরের সে রকম এক সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি ধরা পড়েছে শিক্ষক সর্বভক্ষের সঙ্গে দয়ালবাবুর পরিচারিকার কথোপকথনে। সর্বভক্ষের মুখ দিয়ে রাজকৃষ্ণ যেন নিজের মনের কথাই প্রকাশ করেছেন। ঝি যখন ঘর-জামাই হওয়ার সুখ সুবিধার ব্যাখ্যা করেছে, তখন সর্বভক্ষ এ-সম্পর্কে তাঁর মতামত জানিয়ে বলেছেন—"...ঘরজামায়ে হওয়া আর জীবন্তদশায় জলন্ত নরককুণ্ডে ধড়ফড় কোরে মরা সমান না?" (তৃতীয় দৃশ্য)। অতঃপর আমাদের আর বুঝতে অসুবিধে হয় না সমাজের এই প্রথা সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণের মনোভাব। সেই সঙ্গে পাঠক উপলব্ধি করতে পারে তাঁর সম্মানজ্ঞান কী প্রবল ছিল।

প্রহসনটিতে শিক্ষকদের প্রতি অনাদর, তাদের প্রতি ধনীব্যক্তিদের অবমূল্যায়ন সেইসঙ্গে তাদের অসাধুতা প্রদর্শিত হয়েছে। আজকের যুগেও আমাদের দেশের

কোনো কোনো অংশে যা বিদ্যমান।

প্রহসনটিতে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে মূলত হাস্যরসের সঞ্চার করতে লেখক চেয়েছেন, প্রহসনের নামকরণ যার থেকে হয়েছে—তা নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা। 'জুজু' সেজে খোকাবাবুর সকলকে ভয় দেখানো নিতান্তই স্থূল হাস্যরসের সৃষ্টি করে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভয়প্রদর্শনের পক্ষে এটা কোন কৌশলই নয়। এক হিসাবে অপরিণত বুদ্ধির পরিচয় পাই এখানে—খোকাবাবুর পক্ষে হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু পরিণতবুদ্ধি নাট্যকারের কাছে অপ্রত্যাশিত।

প্রহসনের প্রারম্ভে সংবাদপত্রের মুদ্রণপ্রমাদ নিয়ে পরিহাস করা হয়েছে। কম্পোজিটরদের 'Printer's Devil' বলা হয়েছে। কারণ পাঁচ টাকাকে তারা ছাপে '৫ কাঠা'। এছাড়া বর্ধমানের মহারাণীর মৃত্যুসংবাদ মুদ্রিত হয় খুবই হাস্যকরভাবে।—"…ছোট মহারাণীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইলাম।" (প্রথম দৃশ্য)। 'পরিতৃপ্ত' না হয়ে হবে 'পরিতপ্ত'। এছাড়া মুরগীকে 'সীতাপতি বিহঙ্গ' বলে হাসানোর চেষ্টা হয়েছে। অসাধু পণ্ডিত সর্বভক্ষ যখন বলে "…'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্যং বিধীয়তে।' ফাউল তো ফাউল, আউল পর্য্যন্ত রন্ধন কোরে দেবো।" (প্রথম দৃশ্য) তখন তার কথা শুনে হাসিই আসে।

প্রহসনটিতে গ্রাম্য আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগে রাজকৃষ্ণের পারদর্শিতা প্রশংসনীয়।

জন্মাষ্টমী (১৮৯০)॥ 'জন্মাষ্টমী' স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে কি না জানা যায়নি। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় যখন 'রাজকৃষ্ণ গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন তখন তার চতুর্থ ভাগে (১৮৮৯) 'জন্মাষ্টমী' নামে 'চিত্ররঙ্গ ও পঞ্চরঙ্গ'টি স্থান পায়। পরে বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী'-পঞ্চম ভাগেও 'জন্মাষ্টমী' মুদ্রিত হয়। রাজকৃষ্ণের নাটক নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরাও 'জন্মাষ্টমী'কে তাঁর রচনা বলে গ্রহণ করেছেন। তবে ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন "জন্মাষ্টমী (১২৯৭ সাল) বীণা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। রচয়িতা 'বীণা থিয়েটারের সহকারী শিক্ষক ও অভিনেতা' পান্নালাল শীল। বইটি রাজকৃষ্ণ কর্তৃক সংশোধিত।" রাজকৃষ্ণের সংশোধনের পরিমাণ আমাদের জানা নেই, কিন্তু রচনারীতির দিক থেকে 'জন্মাষ্টমী'কে তাঁর প্রহসনধারার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

'জন্মাষ্টমী'র রচনাশৈলী অভিনব। এখানে একদিকে 'চিত্ররঙ্গে'র মধ্যে মথুরায় কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলাভ, বসুদেব কর্তৃক শিশু শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে যমুনা অতিক্রম, গোকুলে নন্দের গৃহে যশোদার পার্শ্বে কৃষ্ণকে স্থাপন এবং

মথুরার বধ্যভূমিতে কংসের হাত থেকে যোগমায়ার শূন্যে উত্থান চিত্রিত হয়েছে। 'চিত্ররঙ্গ' আসলে চিত্রপরম্পরামাত্র, চিত্রকর ভাগবত-কাহিনীর অনুসরণে পরপর কয়েকটি চিত্র উপস্থিত করেছেন। এর পাশে আছে চারটি 'পঞ্চরঙ্গ' দৃশ্য—অভিনয়কালে সেই পঞ্চরং-এর আকর্ষণ 'চিত্ররঙ্গে'র থেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। সমালোচকের ভাষায়, "ইংরেজিতে যাহাকে Tableau (মৌন দৃশ্য) বলে, তাহারই অনুকরণে রাজকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর বর্ণনাত্মক একটি রচনা প্রকাশ করেন। তাহাতে একদিকে যেমন কংসের কারাগার, বসুদেব কর্তৃক যমুনা অতিক্রম, নন্দগৃহ, মথুরার বধ্যভূমি প্রভৃতির চিত্র পরিবেশন করা হইয়াছে, তেমনই ইহাদের প্রত্যেকটি দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি ব্যঙ্গদৃশ্যও পরিবেশন করা হইয়াছে। স্বর্গীয় পবিত্রতার পাশে পাশে মানুষের ভণ্ডামি কতদূর পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাই নির্দেশ করা ইহার উদ্দেশ্য।"[১৮৮] উনিশ শতকে বাংলা প্রহসনের একটি ধারা পঞ্চরং নামে পরিচিত, যার মধ্যে পাই পাঁচমেশালী রঙ্গব্যঙ্গের চিত্র। পঞ্চ-রঙও এদিক থেকে চিত্রধর্মী, তবে 'চিত্ররঙ্গে'র মতো স্থিরচিত্র নয়। 'জন্মাষ্টমী' পঞ্চরংটিতে পাই নানা ধরনের চরিত্র, যেমন ষণ্ডেশ্বর পুরোহিত, কৃষ্ণদাস গোস্বামী, গোপাল-নেপাল, রমেশ-গবেশ, নন্দ ঘোষ-দণ্ড ঘোষ। অধিকাংশ চরিত্রই ভণ্ড ও কপট, ফলে তাদের চরিত্র ও আচরণের অসংগতি অবলম্বনে কৌতুক সৃষ্টি সহজ হয়েছে। যদু মধুর দৃষ্টিতে জন্মাষ্টমীর মজা দেখানো হয়েছে,—নাট্যকৌশল হিসাবে পদ্ধতিটি প্রশংসনীয়। রাজকৃষ্ণের অন্যান্য অনেকগুলি প্রহসনের মতো এখানেও মদ্যপানের আতিশয্য এবং তার ফলাফল প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে ডাবের মধ্যে মদ ভরে 'কাচের ডাব' বিক্রয় সে কালের সমাজচিত্র হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তবে পঞ্চরং কোনও সুসংবদ্ধকাহিনী নয়, ফলে ষণ্ডেশ্বর, কৃষ্ণদাস, গবেশ, দণ্ড ঘোষ স্বতন্ত্র কয়েকটি কাহিনীর আভাস দেয়—কোনো কাহিনীবৃত্ত রচনা করে না।

## ।। কৌতুক নাট্যগীতি ।।

উনিশ শতকে গীতিনাট্য বা গীতাভিনয়ের ধারা বাংলা দেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। গীতাভিনয়ের সঙ্গে উনিশ শতকে প্রচলিত যাত্রার বাহ্য সাদৃশ্য আছে। তবে যাত্রায় সংগীত ও সংলাপের সামঞ্জস্য ঘটেনি, মঞ্চোপযোগিতাও যাত্রায় কম। মনোমোহন বসুকে সাধারণত আধুনিককালে গীতাভিনয় ধারার প্রবর্তক মনে করা হয়, যদিও তাঁর আবির্ভাবের আগেই প্রকাশিত হয়েছে হরিমোহন কর্মকারের 'রত্নাবলী গীতাভিনয়' ( ১৮৬৫ ), অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শকুন্তলা গীতাভিনয়' ( ১৮৬৫ ), পূর্ণচন্দ্র শর্মার 'শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান নাটক' ( ১৮৬৬ ), তিনকড়ি ঘোষালের 'সাবিত্রী-সত্যবান' ( ১৮৬৭ ), যাদবচন্দ্র রায়ের 'কিচক বধ নাটক' ( ১৮৬৮ ), শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'লক্ষ্মণবর্জন নাটক' ( ১৮৭০ ), হরিশ্চন্দ্র মিত্রের 'আগমনী নাটক' ( ১৮৭০ ) প্রভৃতি। রাধার মানভঞ্জন অবলম্বনে লেখা 'মানিনী'র ( ১২৮১ সাল ) ভূমিকায় হরিমোহন কর্মকার জানিয়েছেন,—"অপারা অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা, এ পর্য্যন্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই। বহু-দিবস হইল আমি জানকী-বিলাপ নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয় নিজব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত গীতিকার অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে জানকী-বিলাপখানি কথঞ্চিৎ 'অপারার' আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল।"[১৮৯] এখানে অপেরার কথা বলা হলেও, এই ধরনের গীতিকায় ইংরেজি অপেরার লক্ষণ অপেক্ষা যাত্রার লক্ষণ বেশি। যাত্রা বা পাঁচালীকারদের লেখা গীতাভিনয় এক সময় প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে, যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্রজমোহন রায় ও মতিলাল রায়।

রাজকৃষ্ণ রায় যখন 'পতিব্রতা' রচনা করেন তখন তিনি তাকে 'নাট্যগীতি' নামে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, 'নাট্যগীতি' নিতান্ত আধুনিক কালে পাশ্চাত্য প্রভাবজাত রচনা নয়,—"আমাদের কতকদূর প্রকৃত বিশ্বাস আছে যে, যে কালে পূর্ব্বতন ভারতীয় সঙ্গীতবেত্তারা সঙ্গীতশাস্ত্রের বিশিষ্টরূপে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তখন নাট্যগীতিও তাঁহাদিগের মানস-প্রস্রবণ হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রাদিতে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় যত প্রকার লক্ষণ নয়নগোচর হয়, তাহাতে তৎকালে নাট্যগীতির অসত্তা সম্ভবে না। নাট্যরাসক বা নাট্যগীতির প্রকৃত অর্থ আদ্যন্তস্বরনিবদ্ধ সঙ্গীতময় অভিনেয় গ্রন্থ। সঙ্গীত-দামোদর প্রভৃতি সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থে যে কালে নাট্যরাসকাদি শব্দের উল্লেখ ও তাহার লক্ষণ প্রভৃতি দৃষ্ট হয় এবং উহা যেরূপ অর্থব্যঞ্জক, তাহাতে এক্ষণকার ইউরোপীয় 'অপেরা'র সহিত সামঞ্জস্যের ব্যত্যয় সম্ভবে না। কিন্তু দেশভেদে,

কালভেদে এবং রুচিভেদে এইরূপ পদার্থ কতক পরিবর্ত্তনশীল আকারে পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং তদানীন্তন ভারতীয় নাট্যগীতি এবং অধুনাতন ইউরোপীয় অপেরা অংশবিশেষ অঙ্গগত ও রুচিগত বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বলিয়া বিবেচনা করা অযুক্ত নহে।"[১৯৪] সংস্কৃত নাট্যরাসকের সঙ্গে ইউরোপীয় অপেরার সাদৃশ্য নির্দেশ যুক্তিসংগত না হলেও, রাজকৃষ্ণ যে পাশ্চাত্য অপেরার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ মিলবে পূর্বোদ্ধৃত 'পতিব্রতা'র ভূমিকা-প্রবন্ধে। অপেরার বহুবিচিত্র রূপের মধ্যে অন্যতম হলো—"Operetta (It. 'little opera') A light drama (for all practical purposes synonymous with F. ***opera bouffe***, It. ***opera buffa***). It consists of musical interludes and spoken dialogue often satirical. Famous examples are Gay's ***Beggar's opera*** (1728), Sheridan's ***The Duenna*** (1775) and the numerous works of Gilbert and Sullivan."[১৯৫] এই থেকে 'কৌতুক নাট্যগীতি'র বঙ্গীয় সংস্করণটি গড়ে উঠেছে মনে করলে অন্যায় হবে না। রাজকৃষ্ণের কৌতুক নাট্যগীতিগুলি ব্যাপক অর্থে তাঁর প্রহসন ধারার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কিন্তু আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তো বটেই, বিষয়বস্তুর অভিন্নতার কারণেও (বিশেষত চতুরালী ও চন্দ্রাবলী) এগুলি একসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন।

চতুরালী (১৮৯০) ও চন্দ্রাবলী (১৮৯০)॥ বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ থেকে বই জমা দেওয়ার যে-তারিখ পাওয়া যায় (যথাক্রমে ১১ জুলাই ও ২৬ জুলাই ১৮৯০), তা থেকে মনে হয় প্রায় একই সময়ে পুস্তিকা দুটির প্রকাশ। বীণা থিয়েটারের অন্তিম পর্যায়ে রাজকৃষ্ণ যখন শেষবারের মতো মঞ্চ-পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন তখন প্রথমে 'চন্দ্রাবলী' ও পরে 'চতুরালী' মঞ্চস্থ করেন। স্টেট্সম্যান পত্রিকায় ১৮৯০ সালের ২৬শে জুলাই এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়—

VINA THEATRE / 38, Machuabazar Road Thanthania/ Saturday, the 26th July, at 9 p. m., / Baboo Rajkrishna Roy's New Comic Opera CHANDRAVALI/Mirth Laughter Wit Humour / Next day, Sunday, at Candlelight / CHANDRAVALI/ prices of admission from 4 annas to 20 Rupees.[১৯২]

তারপর কয়েকমাস পরে ১৮৯০ সালের ৮ নভেম্বর 'চতুরালী' নাট্যগীতির বীণা থিয়েটারে অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। সে কালের সাময়িকপত্রের বিবরণ থেকে মনে হচ্ছে 'চন্দ্রাবলী' ও 'চতুরালী' প্রথম অভিনয়কালে দর্শকের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়—

১. 'চতুরালী', 'চন্দ্রাবলী' প্রভৃতি 'কমিক অপেরা' বা কৌতুক নাটিকাগুলি

বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চে রাজকৃষ্ণবাবুর অপূর্ব্ব সৃষ্টি।...মরকতের শোভার সহিত যেমন পদ্মরাগের প্রভার তুলনা হয় না—মরকত (এমারেল্ড) শ্রেষ্ঠ, কি পদ্মরাগ (রুবি) শ্রেষ্ঠ, যেমন বলা যায় না—সেইরূপ 'চতুরালী' শ্রেষ্ঠ কি 'চন্দ্রাবলী' শ্রেষ্ঠ, এক কথায় বলিবার যো নাই।...রাজকৃষ্ণবাবুর চতুরালী ও চন্দ্রাবলী দুখানিই 'কমিক অপেরা' বটে, কিন্তু একখানির সহিত অপরখানির তুলনা চলে না; দুখানি দু-রকমের স্বতন্ত্র ধাতু প্রকৃতিতে গঠিত।[১৯৩]

২. সে দিন বীণাতে কবিবরের 'চন্দ্রাবলী'র অভিনয় হইয়াছে। রসিকচূড়ামণির রসের লীলা লইয়া রসিক কবি রাজকৃষ্ণ সুন্দর খেলা খেলিতেছেন! 'চন্দ্রাবলী' ও 'চতুরালী' দুইখানিই নূতন ধরণের গীতিনাট্য। নাটক দেখিয়া আমোদ উপভোগ ইচ্ছা হইলে আমরা সকলে বীণার 'চন্দ্রাবলী' ও 'চতুরালী' দেখিতে অনুরোধ করি।[১৯৪]

অবশ্য রঙ্গমঞ্চে 'আমোদ উপভোগ' করা যত সহজ, 'কমিক অপেরা' হিসাবে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ তত সহজ নয়। তবে সংগীত রচনায় রাজকৃষ্ণ যে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, তার স্বীকৃতি সাহিত্যের ইতিহাসে মেলে—"রাজকৃষ্ণের নাট্যরচনার মধ্যে কিছু ভাল গান ছড়াইয়া আছে।...প্রচুর গান লিখিয়াছিলেন রাজকৃষ্ণ। ইঁহার নাটকের কোন কোন বাঙ্গালা ও ভাঙ্গা হিন্দী গান একদা লোকের মুখে মুখে ফিরিত। রাজকৃষ্ণের গীত সংগ্রহ-গ্রন্থ দু'টি 'ভারত-গান' (১৮৭৮) ও 'গান' (১৮৮৮)। রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর অনুকরণে রাজকৃষ্ণ ব্রজবুলি পদরচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন।"[১৯৫] তিনি শুধু সংগীত রচনা করতেন তাই নয়, ভালো গান গাইতেন ও সংগীত শিক্ষক হিসাবে তার সুখ্যাতি ছিল। 'চতুরালী'র ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন,—"বাঙ্গলা ভাষায় এ পর্য্যন্ত আদৌ একখানি কৌতুক নাট্যগীতি (Comic Opera) কেহ রচনা করেন নাই, সুতরাং কোন দেশীয় থিয়েটারে অভিনীতও হয় নাই। কিন্তু অভাবটি পূরণ হওয়া উচিত বিবেচনায় আমি সর্ব্বপ্রথমে এই কমিক অপেরা 'চতুরালী' রচনা করিলাম। ইহা মদীয় বীণা থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। ইহার ধরণ কায়দা কারণ প্রভৃতি সমস্তই সম্পূর্ণ নূতন প্রকারের, সুতরাং অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছি। ভগবানের কৃপায় চতুরালী অভিনয় দর্শকমাত্রেরই যারপর নাই নূতন ধরণের তৃপ্তিকর ও আমোদজনক হইয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে আশাতীত সুখের বিষয়।"[১৯৬] 'চতুরালী' ও 'চন্দ্রাবলী'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব এদিক থেকে অবশ্যমান্য,—রাজকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে অনেক বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন—'কৌতুক নাট্যগীতি' প্রবর্ত্তনের গৌরব তিনি দাবি করতে পারেন।

কিন্তু নাটক হিসাবে 'চতুরালী' ও 'চন্দ্রাবলী' অকিঞ্চিৎকর রচনা। 'চতুরালী

বা শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার ব্রজরঙ্গ' নাটিকার প্রধান চরিত্র আয়ান, জটিলা এবং কুটিলা। অর্বাচীন পুরাণ এবং লোকসাহিত্যে এদের নিয়ে বিচিত্র কাহিনী পাওয়া যায়। জটিলা ও কুটিলা সমবেত চেষ্টায় রাধাকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেরা শাস্তি পেয়েছে, তাই নাট্যসংলাপের অন্তিম বাক্যটি হলো "এই যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।" ( ২/৩ ) বলাবাহুল্য নাটিকাটির প্রধান আকর্ষণ কতকগুলি গান, যেমন 'বেলা যে বাড়িয়ে গেলো, কই এলো', 'ধেনু চরাও বেণু বাজাও, ছোড় দেও ছোড় দেও রাই আশা'; 'আয় যাই, ভাই, কানুর সনে,' প্রভৃতি।

'চন্দ্রাবলী বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাবলীর ব্রজরঙ্গ' নাটিকায় 'চতুরালী'র মতোই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার আর এক অধ্যায় সকৌতুক ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। 'চতুরালী'তে কৃষ্ণ ও রাধার মিলনের পথে বাধা আয়ান, জটিলা ও কুটিলা। 'চন্দ্রাবলী'তে ভারুণ্ডা আর গোবর্ধন। তবে এখানে সেই সঙ্গে এসেছে রাধা ও চন্দ্রাবলীর ঈর্ষাতাড়িত সম্পর্ক,—কৃষ্ণের হাত ধরে রাধা ও চন্দ্রাবলীর টানাটানি, নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করলেও কাহিনীর সমাপ্তি দৃশ্যে কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর মিলন নাট্যদ্বন্দ্বের যথার্থ পরিণাম বলে মেনে নেওয়া যায় না। অবশ্য 'চতুরালী'র মতো 'চন্দ্রাবলীরও অন্তিম নীতিবাক্যটি হলো—"বেশ বুঝলুম, কেষ্টকে যে ঠকাতে যাবে, সেই নিজে ঠোকে ঠোকন খাবে"। ( ৩/২ ) অন্যধরনের তত্ত্বের আভাসও আছে, যেমন "ছলনাপূর্ণ সংসারকে ছলনা না কোল্লে তোমায় যে পাওয়া যায় না।" তবে শেষ পর্যন্ত কাহিনীও নয়, চরিত্রও নয়—একমাত্র গানই 'নাট্যগীতি'র প্রধান অবলম্বন ও আকর্ষণ। গানের জন্যই 'চতুরালী' 'চন্দ্রাবলী' একসময় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সেই সঙ্গে কৌতুক সৃষ্টির প্রয়োজনে ঘটনার চমক আর পদে পদে মিল দিয়ে গাঁথা গদ্য-পদ্য সংলাপ সে কালের দর্শকের ভালো লেগেছিল,—কিন্তু এধরনের নাট্যগীতিকে 'অপেরা' বলা সম্ভব নয়।

হীরে মালিনী ( ১৮৯১ ) ॥ 'হীরে মালিনী'কেও রাজকৃষ্ণ 'কৌতুক নাট্যগীতি' নামে অভিহিত করেছেন, কিন্তু 'চতুরালী' 'চন্দ্রাবলী'র তুলনায় এখানে গানের সংখ্যা কম না হলেও তার গুরুত্ব কম। 'হীরে মালিনী' যখন লিখছেন, তখন রাজকৃষ্ণের বীণা থিয়েটার চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন। খবরের কাগজ থেকে জানা যায় যে, ১৮৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর বীণা থিয়েটারে রাজকৃষ্ণের স্বত্বাধীনে শেষ নাটক অভিনীত হয়েছে ভুবনকৃষ্ণ মিত্রের 'দাতা কর্ণ' ও রাজকৃষ্ণের 'হীরে মালিনী'।[১৯৭] হীরে মালিনী চরিত্রাভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী প্রশংসা পেয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে এই 'কৌতুক নাট্যগীতি' সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অনেকবার অভিনয় হয়েছে এমন খবর পাওয়া যায় না। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে 'হীরে মালিনী' রচিত হয়, কিন্তু শুধুই কৌতুকসৃষ্টির উদ্দেশ্যে লেখা বলে সুন্দর বা

মালিনী, কোনো চরিত্রই পরিস্ফুট হয়নি। তুলনায় দুই কোটাল—ফুকন সিং ও ভুখন সিং অনেক বেশি উপভোগ্য ও সার্থক সৃষ্টি। রাজকৃষ্ণের অনেক নাটকেই হিন্দী ভাষায় সংলাপ রচনার প্রয়াস দেখা যায়, তবে 'হীরে মালিনী'তে কোটালদের মুখে হিন্দি শুধু ভাষা বৈশিষ্ট্যের জন্য নয়, কৌতুকসৃষ্টির উপায় হিসাবেও উল্লেখযোগ্য—

ভুখন সিং। এ ফুকন্! ইয়ে হাতিয়ার তোহার কি মোহার?

ফুকন সিং। হামারা হাতমেঁ দিয়া—হামার।

ভুখন সিং। ই কয়সন্ বিচার?

ফুকন সিং। তব তু লে থাপ হাম লেই ত্যলবার।

ভুখন সিং। (সপরিহাসে) বা জী বা! তু বড়া হুঁসিয়ার! তু লেগা চিড়িয়া, হাম লেগা পিঁজরা! বা ইয়ার!

ফুকন সিং। তব্?

ভুখন সিং। বাজারমেঁ বেচ্‌কে যো হোগা দাম; আধা তেরা, আধা মেরা—ইয়ে দোনো কা ইনাম।

ফুকন সিং। আচ্ছা, সোই হোগা। (প্রথম দৃশ্য)

পাঁচটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ 'হীরে মালিনী' কে একাঙ্কিকাও বলা যায়। সুন্দর বর্ধমানে এসে কিভাবে মালিনীর গৃহে আশ্রয় পেল, এইটুকুই বর্ণনীয় বিষয়। তার মধ্যে বোম্-পাগলাকে নিয়ে কৌতুকদৃশ্যের অবতারণা সময়ক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়। আসলে কয়েকটি গান ছাড়া 'হীরে মালিনী'র স্বতন্ত্র কোনো আকর্ষণ নেই, কিন্তু গান থাকলেই তো তাকে 'নাট্যগীতি' বলা যায় না। এখানেই এই জাতীয় রচনার সীমাবদ্ধতা।

## ।। বিবিধ পর্যায়ের কয়েকটি নাটক ।।

পৌরাণিক বা পুরাণাশ্রয়ী নাটক রচনায় রাজকৃষ্ণের আগ্রহ ছিল বেশি, সেখানে তাঁর সিদ্ধিও লক্ষণীয়। বাংলা পৌরাণিক নাটক অধিকাংশ সময় ভক্তিরসাশ্রিত, সম্ভবত সেই একই ভাবপ্রেরণা থেকে লেখা হয়েছে ভক্তিমূলক নাটক। ঐতিহাসিক নাটক লিখলেও তাকে রাজকৃষ্ণের স্বক্ষেত্র বলা যায় না। তুলনায় প্রহসনধর্মী সমাজচিত্র রচনায় তিনি অনেক বেশি সার্থকতা অর্জন করেছেন ; কারণ, শুধু সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকিয়ে প্রহসনগুলি লেখা হয়নি, সেখানে প্রকাশ পেয়েছে নাট্যকারের ব্যাপক অভিজ্ঞতালব্ধ মানবচরিত্র-জ্ঞান এবং স্বতঃস্ফূর্ত পরিহাসরসিকতা। কিন্তু এর বাইরে আছে রাজকৃষ্ণের আরও চারটি নাটক, যাকে ঠিক পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক বলা যাবে না ( যদিও 'লক্ষহীরা'য় পৌরাণিক উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে ), ঐতিহাসিক বলাও হয়তো সংগত হবে না ( যদিও তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মতো এখানেও জনশ্রুতির ব্যবহার লক্ষ্য করি )—ফলে এগুলিকে বিবিধ পর্যায়ের নাটক বলতে হচ্ছে। 'অদ্ভুত ডাকাত' যদি তাঁর লেখা উপন্যাস হয়, তাহলে সেই একই কাহিনী অবলম্বনে তিনি লেখেন 'চমৎকার' নাটক। নাট্যকার নিজেই 'চমৎকার'কে বলেন 'আশ্চর্য-ঘটনা-মূলক-নাটক'। রাজকৃষ্ণের অন্যান্য নাটক থেকে এটিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। 'লক্ষহীরা' ও 'লয়লা মজনু' একই বছরে প্রকাশিত হয়েছে, 'বেনজীর-বদ্রেমুনীর' দু'বছর বাদে : এ দিক থেকে নাটক তিনটির রচনাকালের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান নেই। এই সময়ে রাজকৃষ্ণ বীণা রঙ্গমঞ্চ থেকে স্থায়ীভাবে বিদায় গ্রহণ করেছেন—স্টার রঙ্গমঞ্চে বেতনভোগী নাট্যকার হিসাবে নাটক লিখছেন। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে তখন তিনি বিপর্যস্ত, কিন্তু রাজকৃষ্ণের নাট্য-ধারায় এই তিনটি নাটক শুধু মঞ্চসাফল্যের দিক থেকে নয়, সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবেও সমুচ্চস্থানের অধিকারী।

চমৎকার ( ১৮৮৯ ) ।। বীণা রঙ্গমঞ্চে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ নভেম্বর রাজকৃষ্ণের 'চমৎকার' নাটকের প্রথম অভিনয়কালে নাটকটি দর্শকের মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়। নাট্যসমালোচক 'চমৎকার' নাটকের শুধু অভিনয়ের প্রশংসা করেননি, রচনা-কৌশলের জন্য গ্রন্থকারেরও প্রশংসা করেন,—"সম্প্রতি বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের রঙ্গালয়ে 'চমৎকার' নামে এক নূতন নাটকের অভিনয় হইতেছে। 'চমৎকার' নাটকের ঘটনাকৌশল প্রকৃতই 'চমৎকার' বটে ! এরূপ সুন্দর অথচ স্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশ গ্রন্থকারের বড় অল্প নিপুণতার পরিচায়ক নহে। বিশেষতঃ

অভিনয়াংশে নাটকখানির স্থানে স্থানে বড়ই জমজমা হইয়াছিল। ধনেশ্বর সিংহ রায়ের অভিনয়—বিশেষতঃ দস্যু কর্তৃক অর্থাপহরণের সংবাদপ্রাপ্তির পর, বড়ই সুন্দর ও স্বাভাবিক ; মুদীর দোকান, মুদীর সাজসজ্জা, কথাবার্ত্তা, লুটপাট ব্যাপার, সমস্তই পরিপাটি বলিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা শেষ মিলন দৃশ্য ! সেটিতেই নাটকের সম্পূর্ণ সার্থকতা, সেই দৃশ্যেই চমৎকার !! এ রচনা-কৌশল এক 'অপূর্ব্ব কারাবাস' ব্যতীত আমরা আর কোন পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়া মনেই হয় না। ফলতঃ এরূপ অভিনয়ের আবার সম্পূর্ণ প্রতিপোষণ প্রার্থনা করি।"[১৯৮]

কিন্তু 'চমৎকার' নাটকে আগাগোড়া ঘটনার চমৎকারিত্ব একদা দর্শক ও পাঠককে মোহিত করলেও আধুনিক কালের বিচারে "রচনার দিক দিয়া ইহা একেবারেই ব্যর্থ।"[১৯৯] আসলে রূপকথা ও লোককথা মিলিয়ে 'অদ্ভুত-ঘটনামূলক-নাটক' লেখা যায় না তা নয়, কিন্তু পঞ্চাঙ্ক একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে শুধুই অদ্ভুত ঘটনা পর পর সাজিয়ে গেলে তা যেমন বিশ্বাসযোগ্যতার সীমা অতিক্রম করে, তেমনি কার্যকারণ সংগতিহীন আকস্মিক ঘটনার মালা নাট্যগঠনের দিক থেকে প্রত্যাশিত পরিণাম রচনার পক্ষে বাধা হয়ে ওঠে। বাঘের গুহা থেকে শিশু কন্যাকে উদ্ধার এবং পিতৃব্যগৃহে স্থানলাভ, দেবীচৌধুরাণীর ভবানী পাঠকের মতো 'ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়' সাধনের জন্য ডাকাতি, একই ব্যক্তির একাধিক নামে পরিচিতিলাভ, দুর্বৃত্তের হৃদয়পরিবর্তন এবং দীর্ঘদিন পরে ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের মিলন—অনেকগুলি নাটকের বিষয় হতে পারতো। এর মধ্যে কিছু অংশ নাট্যকারের অভিজ্ঞতালব্ধ হওয়াও সম্ভব—বিশেষত সাম্‌টী গ্রামের জমিদার ধনেশ্বর সিংহ রায়ের চরিত্র। ধনেশ্বরের মতো অত্যাচারী, লোভী, হৃদয়হীন জমিদারকে আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত করে তোলার কৃতিত্ব নাট্যকার দাবি করতে পারেন। রাজকৃষ্ণ সামাজিক নাটক রচনায় সাধারণভাবে আগ্রহ পোষণ করেননি, কিন্তু সমাজজীবন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল বিস্তীর্ণ, পর্যবেক্ষণ শক্তিও ছিল প্রখর। ফলে অদ্ভুত ডাকাতের 'লীলেখেলা' কবিকল্পনার নিদর্শন হিসাবে আপত্তিকর, তা না হলে মধুসূদনপুরের চটীতে জনার্দন মোদক আর তার বালক-ভৃত্য ফোটকে খুবই সপ্রাণ বাস্তব চরিত্র। এই সব ছোট ছোট ছবি আঁকার ক্ষেত্রে রাজকৃষ্ণ সিদ্ধহস্ত। এখানে সংলাপের ভাষাও অনেকটা স্বাভাবিক, যেমন—

জনার্দন। ওরে ফোট্‌কে সন্ধ্যে হলো, দোকানে ধুনো-জল দে। আজ উঠে কার মুখ দেখেছি, কিছুই বিক্কিরি-সিক্কিরি নেই।

ফোট্‌কে। (দোকানে ধুনা-জল দিতে দিতে) আমার জলপানী পয়সাটা দেবে ?

জনার্দন। আ মর্ ছোঁড়া ! একটা পয়সা বিক্কিরি নেই, জলপানী পয়সা দেবে ! চুপ করে ধুনুচী ঘুরো। আমি সন্ধ্যের সময় ঠাকুরদের নাম করি। রামায়ণের পুথিখানা কোথা রে ফোটকে ? (২/২)

লক্ষহীরা ( ১৮৯১ )।। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় নাটক 'লক্ষহীরা' রচনা করেন। এই সময় ( জানুয়ারি ১৮৯১ ) বীণা রঙ্গমঞ্চের অধিকার তিনি হারিয়েছেন, তবে বীণা রঙ্গমঞ্চ যাঁরা ভাড়া নিলেন, সেই ইণ্ডিয়ান থিয়েটার, প্রথম যে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন, সেটি 'লক্ষহীরা'—"ইণ্ডিয়ান থিয়েটার ভূতপূর্ব্ব 'বীণা থিয়েটারে'। সম্প্রতি উক্ত রঙ্গমঞ্চে 'লক্ষহীরা' নামক এক নূতন নাটকের অভিনয় হইতেছে। নাটকখানি কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়েরই লেখনী প্রসূত। এ নাটকখানির অভিনয় দেখিয়া আমরা কিন্তু আশাতীত প্রীত হইয়াছি। এমন কি 'বীণা' রঙ্গমঞ্চে এরূপ সুন্দর অভিনয় আর যে হইয়াছিল, এমনও মনে হয় না। অথচ নাটকখানি বড়ই শিক্ষাপ্রদ—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের দেখিবার পক্ষে আরও উপযোগী। আমরা এ নাটকের সম্যক প্রতিষ্ঠার আশা করি।"[২০০] শুধু ইণ্ডিয়ান থিয়েটার নয়, পরে সিটি থিয়েটার যখন বীণা রঙ্গমঞ্চের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে, তখন সেখানেও 'লক্ষহীরা' বারংবার অভিনীত এবং প্রশংসিত হয়েছে।

'লক্ষহীরা' নাটকের কাহিনী কিছু পরিমাণে পুরাণ থেকে গ্রহণ করা হলেও মুখ্যত একে জনশ্রুতিমূলক নাটক বলাই সংগত। অণীমাণ্ডব্যের কাহিনী পুরাণাশ্রয়ী হলেও কৌশিক-লক্ষহীরার মূল বৃত্তান্তের সঙ্গে পুরাণের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।

নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণ কৌশিক। বারাঙ্গনা-লক্ষহীরার রূপমোহে আকৃষ্ট হয়ে কৌশিক তার সতী স্ত্রী নির্মলাকে বলে "তার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবে কি?" ( ২/২ )। পথ চলতে মশানে শূলবিদ্ধ অণীমাণ্ডব্যের দেহে কৌশিকের পদস্পর্শ ঘটলে তিনি নির্মলাকে বৈধব্যের অভিশাপ দেন। নির্মলা অভিশাপ-মুক্ত হন স্বমহিমায়। এ-কাহিনীর বীজ পুরাণে পাই —"কুশিক বংশে এক কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণ। স্ত্রী শীলাবতী অত্যন্ত পতিব্রতা। একদিন এক পতিতার জন্য ব্রাহ্মণ কামার্ত হয়ে উঠে স্ত্রীকে অনুরোধ করেন সেখানে পৌঁছে দিতে। স্ত্রী স্বামীকে কাঁধে নিয়ে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন। পথে অন্ধকারে শূলবিদ্ধ অণিমাণ্ডব্যের গায়ে উগ্রশ্রবার পা ঠেকে যায়। অন্য মতে পা লাগেনি। উগ্রশ্রবার চরিত্র দেখে অণিমাণ্ডব্য শাপ দেন পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হবে। এই শুনে পতিব্রতা স্ত্রী বলেন তাহলে কাল থেকে আর সূর্যই উঠবে না। ফলে সূর্য না ওঠাতে পৃথিবী নষ্ট হয় দেখে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে যান এবং ব্রহ্মা সকলকে অনসূয়ার কাছে যেতে বলেন। শীলাবতী শাপ তুলে নেন, সূর্য ওঠে, উগ্রশ্রবা মারা যান, অনসূয়া আবার ব্রাহ্মণকে বাঁচিয়ে দেন।"[২০১] কাহিনী অবিকৃত রেখে রাজকৃষ্ণ চরিত্রের নাম পরিবর্তন করেছেন মাত্র। উগ্রশ্রবা হয়েছেন কৌশিক, শীলাবতী রূপান্তরিত নির্মলায়। কৌশিক চরিত্রটির আচরণে প্রথমাবধি তার প্রতি বিরূপতা আসে—সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি তার অমানবিক ব্যবহার, অন্যায় আবদার অসমর্থনীয়। ব্রহ্মার আদেশে মৃত কৌশিককে অমৃতকুণ্ডে ধৌত

করে কুষ্ঠমুক্ত করার পর তার চরিত্রের রূপান্তর আকস্মিক ও অবিশ্বাস্য। যে-বেশ্যা রমণীর প্রতি তার রূপাসক্তি ছিল, তাকেই নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বলেছেন, "এখন তুমি আমার কন্যাস্থানীয়া" (৪/৩)। অলৌকিক এই পরিবর্তন নিতান্তই দেব-কৃপায় ঘটেছে। নাটকের তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে লক্ষহীরাকে 'জ্ঞানগুরু' বলেছেন।

নাটকের অণীমাণ্ডব্য পৌরাণিক চরিত্র। মৌনব্রতী ঊর্ধ্ববাহু এই তপস্বী মৌনব্রত ভঙ্গ না করায় তস্করদের সঙ্গে ধৃত হয়ে রাজাদেশে শূলবিদ্ধ হন, কিন্তু তপঃ প্রভাবে জীবিত থাকেন: পরবর্তীকালে শূলযন্ত্রণা ভোগ করানোর জন্য যমের কাছে কৈফিয়ৎ চান। যমকে বলেন, "তুমি আমার অভিশাপে পৃথিবীতে গিয়ে বিদুর নামে দাসীপুত্র হয়ে কিছুকাল এই অত্যাচারের দণ্ড ভোগ কোরবে।"·· "তবে শোনো, নরলোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোরবে।" (৪/১)। যমকে শূদ্রাদাসীর পুত্র বিদুর হয়ে জন্মানোর অভিশাপ, সেইসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে মুক্তিলাভের আশ্বাসের সমর্থন মেলে পৌরাণিক অভিধানে,— "মাণ্ডব্য বলেন যে, লঘুপাপে দেওয়া গুরুদণ্ড অপরাধে ধর্মকে শূদ্রযোনীতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। অণীমাণ্ডব্যের শাপে ধর্মরাজ বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন।"[২০২] অণীমাণ্ডব্যের জীবিতাবস্থায় যমপুরীতে গমন বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করে। তবে পুরাণ থেকে জানা যায়,—"বেদব্যাসের ঔরসে ও বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বিকার রূপবতী শূদ্রা দাসীর গর্ভে [ ধর্ম ] জন্মগ্রহণ করেন।"[২০৩]

'লক্ষহীরা' নাটকে রাজকৃষ্ণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—সতীনারীর মহিমা কীর্তন। নাটকের আগাগোড়া সীতা, সাবিত্রী, বেহুলার আদর্শে উদ্বুদ্ধ নির্মলা। সে শুধু স্বামীর অন্যায় আকাঙ্ক্ষাকে, আচরণকে মেনে নিয়েছে তাই নয়, কৌশিকের ভালোবাসা-বঞ্চিত হয়েও নিজের প্রেম দিয়ে স্বামীর অসংগত কামনাকে পূর্ণ করতে সচেষ্ট হয়েছে, তাকে নীরোগ জীবন দান করেছে সে। হিন্দুনারীর সতীত্বের আদর্শ প্রচার নাটকের মূলে নিহিত। 'পতি পরম গুরু'—এই তত্ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা চলেছে কৌশিক-নির্মলা চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। সতীত্বের মহিমান্বিত রূপের পরিচয় মেলে 'মশানে'। অণীমাণ্ডব্যের "যে পাপাত্মা আমার ব্রহ্মধ্যান নষ্ট কোল্লে, সে অদ্য রাত্রি প্রভাত হোলেই প্রাণত্যাগ কোরবে।" (৪/২)—এই অভিশাপে কৌশিকের মৃত্যু আসন্ন হলে নির্মলাও মহর্ষিকে অভিশাপ দেয়—"যদি সতী হই আমি, / যদি পতি বিনা নাহি জানি, / তা হ'লে নিশ্চয় রজনী প্রভাত নাহি হবে, / সূর্য্য নাহি দেখা দিবে উদয় অচলে; / বৈধব্যযন্ত্রণা নাহি ঘটিবে আমার।" (৩/৩)। এই দ্বন্দ্বের সমাধান করেন ব্রহ্মা—"ঋষিশাপে স্বামী তব ত্যজিবে জীবন, / আমি জীয়াইব পুনঃ স্বামীরে তোমার, / অন্যথা না হবে অঙ্গীকার। / ক্ষণকাল বিধবা হইবে, / সধবা থাকিবে চিরকাল।" (৩/৩)।

নাটকে সতীত্বের সূত্রে এসেছে ভক্তি। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে চিত্রগুপ্তের কৃষ্ণভক্তি এবং তৃতীয় দৃশ্যে নির্মলার হরি-দুর্গা-ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

নাটকের একমাত্র জীবন্ত চরিত্র লক্ষহীরা। কিংবদন্তীমূলক এ-চরিত্রের রূপান্তর বাস্তবভিত্তিহীন নয়, কাহিনীর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পতিতা রূপবতী রমণীর হৃদয়ে পাপবোধ থেকে আত্মজাগরণ, তার উত্তরণ অনেকাংশে বিশ্বাস্য। তার এই মানস-পরিবর্তন কাহিনীর নাটকীয়তা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। নাটকের শেষে ধর্মপিতা-ধর্মমাতারূপী কৌশিক-নির্মলাকে লক্ষহীরা-প্রদত্ত সমস্ত সম্পত্তি দীন-দারিদ্র মানুষকে দানের প্রস্তাবে নির্মলার মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে, সেইসঙ্গে নাট্যচমক সৃষ্টি হয়েছে।

লয়লা-মজনু ( ১৮৯১ ) ॥ আরব্য-পারস্যের রোমান্টিক কাহিনী নিয়ে গল্প নাটক-উপন্যাস রচনার রীতি বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন প্রচলিত আছে। ১৮৫৩ সালে মহেশচন্দ্র মিত্রের পদ্য-আখ্যায়িকা 'লয়লা-মজনু' লেখা হয়েছিল। তার আটত্রিশ বছর পরে ১৮৯১ সালে একই প্রেম-কাহিনী নিয়ে রাজকৃষ্ণ রায় রচনা করেন 'করুণ রসাত্মিকা গীতিনাটিকা লয়লা মজনু'। পারস্যকাহিনী নিয়ে রাজকৃষ্ণ যে দু'টি গীতিনাটিকা লেখেন, তার মধ্যে কাহিনীর পূর্বপরিচিতি 'লয়লা-মজনু'-কেই অধিকতর জনপ্রিয়তা দান করে।

লয়লা ( লহরী ) ও মজনুর ( কায়েস ) প্রেমকাহিনী বিশ্বখ্যাত। তাদের প্রেমের পথে এসেছে নানা বাধাবিঘ্ন—যার পরিণাম মিলন নয়, চিরবিচ্ছেদ। লয়লার প্রেমে আত্মহারা মজনু যদিও তাকে বলে,—"তব রূপ জ্যোতিমে, / মজনু রে লয়লা, / তেঁই সে মজনু নাম মোর" ( ১/১ ) কিন্তু লয়লার আশঙ্কা—"বাদশার ছেলে তুমি, / বণিকের কন্যা আমি" ( ১/১ )—কিভাবে মিলন সম্ভব। ঘটকিনী জহরার ঘটকালিতে জেদ্দানিবাসী ওমরাহ্ ইবিস্লামের সঙ্গে লয়লার বিবাহ স্থির হয়। লয়লার বিরহে মজনু 'বাউরা' হয়ে বনে বনে ঘোরে। ফকিরের বেশ ধারণ করে প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হতে চায়। কিন্তু শঙ্কিত হয় এই ভেবে—"আমার কারণে লয়লা বিপদে পড়িবে। / পিতৃমাতৃরোষে শেষে হয়তো মরিবে।" ( ১/৩ )। শেষে প্রার্থনা জানায়—"এ জন্মে যদি না ঘটে, / দেহান্তে যেন রে তোরে / বিনা বিঘ্নে পাই।" ( ১/৩ )

এ জন্মে শুধু সামাজিক পরিচিতি নয়, বিঘ্ন ঘটায় ইবিস্লামের মতই কাসেমের বাঁদী মুন্না। কাসেম-কন্যা লয়লার ভালবাসায় প্রধান বাধা সে। কায়েসের প্রতি অনুরক্ত মুন্না লয়লার সঙ্গে তার প্রেমিকের বিচ্ছেদ ঘটায় কূট ষড়যন্ত্র করে। কায়েসকে বিবাহপ্রস্তাব দিলে সে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু কায়েসের ভৃত্য আবদাল্লার ছলনার পরিণামে গাধাবেশী ইবিস্লামের কাছে ধরা পড়ে সে। খলচরিত্র রূপে মুন্না সুচিত্রিত।

মোতিয়া প্রমুখ লয়লার সখীদের সহায়তায় মজনু তার প্রেয়সীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু কাসেমের বিরূপতায় গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয় সে। কাসেমের কন্যার প্রতি আচরণ এবং বাক্য-ব্যবহারে পিতার স্নেহ-বাৎসল্যের প্রকাশ কখনো ঘটেনি। নিজের সন্তানকে 'পিতৃ-মাতৃ-কুল-কলঙ্কিনী', 'কুলটা', 'পিশাচী' বলে তিরস্কার করেছেন। স্ত্রী জোবেদীর ভূমিকাও লয়লার শত্রুর মতো। সে এতই নিষ্ঠুর যে ইবিল্লামকে বিবাহে অসম্মত লয়লাকে বলে—"তোর মত মেয়ে মোর / মরিলেই বাঁচি।"

ইবিল্লাম নিতান্ত অর্বাচীন, মূঢ় চরিত্র। তার আচার-আচরণ সুস্থ, স্বাভাবিক নয়। বড় ওমর বলে সে সকলকে টাকা দিয়ে কিনতে চায়—বাঁদী, সখী, সদাগর-পুত্রী সবাইকেই 'নিকা' করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। আবদাল্লার ছলনার জালে বোকা ইবিল্লাম সহজেই ধরা পড়ে।

নাটকে লয়লার সখী মোতিয়া এবং মজনুর ভৃত্য আবদাল্লা বিশেষ গুরুত্ব পায়। চরিত্র দু'টির পরোপচিকীর্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মজনু প্রেমিক পুরুষ। তার প্রেমপ্রাণতাকে উজ্জ্বল করতে গিয়ে চরিত্রটি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঘটনা তাকে সহজেই বিচলিত করেছে, 'বাউরা' করেছে, 'ফকির' হয়েও প্রেমকে দূরে সরাতে পারেনি, মুন্না তাকে বারংবার বিভ্রান্ত করেছে, মোতিয়াদের সাদর আহ্বান তাকে আকর্ষণ করেছে, লয়লার অনুরোধে কাসেমের গৃহত্যাগ করে ক্ষণপরেই সে কাসেমকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে।

অস্থিরমতি মজনুর পাশে প্রেমে মাতোয়ারা লয়লারও মানসিক চাঞ্চল্য ধরা পড়েছে। লয়লা পিতা-মাতার নির্যাতন, শাসন নীরবে সহ্য করেছে প্রেমিকপুরুষকে ভালোবেসে। তাদের সমস্ত বিধি-নিষেধ মেনে নিলেও প্রেম-জীবনে তাদের হস্তক্ষেপকে মানতে পারেনি। অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে উন্মাদিনী লয়লা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মাঝে অমৃত-মিলনের সন্ধান করেছে। সাগরের শান্ত নীরে খুঁজে পেয়েছে শান্তির জীবন। মজনুও নিজে ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে তার অনুগামী হয়েছে। পরীবাসে তাদের যুগল-মিলন ঘটেছে। মর্ত্যের বিয়োগান্তক কাহিনী পরীস্তানে মিলনান্তক কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে।

'লয়লা-মজনু' নাটকটি আগাগোড়া ছড়ার ছন্দে রচিত। চলিত গদ্য-পদ্য সংলাপের মাঝে মিশেছে হিন্দি ভাষা। ইবিল্লাম-আবদাল্লা সর্বদাই হিন্দিতে কথা বলেছে। আবদাল্লার সঙ্গে কথোপকথনকালে কায়েসকে এবং ইবিল্লামের সঙ্গে বাক্যব্যবহারে মুন্নাকে হিন্দির প্রয়োগ করতে দেখা যায়। রাজকৃষ্ণের এ-ভাষা প্রয়োগে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয়।

'করুণরসাত্মিকা গীতিনাটিকা' 'লয়লা-মজনু' সংগীতবহুল নাটক। মোতিয়া, সাফী, আমিনা, দেলজান প্রমুখ লয়লার সখীরা, ভৃত্য আবদাল্লা, বাঁদী মুন্না, ওমর

ইবিশ্লাম—সকলেই গান গেয়েছে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন মানসিকতা নিয়ে গান গেয়েছে লয়লা-মজনু। নাটকের সমাপ্তি-সংগীতটি হুরী বা পরীদের। অধিকাংশ গানই সময়োপযোগী—ঘটনা পরিবেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তবে লয়লার মৃত্যুতে মজনুর 'হ'ল না এখানে মিলন' গানটির পরিবেশন ঠিক সময়োচিত হয়নি। ইবিশ্লামের আদেশে কাফ্রীসংসদের অদ্ভুত গান বিচিত্র রসের সৃষ্টি করেছে।

'লয়লা-মজনু' নাটকটি সে-কালের দর্শকদের মনোরঞ্জনে কতটা সমর্থ হয়েছিল, তা উপলব্ধি করা যায় অভিনয়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে। প্রথম অভিনয়ের বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—"Rare and Novel Sensation ! / A Play for all Nations ! /Star Theatre / To Night / Saturday, 5th December, At 9 p. m. / The Fascinating New Opera LAILA-MUJNU / Sweet Solos ! Delightful Duets !! Charming Chorus !!! / Carnival of Music and Mirth, / The Temple of Fairies."[২০৪]

১৮৯১ সালের ৫ ডিসেম্বর যে-নাটকের অভিনয় শুরু হয়, পরবর্তী প্রায় পঁয়তাল্লিশ রজনী ধরে সে-নাটক অভিনীত হতে থাকে। এমন কি নাট্যকারের মৃত্যুর পরেও দীর্ঘদিন 'লয়লা-মজনু'র মঞ্চ-সাফল্য রাজকৃষ্ণের পক্ষে কম গৌরবের নয়।

বেনজীর-বদরেমুনীর (১৮৯৩) ॥ পারস্য-কাহিনী অবলম্বনে লেখা রাজকৃষ্ণের গীতিনাটিকা 'বেনজীর-বদরেমুনীর'। স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য নাটকটি ১৮৯৩ সালে তিনি রচনা করেন এবং এবছরই ২৩ ডিসেম্বর 'বেনজীর-বদরেমুনীর' প্রথম অভিনীত হয়। স্টারে অভিনয়ের সূচনাদিবসে পত্রিকায় নাটকটির আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় "House / Thoroughly Repaired, Elegantly Redecorated / and invitingly furnished and upholstered. / Stage / Most attractively embellished / A New Drop Scene / Representing a familiar Calcutta view, the me-/chanic's hand and the painter's brush having been/busy to accomplish their very best. / Wardrobe, / correctly, gracefully and richly replenished. Un-/ remitting attention is being applied to indent new play / Saturday, December, 23rd, at 9 p. m. / New Fairy opera / Benuzeer Badramuneer / Songs ! Sweet ! Graceful ! Humourous !"[২০৫]

উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জন না করলেও রাজকৃষ্ণের জীবিতকালে নাটকটি

নয় বার মঞ্চস্থ হয় এবং মৃত্যুর দিনও ( ১১ মার্চ ১৮৯৪ ) স্টারে এ-নাটকের অভিনয় হয়।

বদরেমুনীর-বেনজীর-মহরুখ্ এবং ফিরোজ শা-মহরুখ-তুরখান্—এই দু'টি ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনীই মর্ত্য, পরীস্তান, প্রেতপুরী—এই ত্রিভুবনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। সেইসঙ্গে বান্দা-বাঁদী মাদারি-ফিরোজা-খসরুকে ঘিরে আর একটি উপকাহিনী রচিত হয়েছে—যা মূল কাহিনীর অগ্রগতিতে সহায়তা করেছে মাত্র। চার অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকে বেনজীর-বদরেমুনীরের পরিণয়ই মূল বিষয়; কিন্তু প্রেমের পথ কণ্টকাস্তীর্ণ। পরীস্তানের ফিরোজ শা'র প্রেমমুগ্ধ মহরুখ্ তাঁর রূপাসক্ত প্রেতরাজ্যের দলপতি তুরখানের কৌশলে মর্ত্যের বেনজীরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে চান। অন্যদিকে ফিরোজ শা এবং তুর্খানও তার পাণিপ্রার্থী। বিরোধ বাধে সেইখানেই। মহরুখ্কে বিবাহে অসম্মত বেনজীরকে পরীরাণী পর্বতগুহায় আবদ্ধ করে রাখেন তুর্খানের পরিকল্পনানুসারে। ফিরোজ শার সহায়তায় বেনজীর মুক্ত হয়—বদরেমুনীরের সঙ্গে মিলিত হয়। মহরুখ্কে পরীস্তান থেকে নির্বাসিত করা হয়।

পারস্য কাহিনীকে বাংলায় নাট্যরূপ দেওয়ার সময়ে তা কিছু পরিমাণে বাংলা রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। আরব্য ও পারস্য কাহিনীর একটা বাস্তবভিত্তি থাকা সম্ভব, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে সংযোজন-সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে তা শিশু-মনোরঞ্জনী চমৎকারিত্বপূর্ণ আখ্যানে পরিণত হয়েছে। রাজকৃষ্ণ বাংলা রঙ্গমঞ্চে এই ধরনের নাটকের সাফল্য দেখে সম্ভবত 'বেনজীর-বদরেমুনীর' লেখেন।

কাহিনী গঠনে ঐক্য বিধানের কোনো প্রয়াস দেখা যায় না। একাধিক উপকাহিনী স্বতন্ত্রভাবে আকর্ষণীয়তা লাভ করেছে। তবে বেনজীর-বদরেমুনীর মূল কাহিনীর গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি। উপকাহিনী মূল কাহিনীর সহায়ক হয়েছে। বেনজীর-বদরেমুনীরের মিলনের পথে নানা বাধা নাটকে আপাতদৃষ্টিতে অতিপ্রাকৃত ঘটনার অবাঞ্ছিত সংযোজন মনে হলেও, রূপকথার কাহিনীর মতো তার মধ্যে রূপক তাৎপর্য সন্ধান করলে অন্যায় হয় না। অগ্নিদহনের মধ্য দিয়ে প্রেমের নিকষিত হেম রূপটি পরিস্ফুট হয়। সেইসঙ্গে মধ্যযুগীয় রোমান্স কাহিনীর দুর্বৃত্তের অবতারণা এবং পোয়েটিক জাস্টিস্ আধুনিক নাট্যকারকে, নাট্যবৃত্তকে বিশেষ রূপ দিতে সাহায্য করেছে। ফলে ঘটনার ঐক্য সর্বদা রক্ষিত না হলেও ভাবের ঐক্য কোথাও ব্যাহত হয়নি।

আরব্য ও পারস্য কাহিনীর আবহ-সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস রাজকৃষ্ণের 'বেনজীর-বদরেমুনীর' নাটকে দেখা যায়। নাটকের বিভিন্ন স্থান নির্দেশকালে নাট্যকার যে নাম ব্যবহার করেছেন, তা পারস্যের পরিবেশকেই মনে জাগায়—যেমন পরীস্তানের আরামবাগ, নয়সাপুরের দিলখোস্বাগ অথবা হলব্শহরের মুবারকবাগ। শুধু

স্থান নয়, পাত্রপাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নাট্যকারের একই মানসিকতা কাজ করেছে। বদরেমুনীর খুব শ্রুতিমধুর নাম না হলেও নাট্যকাহিনীর পরিবেশ অবিকৃত রাখতে পারস্যদেশীয় নামগুলিকেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তাই নায়িকা বদরেমুনীরের পাশাপাশি পাই নায়ক বেনজীরের নাম। এছাড়া ফিরোজ, তুরখান, মাদারি, খসরু বা ফিরোজা, ন্যজমুন্নীসা, কুল্‌সম্‌,—সব চরিত্রেরই নাম স্থানোপযোগী। নাট্য-ঘটনার নিয়ন্ত্রক চরিত্র পরীরাজ্যের রাণী—তার নামও মহরুখ।

নাটকের ঘটনাগুলি অনেকাংশে অবাস্তব। তুর্‌খানের বৃক্ষগাত্রে চিত্র সংলগ্ন করে মহরুখের মানস-পরিবর্তনের চেষ্টা, বিশেষত মহরুখের পাখায় ভ'র করে নিশীথরাত্রে বেনজীরকে পরীরাজ্যে উড়িয়ে নিয়ে আসা বা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় বেনজীরকে বাড়ি পাঠানো অথবা নিজে অদৃশ্য থেকে তাকে অনুসরণ—এ সবই কল্পনার সাহায্যে গড়ে উঠেছে। তবে বান্দা-বাঁদী রূপে মাদারি-ফিরোজা অধিক বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র। তাদের সংলাপ, আচার-আচরণ, পরবর্তীকালে রচিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' নাটকের মর্জিনা-আবদাল্লাকে স্মরণ করায়।

'বেনজীর-বদরেমুনীর' নাটকে সংলাপের ভাষা-ব্যবহারেও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ-নীচ মানুষে ভেদ বোঝাতে অনেক রচনার ক্ষেত্রে যেমন সাধু-চলিত বাক্‌-রীতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, রাজকৃষ্ণ তাঁর এই নাটকে তেমনই যেন বাদশা-রাণী ( মহরুখ্‌-তুরখান্‌-ফিরোজ শা ) অথবা নায়ক-নায়িকার ( বেনজীর-বদরে-মুনীর ) মুখে চলিত গদ্য এবং বান্দা-বাঁদীদের ( মাদারি-ফিরোজা-খসরু ) সংলাপে উর্দু-মিশ্রিত হিন্দির প্রয়োগ করেছেন। আবার পরীরাণী যখন জিন্‌-ভৃত্যের সঙ্গে কথা বলেন, তখন তাঁর চলিত গদ্য পরিবর্তিত হয়ে যায় হিন্দিতে। বান্দা-বাঁদীদের সংলাপের ভাষা নাট্যবিষয়কে পারস্য-পরিবেশোপযোগী করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

'বেনজীর-বদরেমুনীর' গীতিনাটিকা—স্বভাবতই এতে গানের ব্যবহার থাকবে। পরীদের এবং বদরেমুনীরের সখীদের কণ্ঠে গাঁথা হয়েছে গানের মালা। তবে পরীরাণী মহরুখ্‌ বা নায়ক-নায়িকা যে কোনো মানসিক অবস্থাতেই গান গেয়েছে। মিলনান্ত-নাটকটির সমাপ্তিও ঘটেছে মিলন-অনুষ্ঠানে পরীদের সমবেত সংগীতের মধ্যে দিয়ে।

১. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'নাট্যকার' ( ১৩১৭ ) দ্র. গিরিশ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯, পৃ. ৭৪৭।
২. অলোক রায়, 'য়োরোপীয় পুরাণাশ্রয়ী নাটক', সপ্তমামি, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৭০, পৃ. ১৪৩-৪৯।

৩. দ্র. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, প্রথম খণ্ড, ১৩৫৬, পৃ. ৩০৫ ।
৪. Una Ellis-Fermor, *The Frontiers of Drama*, 1964, p. 11.
৫. অহীন্দ্র চৌধুরী, বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র, ১৩৬৫, পৃ. ১১৫-১১৮ ।
৬. Una Ellis-Fermor, *The Frontiers of Drama*, p. 17.
৭. সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, দৃশ্যকাব্য-পরিচয়, ১৯৫০, পৃ. ৩৬৪ ।
৮. শরচ্চন্দ্র দেব, রাজকৃষ্ণ জীবনী, রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯১৫, পৃ. /০ ।
৯. কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত মহাভারত, প্রথম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, পৃ. ৭৬২ ।
১০. পতিব্রতা, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ।
১১. পতিব্রতা, দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য ।
১২. পতিব্রতা, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য ।
১৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, বনপর্ব, ১৯৫ অধ্যায়, পৃ. ৭৬৪ ।
১৪. পতিব্রতা, তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ।
১৫. পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত স্কন্দ-পুরাণ : কাশীখণ্ড, ১৩০৮, পৃ. ১৫ ।
১৬. কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, বনপর্ব, ২৯৭ অধ্যায়, পৃ. ৭৭১ ।
১৭. তদেব, পৃ. ৭৬৮ ।
১৮. পতিব্রতা, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য ।
১৯. পতিব্রতা, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ।
২০. অনলে বিজলী, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ।
২১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ১৩৬৪, পৃ. ৩৯৬ ।
২২. তদেব, পৃ. ৪০১ ।
২৩. তদেব, পৃ. ৪০২ ।
২৪. অনলে বিজলী, চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য ।
২৫. অনলে বিজলী, পঞ্চম অঙ্ক ।
২৬. 'I am of opinion that our dramas should be in Blank-Verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees.'
দ্র. ক্ষেত্র গুপ্ত, কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, ১৩৭০, পৃ. ১৩১ ।
২৭. তারক-সংহার, ষষ্ঠ অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য ।
২৮. কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, ৮৬ অধ্যায়, পৃ. ২৫৩-৫৪ ।
২৯. দ্র. "পদ্মপুরাণ, শিবপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থে তারকবধ ব্যাপার যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই,—একসময়ে তারকাসুর স্বীয়

শক্তিপ্রভাবে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া তারক-নিধনের জন্য তাঁহাদের অপেক্ষা অন্য একজন মহাবীরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোথাও পাইলেন না। অবশেষে সকলে যুক্তি করিয়া ঠিক করিলেন, দেবাদিদেব ঔরসে একটি অনুরূপ পুত্র উৎপন্ন না হইলে, কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। এইরূপ যুক্তির পর ইন্দ্রাদি দেবগণ মদনকর্তৃক মহাযোগমগ্ন মহাদেবের যোগভঙ্গ করাইলেন। তাঁহার রোষানলে মদন ভস্ম হইয়া গেলেন। অনন্তর মহাদেব হিমাদ্রিসুতা গৌরীকে বিবাহ করিলেন। যথাসময় তাঁহার একটি মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইল, তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয়। তিনিই ইন্দ্রাদি অমরগণের সেনাপতি হইয়া তারক প্রভৃতি দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন। মহাবীর কার্ত্তিকেয়ের শক্তিবলে ইন্দ্রাদি সুরগণের পুনর্ব্বার স্বর্গলাভ হইয়াছিল।"

"আমি এই 'তারকসংহার' নাটকে পুরাণোক্ত বর্ণনার কেবল বীজাংশ লইয়াছি। সে বীজাংশ এই ;—ইন্দ্রাদি দেবগণ তারক দৈত্য কর্তৃক সমরে পরাজিত হইলে, মহাদেবের পুত্র কার্ত্তিকেয় তাহাকে সংহার করিয়া অমরগণের স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করিয়া দেন। আমি এতদ্ব্যতীত পৌরাণিক বর্ণনার আর কিছু লই নাই। এই নাটকের ঘটনাসৃষ্টি স্বতন্ত্র। ইহাতে চণ্ড-বিক্রম, সুরসা, শোভনা নূতন সৃষ্টি। দেবসেনা ও শচী পৌরাণিক হইলেও, তারকবধের সময়, পুরাণে তাঁহাদের বিষয় বলা হয় নাই, কিন্তু ইহাতে ঘটনা সাজাইবার জন্য আমাকে বলিতে হইয়াছে। কুম্ভোদর, গোলাক্ষ প্রভৃতি কতিপয় দৈত্যও পৌরাণিক নহে।"

—'বিজ্ঞাপন', তারক-সংহার, ১২৮৭, পৃ. /—১/০।

৩০. পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মৎস্যপুরাণ, ১৩১৬, পৃ. ৫৯৩।

৩১. King Henry the Sixth, part three, Act. 5, Scene. II. *The Tudor Edition of William Shakespeare, The Complete Works*, 1964. p. 695.

৩২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পৃ. ৭৭।

৩৩. হরধনুর্ভঙ্গ, চতুর্থ অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য, পৃ. ১২৪।

৩৪. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পৃ. ৬৭।

৩৫. হরধনুর্ভঙ্গ, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য।

৩৬. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পৃ. ৬৭।

৩৭. হরধনুর্ভঙ্গ, প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

৩৮. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পৃ. ৮২।

৩৯. হরধনুর্ভঙ্গ, পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।

৪০. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পৃ. ৮৩।

৪১. দ্র. বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ৯-১১।

৪২. রামের বনবাস, প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।

৪৩. তুলনীয়: "ঘোর ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে / সেই দোষে কৈকেয়ী প্রমাদ এত করে / পিত্রালয়ে কৈকেয়ী ছিলেন শিশুকালে / করিয়াছিলেন ব্যঙ্গ ব্রাহ্মণের ছলে / তাহাতে জন্মিল ব্রাহ্মণের মনে তাপ / কুপিয়া ব্রাহ্মণ তাঁরে দিল অভিশাপ / দেখিয়া করিস ব্যঙ্গ কহিস কর্কশ / সর্ব্বলোকে গায় যেন তব অপযশ।"—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পৃ. ৯১।

৪৪. রামের বনবাস, তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য।

৪৫. রামের বনবাস, চতুর্থ অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য।

৪৬. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুবাদিত বাল্মীকি রামায়ণ, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৫, পৃ. ২৫২।

৪৭. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পৃ. ১০৮।

৪৮. রামের বনবাস, পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য।

৪৯. যদুবংশ-ধ্বংস, পঞ্চম অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য।

৫০. কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, মৌসলপর্ব, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫১৫-১৬।

৫১. যদুবংশ-ধ্বংস, দ্বিতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য।

৫২. যদুবংশ-ধ্বংস, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

৫৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, মৌসলপর্ব, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫১৬।

৫৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, মৌসলপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৫১৯।

৫৫. তিনকড়ি বিশ্বাস কর্তৃক ভাষান্তরিত সটীক বিষ্ণুপুরাণ, ১৩০৩, পৃ. ২৫১।

৫৬. "যদুরাজ উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না করেই সেই মুষল চূর্ণবিচূর্ণ করে চূর্ণবিশিষ্ট লোহ খণ্ড সমেত সবকিছুই সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কোন এক মাছ সেই চূর্ণ লোহখণ্ড খেয়ে ফেলল এবং অবশিষ্ট চূর্ণাংশগুলি তরঙ্গপ্রবাহে ভেসে এসে সমুদ্রতীরে সংলগ্ন হল। সেগুলি থেকে এরকা নামক এক জাতীয় তৃণ সৃষ্টি হল। যে মাছ লোহখণ্ড গ্রাস করেছিল সেও অন্যান্য মাছের সঙ্গে এক জেলের জালে ধরা পড়ল এবং জেলে তাকে টেনে তীরে তুলল। জরা নামক এক ব্যাধ সেই মাছের পেটের ভিতর লোহ-খণ্ডটি পেয়ে তা দিয়ে তার বাণের অগ্রভাগ নির্মাণ করল।"—শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরফ্ প্রকাশনী, ১৯৭৭, পৃ. ৭৩০। ভাগবতের এই জেলেকে নাট্যকার সুকৌশলে তাঁর নাটকে কাজে লাগিয়েছেন।

৫৭. শ্রীমদ্‌ভাগবত, পৃ. ৮১৫-১৬।

৫৮. "Population increases in geometrical and subsistance an arithmetical proportion only, and [ he ] argued necessiry of 'Checks' on population in order to reduce vice and misery." —*The Concise Dictionary of National Biography*, London, 1920, p. 832.

৫৯. যদুবংশ-ধ্বংস, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

৬০. সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, দৃশ্যকাব্য-পরিচয়, পৃ. ৩৬৭।

৬১. শরচ্চন্দ্র দেব, রাজকৃষ্ণ জীবনী, পৃ. ।/০।

৬২. শিশির বসু, একশ বছরের বাংলা থিয়েটার, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৩, পৃ. ২২৮-২৯।

৬৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পৃ. ৩১৮

৬৪. তরণীসেন-বধ, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য।

৬৫. তরণীসেন-বধ, তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

৬৬. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পৃ. ৩১৯।

৬৭. তরণীসেন-বধ, তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

৬৮. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পৃ. ৩২৪-২৫।

৬৯. তরণীসেন-বধ, পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য।

৭০. "ইহার পূর্ব্বে বঙ্গরঙ্গভূমি তো দুর্দ্দশার চরম অবস্থায় পতিত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কবিবরের এক 'প্রহ্লাদ চরিত্র', নাটকের অভিনয়েই তাঁহারা অজস্র অর্থ পাইয়া পুনরুত্থান লাভ করিলেন।"—'কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়', অনুসন্ধান, ৩০ ফাল্গুন ১৩০০, পৃ. ১০০২।

৭১. দ্র. দেবীপদ ভট্টাচার্য, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ : সাহিত্য-সাধনা', গিরিশ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৭২, পৃ. ১৪-১৫।

৭২. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, গিরিশচন্দ্র, ১৯৩৮, পৃ. ৪৬-৪৭।

৭৩. অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, ১৩৩৪, পৃ. ৩০৬।

৭৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৬০, পৃ. ৫০৯।

৭৫. প্রহ্লাদ-চরিত্র, 'সূচনা' দৃশ্য।

৭৬. রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত শ্রীমদ্‌ভাগবতম্, ষষ্ঠ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১২।

৭৭. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীত-গোবিন্দ, পৃ. ১৪২।

৭৮. বামন-ভিক্ষা, সূচনা, তৃতীয় দৃশ্য।

৭৯. শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরফ প্রকাশনী, পৃ. ৪৩৫ ।
৮০. বামন-ভিক্ষা, চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য ।
৮১. *The Statesman*, June 13, 1885.
৮২. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাল্মীকি রামায়ণ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪৫ ।
৮৩. দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য ।
৮৪. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পৃ. ৩৯ ।
৮৫. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাল্মীকি রামায়ণ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৫০ ।
৮৬. শঙ্কর ভট্টাচার্য, বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান, পৃ. ৫০ ।
৮৭. গঙ্গা-মহিমা, সূচনা দৃশ্য, প্রথমাঙ্ক ।
৮৮. গঙ্গা-মহিমা, সূচনা দৃশ্য, তৃতীয়াঙ্ক ।
৮৯. তিনকড়ি বিশ্বাস, সটীক বিষ্ণুপুরাণ, পৃ. ১৫৯ ।
৯০. গঙ্গা-মহিমা, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ।
৯১. তিনকড়ি বিশ্বাস, সটীক বিষ্ণুপুরাণ, পৃ. ১৫৯ ।
৯২. গঙ্গা-মহিমা, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ।
৯৩. গঙ্গা-মহিমা, তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য ।
৯৪. শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরফ প্রকাশনী. পৃ. ৪৬৭-৬৮ ।
৯৫. গঙ্গা-মহিমা, চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য ।
৯৬. গঙ্গা-মহিমা, চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য ।
৯৭. গঙ্গা-মহিমা, চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ।
৯৮. *The Statesman*, December 10, 1887.
৯৯. স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার মন্তব্যটি ভূমিকায় উদ্ধৃত হয়েছে। দ্র. পৃ. ৯। মনে হয় 'চন্দ্রহাস' নাটকটির সঙ্গে রাজকৃষ্ণের 'নাট্যসম্ভব' একত্রে অভিনয় হয়। তাই 'ভদ্র' চরিত্রের কথা এখানে বলা হচ্ছে।
১০০. চন্দ্রহাস, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য ।
১০১. চন্দ্রহাস, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য ।
১০২. চন্দ্রহাস, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ।
১০৩. চন্দ্রনাথ বসু অনুবাদিত জৈমিনি ভারত, ১৩১৭, পৃ. ৪৪৯ ।
১০৪. চন্দ্রনাথ বসু, জৈমিনি ভারত, পৃ. ৪৫২ ।
১০৫. চন্দ্রনাথ বসু, জৈমিনি ভারত, পৃ. ৪৭১ ।
১০৬. চন্দ্রহাস, দ্বিতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য ।
১০৭. চন্দ্রনাথ বসু, জৈমিনি ভারত, পৃ. ৪৭২ ।
১০৮. চন্দ্রহাস, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ।
১০৯. চন্দ্রহাস, দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য ।

১১০. কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, পৃ. ৬৯৯।
১১১. কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, পৃ. ৭২২।
১১২. কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, পৃ. ৭২৩।
১১৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, পৃ. ৩২।
১১৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, পৃ. ৩৩।
১১৫. 'বিজ্ঞাপন', প্রহ্লাদ-মহিমা বা প্রহ্লাদ চরিত্র—দ্বিতীয় খণ্ড, ( বিজ্ঞাপনের তারিখ ৫ই কার্ত্তিক ১২৯৭ ), পৃ. ৩।
১১৬. শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরফ্ প্রকাশনী, পৃ. ৩৭৭।
১১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পতিতা', কাহিনী, ১৩৬৬, পৃ. ১৪।
১১৮. বুদ্ধদেব বসু, তপস্বী ও তরঙ্গিণী, ১৯৬৬, পৃ. ৬।
১১৯. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাল্মীকি রামায়ণ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৪।
১২০. শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরফ্ প্রকাশনী, পৃ. ৫৬৩।
১২১. শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরফ্ প্রকাশনী, পৃ. ৫৬৫।
১২২. শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরফ্ প্রকাশনী, পৃ. ৫৬৬।
১২৩. শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরফ্ প্রকাশনী, পৃ. ৫৬০।
১২৪. শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরফ প্রকাশনী, পৃ. ৫৬২।
১২৫. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৫, পৃ. ১৯০।
১২৬. কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৯২, পৃ. ৩৯৫।
১২৭. বৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত, রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন্, পৃ. ৮৮।
১২৮. শ্রীচৈতন্যভাগবত, পৃ. ৮৯।
১২৯. শ্রীচৈতন্যভাগবত, পৃ. ৯১।
১৩০. শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৯৬।
১৩১. দিলীপকুমার রায়, ভিখারিণী রাজকন্যা, ১৯৫২, 'ভূমিকা', পৃ. ১।
১৩২. গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী যখন 'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই' ( ১৮৯২ ) লেখেন, তখন তিনিও তাকে বলেন 'ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য'।
১৩৩. James Tod, ***Annals and Antiquities of Rajasthan***, Vol. I, 1971.
১৩৪. উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, তিনকড়ি, বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী, ১৯৮৫, পৃ. ১০৭।
১৩৫. ***The Indian Mirror***, August 27, 1889.
১৩৬. অনুসন্ধান, ১৫ শ্রাবণ, ১২৯৬, পৃ. ২০।

১৩৭. রাজকৃষ্ণ রায়, সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, ১২৯৭, বিশেষ বিজ্ঞাপন, পৃ. ।/০ ।
১৩৮. সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, 'অনুক্রমণিকা,' পৃ. /০ ।
১৩৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ১৯৭০, পৃ. ১১৬ ।
১৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গ্রাম্যসাহিত্য' লোকসাহিত্য, ১৯৭১, পৃ. ৯১ ।
১৪১. সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, পৃ. ৩-৪ ।
১৪২. সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, পৃ. ৭ ।
১৪৩. সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, পৃ ১০ ।
১৪৪. সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, পৃ. ১৪ ।
১৪৫. শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী, জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রিণ্টার্স, পৃ. ১৫ ।
১৪৬. সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, পৃ. ১৫ ।
১৪৭. শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের-পাঁচালী, পৃ. ১৬ ।
১৪৮. সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, পৃ. ১৭ ।
১৪৯. সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, পৃ. ১৯ ।
১৫০. সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, পৃ. ৩১ ।
১৫১. সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, পৃ. ২৩ ।
১৫২. সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা, পৃ. ২২ ।
১৫৩. শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী, পৃ. ৫ ।
১৫৪. শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের পাঁচালী, পৃ. ১৮ ।
১৫৫. শ্রীশ্রীসত্য নারায়ণের পাঁচালী, পৃ. ৮ ।
১৫৬. শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী, পৃ. ৯ ।
১৫৭. শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী, পৃ. ২১ ।
১৫৮. অলোক রায় সম্পাদিত কৃষ্ণকুমারী নাটক, ভূমিকা ১৯৬৯, পৃ. ৩৫ ।
১৫৯. Allardyce Nicoll, *The Theory of Drama*, 1931.
১৬০. মনোমোহন বসু, 'দৃশ্যকাব্য', মধ্যস্থ, পৌষ, ১২৮১ ।
১৬১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭৭, পৃ. ৩৩৫ ।
১৬২. বনোয়ারীলাল রায়, [ ভূমিকা ], জয়াবতী অর্থাৎ চিতোরের ইতিবৃত্ত বিশেষ, ১৮৬৪ ।
১৬৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ৬৬ ।
১৬৪. সুবোধ চৌধুরী, কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসু, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৬৭ ।

১৬৫. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭২, পৃ. ৭।
১৬৬. বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, পৃ. ৯০।
১৬৭. দ্বাত্রিংশ-পুত্তলিকা, কালিদাসের গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৬০, পৃ. ৩৪৫।
১৬৮. বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, পৃ. ৮।
১৬৯. James Tod, ***Annals and Antiquities of Rajasthan***, Vol. I, p. 252-55.
১৭০. শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের 'পান্না', প্রফুল্লময়ী দেবীর 'ধাত্রী পান্না' প্রভৃতি।
১৭১. ***The Indian Mirror***, December 27, 1892.
১৭২. ***Annals and Antiquities of Rajasthan***. p. 253.
১৭৩. ***Indian Daily News***, November 26, 1892.
১৭৪. Joseph T. Shipley, ed., ***Dictionary of World Literature*** 1966, p. 157.
১৭৫. Allardyce Nicoll, ***The Theory of Drama***, 1931, p. 213-14.
১৭৬. 'নূতন গ্রন্থের সমালোচন', বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ, চতুর্থপর্ব, ৫৩ খণ্ড, পৃ. ১১৮।
১৭৭. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড।
১৭৮. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা নাটকের বিবর্তন, ১৯৭৩, পৃ. ৫৯৫।
১৭৯. বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯, পৃ. ৫৭৬।
১৮০. কালীপ্রসন্ন সিংহ, হুতোম প্যাঁচার নক্শা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৩, পৃ. ১০১।
১৮১. J. A. Cuddon, ***A Dictionary of Literary Terms***, Penguin Books, 1985, p. 483.
১৮২. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ, ১৯৬৪, পৃ. ৫২৫।
১৮৩. 'Ballooning in Calcutta past and present', ***National Magazine***. July 1890.
১৮৪. জয়ন্ত গোস্বামী, সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন, ১৯৭৪।
১৮৫. বৈদ্যনাথ শীল, বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা, ১৩৬৯, পৃ. ২১৪।
১৮৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন, ১৯৬৪, পৃ. ২৫৯।
১৮৭. সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, দৃশ্যকাব্য-পরিচয়, পৃ. ৩৭৫।

১৮৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫১৭।

১৮৯. দ্র. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১১।

১৯০. [ ভূমিকা ], পতিব্রতা, রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী, ১৩১৯, পৃ. ৫৬-৫৭।

১৯১. J. A. Cuddon, *A Dictionary of Literary Terms*, Penguin Books, 1985, p. 467-68.

১৯২. *The Statesman*, July 26, 1890.

১৯৩. বাঙ্গালা এক্সচেঞ্জ গেজেট, ১৪ শ্রাবণ ১২৯৭।

১৯৪. নবযুগ, ১৬ শ্রাবণ ১২৯৭।

১৯৫. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬, ৪২০। তবে সুকুমার সেন রাজকৃষ্ণের রচনা বলে যে 'সোমরায়ের পদাবলী' উদ্ধৃত করেছেন তা রাজকৃষ্ণের রচনা নয়। 'বীণা' পত্রিকায় 'সোমরায়ের পদাবলী' প্রকাশকালে রাজকৃষ্ণ লেখেন, "সোমরায় প্রাচীন কি আধুনিক ব্যক্তি, কিম্বা কল্পিত নাম মাত্র, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। যিনি 'কীর্ত্তি' ও 'মুক্তি' নাম্নী কবিতা দুইটি বীণাতে প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন, তাঁহার নাম কি তাহাও জানা গেল না। যাই হউক, প্রেরকের অনুরোধে কবিতা দুইটি বীণায় প্রকাশিত হইল, কিন্তু ভবিষ্যতে তিনি যদি নিজের নাম ও ধাম এবং সোমরায় সম্বন্ধীয় বিবরণ লিখিয়া না পাঠান, তাহা হইলে এরূপ কবিতা বীণায় আর প্রকাশিত হইবে না।"—বীণা, পৌষ ১২৯৩, পৃ. ৯৬-৯৮।

১৯৬. বিজ্ঞাপন, চতুরালী, রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, বসুমতী, পৃ. ৯৫।

১৯৭. দ্র. *The Statesman*, December 17, 1890.

১৯৮. অনুসন্ধান, ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৬, পৃ. ১৮৯।

১৯৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫১৬।

২০০. অনুসন্ধান, ১৫ মাঘ ১২৯৭, পৃ. ২৯১।

২০১. অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৮, পৃ. ১৫৫।

২০২. সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, ১৯৫৮, পৃ. ২৬৮।

[illegible] সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, ১৯৫৮, পৃ. ২৬৭।

২০৪. *Indian Daily News*, December 5, 1891.

২০৫. *Indian Daily News*, December 23, 1893.

# কাব্যধারা

উনিশ শতকে বাংলা কবিতা প্রসঙ্গে ও প্রকরণে দ্রুত পরিবর্তন লাভ করে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একদিকে যেমন প্রাচীন ধারায় কবিগান রচনা করেছেন, তেমনি অন্যদিকে নতুন যুগের পাঠকরুচির দিকে তাকিয়ে কাব্যের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের দেবমাহাত্ম্য-কীর্তনের পরিবর্তে গুপ্ত-কবির রচনায় ঐহিক প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করলো। তবু ঈশ্বর গুপ্তকে বঙ্কিমচন্দ্র 'সেকেলে বাঙ্গালী' বলবেন, এবং জানাবেন ঈশ্বর গুপ্তের মতো "এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না— জন্মিবার যো নাই – জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা 'বৃত্রসংহার' পরিত্যাগ করিয়া 'পৌষপার্বণ' চাই না।"[১] রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক কবি। আখ্যানকাব্যের বহিরঙ্গ আকার রক্ষা করেও তার মধ্যে তাঁরা সঞ্চার করেছেন গীতিকাব্যের প্রাণপ্রবাহ। রঙ্গলালের কাব্যাদর্শের সীমা নির্দেশ কালে মধুসূদন লেখেন "Byron, Moore and Scott form the highest Heaven of poetry in his estimation. I wish he would travel further."[২] কিন্তু মধুসূদন নিজেও একদা ক্র্যাব, কুপার, ক্যামবেল, মূর, বায়রনের কবিতার ভক্ত ছিলেন, এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' লেখার সময়েও চিঠিতে লেখেন, "These men....little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song."[৩] এবং, "there is the wide field of Romantic and Lyric poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way".[৪] আসলে মধুসূদনের মধ্যে এক ধরনের স্ববিরোধ দেখা যায়,—একদিকে বিষয়-সর্বস্ব কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে অমরত্ব লাভের বাসনা, অন্যদিকে বিষয়ী-প্রধান কবিতার সঙ্গে একাত্মতাবোধ। হয়তো এই দ্বিধা উনিশ শতকের বাংলা কাব্য-ধারার সাধারণ লক্ষণ। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তথাকথিত মহাকাব্য লেখার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তাকে তাঁদের স্বক্ষেত্র বলা যায় কি না সন্দেহ। অন্যদিকে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে হেম-নবীন পর্যন্ত কবিদের মধ্যে সাময়িক প্রসঙ্গ অবলম্বনে কবিতা লেখার বিশেষ প্রবণতা দেখা যাবে। উপলক্ষ-প্রধান কবিতা (যেমন নবীনচন্দ্রের 'ভারত-উচ্ছ্বাস', 'ডিউক অফ এডিনবরার প্রতি,' 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বর্গারোহণ' প্রভৃতি) গীতিকবিরাও লিখছেন (যেমন বিহারীলাল লেখেন ১২৭৪ সালের কার্ত্তিকের ঝড়ের বর্ণনা বা ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাসে ধূমকেতু দর্শনের অভিজ্ঞতা), যদিও তা সব সময় কবিতা পদবাচ্য কি না সন্দেহ। ইংরেজি

সাহিত্যে আঠারো শতকের কাব্যধারায় অনুরূপভাবে বস্তুনিষ্ঠার প্রাধান্য দেখা যায়। ফলে অ্যাডিসন, পোপ, গে, জনসন, গোল্ডস্মিথ, এমন কি কলিন্স, কুপার, গ্রে ও ক্র্যাবের কবিতায় 'লিরিক্যাল' ভঙ্গি দেখা গেলেও তাকে যথার্থ 'লিরিক' কবিতা বলা যায় না। সমালোচকের মনে হয়েছে, "What the eighteenth centrury lyric in general lacked was the note of ecstasy, the piercing note of joy or sorrow – 'the lyric cry'. The poets were too sane. To approximate the confines of pure poetry, to escape from the tyranny of reason, one had to be a little mad."[৫] এ কথাগুলি উনিশ শতকের বাঙালি কবিদের রচনা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

তবে ক্রমশ বাঙালি পাঠকসমাজে খণ্ডকবিতা বা গীতিকবিতা জনপ্রিয়তা লাভ করে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'খণ্ড কবিতাবলী' ( ১৮৭০ ) বা নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' ( ১৮৭১ ) সাধারণ পাঠকের প্রশ্রয় লাভ করেছিল বলেই সমসাময়িক অন্যান্য কবিরা এই ধারাই অনুসরণ করেন, যেমন শিবনাথ শাস্ত্রী লেখেন 'পুষ্পমালা' ( ১৮৭৫ ), ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'চিত্তমুকুর' ( ১৮৭৮ ), গোবিন্দচন্দ্র রায় 'গীতি-কবিতা' ( ১৮৮১-৮৩ ), হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'জীবনসঙ্গীত' ( ১৮৭৮ ), নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' ( ১৮৭৫ ), হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী 'দুখসঙ্গিনী'।

রাজকৃষ্ণ রায়ও ঠিক এই সময় কবিতা লিখতে শুরু করেন। রাজকৃষ্ণের তরুণ বয়সের রচনা কাব্যপ্রয়াস হিসাবে অকিঞ্চিৎকর হলেও, যথার্থ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি সেই সময়েই যুগের কাব্য-প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় ( কার্ত্তিক ১২৮৩ ) 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুখসঙ্গিনী' কাব্য তিনটির যে সমালোচনা লেখেন, তার প্রতিপাদ্য ছিল, "গীতিকাব্য যেমন প্রাচীনকালের তেমনি এখনকার, বরং সভ্যতার সঙ্গে তাহা উন্নতি লাভ করিবে, কেন না সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হৃদয় উন্নত হইবে, তেমনি হৃদয়ের চিত্রও উন্নতি লাভ করিবে। নিজের হৃদয় চিত্র করিতে গীতিকাব্যের উৎপত্তি বটে, কিন্তু কেবলমাত্র নিজের হৃদয় চিত্র করা গীতিকাব্যের কার্য নহে ; এখন নিজের ও পরের উভয়ের মনোচিত্রের নিমিত্ত গীতিকাব্য ব্যাপৃত আছে, নহিলে গীতিকাব্যর মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিত না।"[৬] রাজকৃষ্ণের 'অবসর সরোজিনী'র মধ্যে গীতিকাব্যের 'বৈচিত্র্য' লক্ষণীয়, কিন্তু শুধু গীতিকাব্য নয়, সে-কালে প্রচলিত প্রায় সব ধরনের কবিতাই তিনি লিখেছেন, যেমন মনীষী-বন্দনা, সর্গবন্ধ আখ্যায়িকা কাব্য, ঐতিহাসিক বিষয়-বর্ণনা, সাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা বা বিষয়াশ্রয়ী রচনা প্রভৃতি। নাটকের মতো কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্যতা

দেখিয়েছেন। বাঙালি নাট্যকারদের মধ্যে কাব্যরচনায় অনুরূপ আগ্রহ কমই দেখা গিয়েছে (মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখলেও মুখ্যত কবি)। তবে রাজকৃষ্ণ প্রচুর কবিতা লিখলেও, তার খণ্ডাংশ মাত্র কালের বিচারে স্বীকৃতিলাভে সক্ষম হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলী সম্বন্ধে অতি যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "প্রতিকূল অবস্থার জন্য এবং যথোচিত অনুশীলন ও সংযমের অভাবে তাহা প্রতিভার দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠে নাই। তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে ইঁহার কবিতায় যে পরিমাণে স্বতঃস্ফূর্তি ছিল তাহা অনেক সমসাময়িক খ্যাতনামা লেখকের রচনায় পাই নাই।"[৭]

॥ স্মরণ ও বরণ ॥

"'বঙ্গভূষণ' [ জানুয়ারি ১৮৭৪ ] কাব্যে প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মাদিগের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে।"[৮] বলাবাহুল্য, প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালি মহাপুরুষ বা মনীষীদের মহিমা কীর্তনের পিছনে কাজ করেছে এক ধরনের আত্মশ্লাঘাবোধ। যে আত্মগ্লানি থেকে কবি একদা 'ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি' লেখেন, এখানে যেন তারই প্রত্যুত্তর মেলে।—"যে দেশে জন্ম এবং যে দেশের অন্নে দেহ পুষ্টি সংসাধন হইতেছে, সে দেশের পূর্ব্বাপর দেশ ও জাতি-গৌরব-স্বরূপ গুণীদিগের বিষয় অবগত হইতে সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা।"[৮] কিন্তু শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের আগ্রহে কবিকে যেমন অত্যুক্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে, তেমনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'মহাত্মা'দের সঙ্গে স্থান দিতে হয়েছে এমন অনেক ব্যক্তিকে, যাঁদের 'বঙ্গভূষণ' বলা যায় কি না সন্দেহ। ভারতচন্দ্র রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র অথবা চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম, বিশ্বনাথ কবিরাজ বাংলা দেশের ইতিহাসে যে স্থান অধিকার করে আছেন, মাধব কর, বিজয় রক্ষিত, ভরত মল্লিক, দাড়িম্বা দেবী, ভৈরবনাথ সান্যাল, ক্ষেত্রমোহন বসাক কখনও সে স্থান দাবি করতে পারেন না। ফলে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় সংগত কারণেই মন্তব্য করা হয়, "এই ৬৭ জনই 'মহাত্মা' বলিয়া স্মরণীয় হইবার যোগ্য, আমরা এমত বিবেচনা করি না। ইহার মধ্যে অনেককে আমরা চিনি না।"[৯] 'বঙ্গভূষণ' কাব্যের সমালোচনাকালে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকাতেও প্রায় একই কথা লেখা হয়, "The poet has however followed no plan as to time or division of subjects. The names do not occur in chronological order, while some of them might fitly have been omitted altogether."[১০]

কিন্তু রাজকৃষ্ণ মনে হয় বঙ্গভূষণের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বেশি আগ্রহী ছিলেন,

তাই ভূমিকায় লেখেন, "আমার ন্যায় স্বল্পধীসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক যে সমুদয় বঙ্গদেশ-তিলক মৃত মহাত্মাগণের বিষয় একেবারে সংগৃহীত হইতে পারে, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাহা হউক, বারান্তরে, অপরাপর যে সকল মৃত মহাত্মাদিগের গুণাবলী সংগ্রহ করিতে পারিব, তদ্দ্বারা বঙ্গভূষণের কলেবর বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট রহিলাম।"[৮] বলাবাহুল্য, কলেবরবৃদ্ধি কোনো কাব্যের উৎকর্ষবৃদ্ধির সহায়ক নয়। রাজকৃষ্ণ দ্রুত কবিতা লিখতেন, কিন্তু অনেক সময়ই দ্রুততা হয়ে উঠতো প্রথানুসরণ কিংবা অসংযমের দৃষ্টান্ত। যেমন 'পণ্ডিতবর ভরত মল্লিক'-এর প্রশস্তি রচনাকালে তিনি লেখেন—"অতীব ধীমান্ তুমি ছিলে টীকাকার। / বুদ্ধির সাগর ছিল মস্তিষ্ক ভিতরে / তোমার, যেমতি সুবিশাল পারাবার / মুকুতা প্রভৃতি ধনে ধরায় বিহরে। / দুর্ভেদ্য প্রাচীর যথা তোপের গোলায় / বিদ্ধ হয়, সেইরূপ তব জ্ঞান বল / দুর্জ্ঞেয় সাহিত্য-শ্লোক করেছে সরল, / বিদ্যার্থী অনাসে পশে ঘুষিয়া তোমায়। / টীকা রচি ঘুচাইলে বচনের ভার, / তাই ত সকলে গায় প্রশংসা তোমার।"[১১] ভরত মল্লিকের প্রশংসা গান কে করেন জানা নেই, কিন্তু রাজকৃষ্ণের এই কবিতার প্রশংসা করা কঠিন। এখানে শব্দনির্বাচনে ও ব্যবহারে অসতর্কতা, অলংকার ব্যবহারে বালসুলভ চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস, সর্বোপরি মাইকেল মধুসূদনের প্রবহমান পয়ারের অক্ষম অনুকরণ—রাজকৃষ্ণের তরুণ বয়সের ( সম্ভবত তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ) কাব্যরচনার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করাই সংগত।

তবে 'বঙ্গভূষণ' কাব্যটি একটি কারণে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়তা দাবি করতে পারে—মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র ( ১৮৬৬ ) অনুকরণে সে-কালে যাঁরা বাংলায় সনেট লেখার চেষ্টা করেন, রাজকৃষ্ণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'বঙ্গদর্শনে'র সমালোচক জানিয়েছেন, "কবিতাগুলিতে বিশেষ কবিত্ব নাই কিন্তু পদ্যবিন্যাসে কতকটা ইংরেজি সনেটের মত হইয়াছে। সনেটের অনুকরণে চতুর্দ্দশপদী কবিতার সৃষ্টি, কিন্তু উভয়ে চৌদ্দ ছত্র থাকা ভিন্ন সনেটে ও চতুর্দ্দশপদীতে অন্য সাদৃশ্য বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গভূষণে কিঞ্চিৎ আছে।"[৯] মহাত্মা বা মনীষীদের নিয়ে মাইকেল মধুসূদনও সনেট লিখেছেন ( যেমন, বাল্মীকি, কালিদাস, জয়দেব, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ), এবং কাব্যমূল্যের দিক থেকে অবশ্যই তার সঙ্গে 'বঙ্গভূষণ' তুলনীয় নয়, কিন্তু সনেটের আঙ্গিক ব্যবহারে রাজকৃষ্ণের সাফল্য 'কিঞ্চিতের' কিছু বেশি। উনিশ শতকের বাংলা সনেট নিয়ে বিশদ আলোচনাকালে আধুনিক সমালোচক দেখিয়েছেন,—

"শিল্পরীতির দিক দিয়ে রাজকৃষ্ণ মধুসূদনের আদর্শ কতকটা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি রামদাস সেনের মতো সাতটি মিত্রাক্ষর দ্বিপদীর দ্বারা সনেট রচনায় অগ্রসর হননি। তাঁর চতুর্দ্দশপদীগুলিতে মিলের বৈচিত্র্য আছে তবে

পেত্রার্কীয় ও সেক্‌সপীরীয় সনেটের মিলের ছক নির্দ্দিষ্টভাবে অনুসরণ করার কোনো চেষ্টা করেননি।...

"কতকগুলি সনেটে ৭টি মিল থাকলেও ৬টি মিলের দ্বারা সনেট রচনার চেষ্টা অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়। অবশ্য তাঁর মিলের সংখ্যা ৬-এর নিচে নামেনি এবং সেদিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব মধুসূদনের চেয়ে অধিকতর।"[১২]

রাজকৃষ্ণ সর্বদা নিয়মানুগ সনেট লেখেননি সত্য ( বিশেষত উপযুক্ত ছেদ-চিহ্ন ব্যবহৃত না হওয়ায় এবং এক চতুষ্কের ভাব অন্য চতুষ্কে প্রবাহিত হওয়ায় তাঁর সনেটে চতুষ্কগুলি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেনি ), কিন্তু অন্তত কয়েকটি সনেটে শুধু নিয়মানুসরণ নয়—ভাবপ্রেরণার সঙ্গে বহিরবয়বের সংগতি সাধনে তিনি আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছেন। যেমন—

"কবিতা-কুসুম-বনে ভ্রম নিরন্তর ক
কবিতা-প্রসূনরাজি তুলিয়া যতনে খ
ছন্দোডোরে গাঁথিলে হে হার মনোহর, ক
পরিল বাঙ্গলা তাহা হরষিত মনে। খ
পড়িয়া ভাবুক হয় ভাবেতে মগন, গ
অতি সুমধুর ভাব তব কবিতায় ঘ
ঝরণার ধারা সম নিয়ত ক্ষরণ গ
হইয়া কবিতা তব শ্রবণ জুড়ায় ঘ
যেমতি আছিলে কবি, তেমতি আবার প
সম্পাদকীয়তা করি সাধি দেশ-হিত ফ
রাখিলে অক্ষুণ্ণ নাম; যথা হিম-ধার প
হিমালয় গিরি-শিরে চির অবারিত। ফ
অকালে কালের গ্রাসে যদি না পশিতে, চ
তা হলে দেশের হিত আরো হে সাধিতে!"[১৩] চ

ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায় রাজকৃষ্ণের এই সনেটটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "এই কবিতাটি মিলের দিক থেকে নিখুঁত ( 'নিরন্তর' ও 'আবার'-এ নামমাত্র পৃথক মিল আছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য, এই ধরনের নামমাত্র পৃথক মিলের উদাহরণ মধুসূদনের সনেটেও আছে। ) প্রতি চতুষ্কের শেষেই পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হওয়ায় চতুষ্ক-গঠনেও ত্রুটি নেই। তিনটি চতুষ্কের মধ্য দিয়ে ভাব পয়ার-গুচ্ছের logical deduction-এর দিকে সহজভাবেই এগিয়ে গেছে। বস্তুতঃ এটি সাংগঠনিক লক্ষণ ও অন্তরঙ্গ স্বভাবের দিক থেকে রাজকৃষ্ণের একটি উৎকৃষ্ট সনেট। শেক্‌সপীরীয় সনেট রচনায় এতটা নৈপুণ্যের পরিচয় মধুসূদনের সমশ্রেণীর উৎকৃষ্ট সনেটগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না।"[১২]

সনেটের মতো 'এলিজি' বা শোককাব্যও বাংলা সাহিত্যে বিদেশাগত। তবে ইংরেজি সাহিত্য 'এলিজি'-শিল্পরূপটি যেভাবে বিশিষ্ট কাব্যপ্রকরণ হিসাবে ব্যাপক প্রসার ও উৎকর্ষ লাভ করেছে, বাংলা সাহিত্যে যে কোনো কারণেই হোক তা ঘটে নি। বিদেশি এলিজির সাধারণ লক্ষণ হলো—"A lyric, usually formal in tone and diction, suggested either by the death of an actual person or by the poet's contemplation of the tragic aspects of life. In either case, the emotion, originally expressed as a lament, finds consolation in the contemplation of some permanent principle."[১৪]

রাজকৃষ্ণ যখন কোনো বরেণ্য ব্যক্তির তিরোধানে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তখন তাকে ব্যাপক অর্থে এলিজি বলা গেলেও, তার মধ্যে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কোনো গভীর জিজ্ঞাসা বা উপলব্ধি প্রকাশ পায় না। একমাত্র 'স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর' (অবসর-সরোজিনী, দ্বিতীয় ভাগ) কবিতায় এলিজির কিছু লক্ষণ দেখা যায়। কবিতাটির প্রথম পাঁচটি স্তবকে 'মনুষ্যত্ব কি?' এবং 'মানব-জীবন'-এর পরিণাম কি?—এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। কবি অনুভব করেছেন, "যেরূপ গভীর প্রশ্ন, উত্তরো ইহার; / সেরূপ গভীর; / জলবিম্ব-সম নর / ভ্রমিতেছে নিরন্তর / হইয়া অস্থির, / অনন্ত অসীম ভীম কাল-পারাবারে; / এই আছে এই নাই, / আবার নিরখি যাই,—/এই দেখি—এই নাই গভীর আঁধারে!" কবিতার পরবর্তী দশটি স্তবক 'শাখা—শোকোচ্ছ্বাস' বলে চিহ্নিত, যেখানে কালীনারায়ণের মৃত্যুতে 'তাঁরি স্পষ্ট বঙ্গভূমি শোকাশ্রুপ্লাবিতা!' কবিতার শেষ তিনটি স্তবকে 'পুরস্কার' শিরোনামায় স্বর্গলোকে কালীনারায়ণের অভ্যর্থনা ও 'রাজ-পুরস্কার' লাভ বর্ণিত হয়েছে। কবিতা হিসাবে তেমন উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলা না গেলেও শোককবিতা হিসাবে রচনাটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

'স্বর্গীয় কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত' (অবসর-সরোজিনী, প্রথম ভাগ) কবিতাটি কবির 'পরলোক প্রাপ্তির দিবসে লিখিত' বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু তার ফলে শোকের তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয় না। রাজকৃষ্ণ যেন এখানে কবিপ্রসিদ্ধি অনুসরণে মধুসূদন-বিয়োগে ভারতজননীর বেদনার কাব্যরূপ দিয়েছেন। তবে মধুসূদনের কবি-ভাষার ব্যবহারে রাজকৃষ্ণের কৃতিত্বের পরিচয় মেলে, যেমন "রতন-ভাণ্ডার লুঠি ক্রূর দস্যুগণ / সর্বস্ব যদিও লয়, কি দুঃখ তাহায়? / কিম্বা সেনাদলে লয়ে / সমরসজ্জিত হয়ে / অন্য ভূপ আর ভূপ-রাজ্যে যদি যায়, / করে সব ছারখার করি মহারণ।"

'স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর' (অবসর-সরোজিনী, দ্বিতীয় ভাগ) কবিতাও প্রথানুসরণ মাত্র—দীনবন্ধুর সবগুলি গ্রন্থের তালিকা-রচনা তথ্যসংগ্রহ

হিসাবে মূল্যবান হলেও, শোককবিতা রচনার পক্ষে অপরিহার্য ছিল না। আসলে এ ধরনের কবিতা অধিকাংশ সময় সাংবাদিকতার নিদর্শন। তুলনায় 'স্বর্গীয় ধন্বন্তরিকল্প রমানাথ সেন কবিরাজ' (অবসর-সরোজিনী, দ্বিতীয়ভাগ) কবিতাটি অনেক হৃদয়স্পর্শী এবং সেই জন্যই কিছু পরিমাণে শিল্পসার্থক। তবে নীতিবাক্য উচ্চারণের আগ্রহ এই ধরনের কবিতার শেষরক্ষার পথে প্রধান বাধা, যেমন—" 'সুরাপান করিও না' এ আদেশ দিয়ে/কিন্তু যারা নিজে মাতে সুরা-বিষ্ঠা খেয়ে, / সুরা মোক্ষ, সুরা ধর্ম্ম / সুরাপান নিত্যকর্ম্ম / যাদের, এরূপ পাপী নাহিক যথায়, / যাও তুমি, হে ধার্ম্মিক! যাও গো তথায়।"

'অবসর-সরোজিনী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কবিতা বাদ দিলে রাজকৃষ্ণের আর একটি কাব্যগ্রন্থ 'শোক কবিতা' তথা এলিজি রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে—'কেশব-বিয়োগ' (১৮৮৪)। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর 'কেশবচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী'-সহ রাজকৃষ্ণ কাব্যটি লেখেন। ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন, "সূর্য্য ডুবিল, সম্মুখে ঘোর অন্ধকার হইল, কিন্তু সেই নিমগ্ন সূর্য্যের চিরোজ্জ্বল কিরণে দূরে-সুদূরে আমার হৃদয় ও অন্তরের বহুদূরে স্মৃতি-তারকা ফুটিয়া উঠিল। সেই তারকার আভা এই 'কেশব-বিয়োগ'।"[১৫] কেশবচন্দ্রকে কবি যেমন স্মরণ করেছেন তাঁর কবিতায়, তেমনি তাঁকে বরণ করেছেন গদ্যে ও পদ্যে। এদিক থেকে 'কেশব-বিয়োগ'কে কেশব-স্তুতি বলা যেতে পারে। রাজকৃষ্ণের শোক হয়তো আন্তরিক, কিন্তু শোকের কাব্যরূপটি অনেক পরিমাণে প্রথানুগ। তিনি চারদিকে শুনছেন 'হা কেশব!—হা কেশব!' ধ্বনি। পৃথিবীর পাপীদের উদ্ধার করে কেশব এখন যেন পৃথিবীর পরপারে মহাপাপীদের উদ্ধার করতে চলে গেছেন। কেশবকে দিয়ে রাজকৃষ্ণ হরিনাম করিয়েছেন—মর্ত্যে কেশব এসেছিলেন 'হরিনামে পাপ ধরা নিষ্পাপ করিতে।' তারপর 'শ্মশানে' এবং 'রোদন' অংশে একদিকে কুগ্রহের কুলক্ষণ দর্শন, অন্যদিকে চতুর্দিকে ক্রন্দনধ্বনির অনুরণন বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটি শেষ হয়েছে স্বর্গে ত্রিলোকপতি হরির সঙ্গে কেশবের মিলন বর্ণনায়, স্বর্গের দ্বারপ্রান্তে কেশবকে দেখতে পেয়ে হরি ছুটে এসে—" 'কেশব! আয় আয়' / বলিয়া নিলা কোলে, / বসিল যোগিবর হরির বাম কোলে / 'চৈতন্য! আয় আয়' / চৈতন্য ধেয়ে যায়, / বসিল ডান কোলে / দুজনে হরি বলে / 'চৈতন্য মহাযোগী, কেশব মহাযোগী / উভয়ে হরিদাস, হরির প্রিয় ছেলে' / বলিলা নিজে হরি / সকলে বলে 'হরি' / ভরিল সুরপুরী মধুর হরিবোলে।" বলাবাহুল্য ভক্তিরস পরিবেশনের এই আগ্রহ 'কেশব-বিয়োগ'কে মঙ্গলকাব্যের সমধর্মী করে তুলেছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ অবলম্বনে লেখা কবিতাকে নবীনচন্দ্র সেন 'হুজুগে কবিতা' বলেছিলেন।[১৬] সাংবাদিকতার অঙ্গ হিসাবে এ ধরনের রচনার উপযোগিতা স্বীকার্য। নবীনচন্দ্র 'হুজুগে কবিতা' নিয়ে ব্যঙ্গ করলেও, নিজে এমন কবিতা লিখেছেন অনেক, এবং ভারতবর্ষে যুবরাজের আগমন উপলক্ষে কবিতা লিখে ক্রাউন পারফিউমারি কোম্পানির কাছ থেকে পঞ্চাশ গিনি পুরস্কার পেঁয়ে বেশ গর্ব অনুভব করেছেন। হেমচন্দ্রের জীবনীকার জানিয়েছেন, "ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ( তখন যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্ ) এই সময়ে এদেশে শুভাগমন করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সেরাপিস্ নামক অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ইনি প্রথমে বোম্বাই নগরে পদার্পণ করেন। পরে ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া উক্ত বৎসর ২৩শে ডিসেম্বর দিবসে রাজধানী কলিকাতায় উপস্থিত হন। যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমনোপলক্ষে প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ প্রায় সকল কবিই কবিতাদি রচনা করিয়া রাজভক্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন।"[১৭] হেমচন্দ্রের 'ভারতভিক্ষা' এই উপলক্ষে লেখা হলেও কবিপ্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হিসাবে একটি অসামান্য কবিতা। রাজকৃষ্ণের 'ভারতে যুবরাজ' ( ১৮৭৫ ) হেম-নবীনের কবিতার প্রতিস্পর্ধী না হলেও কয়েকটি কারণে উল্লেখযোগ্য রচনা। 'ভূমিকা'য় রাজকৃষ্ণ লিখেছেন, "ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র—ভারতবর্ষের ভাবি-ভূপতি ভারতবর্ষে শুভাগমন করিতেছেন শুনিয়া আমি একটি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি।...যে উদ্দেশ্যে এই 'ভারতে যুবরাজ' বিরচিত হইয়া সাধারণ সমক্ষে প্রকাশিত হইল, যদি দৈবানুগ্রহে তাহার শতাংশের একাংশও সফল হয়, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম ও আশা যুগপৎ সফল হইবে।"[১৮] যুবরাজের আগমন উপলক্ষে রাজভক্তির প্রকাশ ছিল স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু নবীনচন্দ্রের রাজভক্তির সঙ্গে হেমচন্দ্রের রাজভক্তির যেমন পার্থক্য আছে,—রাজকৃষ্ণের রাজভক্তির স্বাতন্ত্র্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাজকৃষ্ণ যখন লেখেন,—"এস এস যুবরাজ, রাজকুলধন, / হেরিতে তোমায় / বহুদিন আশা ছিল, আজি *বিধি পুরাইল, / এমন সুদিন ভাগ্যে হয় কি ঘটন?"* তখন বিষয় বা বর্ণনা প্রথাসিদ্ধ। কিন্তু সে সময়ে ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকায় যখন ভারতবাসীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ ওঠে, ক্ষুব্ধ রাজকৃষ্ণ তখন তীব্রভাষায় তার প্রতিবাদ করেন—"যে ভারতবাসী তোমারে পাইয়া ; / 'জয়' রব তুলে গগন ছাইয়া ; / কোন্ মূঢ় বলে রাজদ্রোহী তারা? / রাজদ্রোহী বলে, রাজদ্রোহী যারা। / ভূপে যারা ভাবে দেবের মতন / তারা রাজদ্রোহী—এ কথা কেমন? / রাজদ্রোহী—হলে তব আগমনে / কেন সুখী হবে হসিত বদনে?" আসলে রাজকৃষ্ণ উপলক্ষ-প্রধান কবিতা লিখলেও তিনি তার মধ্যে এক ধরনের আবেগ সঞ্চার করতে সক্ষম

হয়েছেন, যা সাময়িক কবিতার কৃত্রিমতা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। এই প্রসঙ্গে 'অবসর-সরোজিনী' তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত প্রিন্স পঞ্চক অর্থাৎ প্রিন্স অফ ওয়েল্সের ভারতবর্ষে শুভাগমনোপলক্ষে 'পঞ্চগীতোপহার' উল্লেখ করা যায়। অন্যদিকে 'পূর্ব্ব প্রবন্ধটি [অর্থাৎ ভারতে যুবরাজ] লিখিত হইবার কিছুদিন পরে'[১৯] কবি 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ড' নামে একটি কবিতা লেখেন, যেখানে ভারত-মাতাকে ভগিনী সম্বোধনে ইংলণ্ডেশ্বরী আশা আশ্বাস দান করেছেন যার মধ্যে শুধু নাটকীয়তা নয়, কবির ইতিহাসবোধেরও পরিচয় মেলে।

'অবসর-সরোজিনী' কাব্যে সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা আরও কতকগুলি কবিতা স্থান পেয়েছে, যেমন 'বৃটিশ কীর্ত্তি', 'ভারত ভাগ্য', 'মহাভিক্ষা', 'বিদায়-সঙ্গীত', 'কুমারী রমাবাই', 'দানবী নদী', 'বালিকা প্রতিভা' প্রভৃতি। উনিশ শতকে ইংরেজ শাসন ভারতবাসীর কাছে একদিকে যেমন দেবতার আশীর্বাদ বলে মনে হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে শাসকের কাছ থেকে পাওয়া রূঢ়-কঠিন নিত্য অভিজ্ঞতা ক্ষোভ ও বেদনার কারণ হয়ে উঠেছিল। রাজকৃষ্ণের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার মধ্যে পরিণতবুদ্ধি বা দূরদৃষ্টির সন্ধান করে লাভ নেই, তবে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করলে অন্যায় হবে না। রাজভক্তি প্রকাশে তিনি যেমন সোৎসাহী, তেমনি রাজার কাজকর্মের সমালোচনাতেও তিনি সোচ্চার। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বরোদার রাজা মল্হর রাও গায়কোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতি সমগ্র ভারতবর্ষে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'মুখার্জীস ম্যাগাজিনে' ইংরেজ শাসকের সুপরিকল্পিত চক্রান্তের মুখোস যেভাবে খুলে ধরেন[২০] রাজকৃষ্ণের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'বৃটিশ কীর্ত্তি' কবিতায় তিনি যেভাবে, যে ভাষায় ভারতবাসীর বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তা সে যুগে খুব সুলভ ছিল না —"বৃটন! তোমার মনের বাসনা / ক্রমে পূরাইছ বাকী কি বল না, / ভারতজননী স্বাধীন ললনা / তোমার শাসনে শাসিত ক্রমে। / ফিকিরে চতুর তোমার মতন / কে আছে জগতে? দেখি না তেমন; / ফাঁকি দিয়ে শুধু স্বকীয় শাসন / স্থাপিত করিলে ভারত-ভূমে!...এবার আবার বরদাভিনয় / জগতবাসীর নয়নে উদয়, / ইংরাজের ইহা কীর্ত্তি সুনিশ্চয় / যশের পতাকা উড়িল পুন! / জয় জয় জয় বৃটনের জয় / ন্যায়পরতার সূক্ষ্ম পরিচয় / বিচিত্র বিচার, খ্যাতি দেশময় / গাও সবে শ্বেতজাতির গুণ।" এখানে শ্লেষ ও ব্যঙ্গ এমনই তীক্ষ্ণমুখ, এবং হয়তো কখনো অসংযত, যে জন্য বসুমতী প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে কবিতাটি পুনর্মুদ্রণকালে অনেক শব্দ বর্জিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশ যখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে (১৮৭৬) ক্লিষ্ট এবং "ক্ষুধায় জঠর জ্বলিয়া উঠিল / দুর্ভিক্ষের ভয়ে অন্ন নাহি মিলে; / শত শত লোক শুকায়ে মরিল, / ভাসে দুই রাজ্য নয়ন-সলিলে!" তখন ইংলণ্ডেশ্বরী

ভিক্টোরিয়ার 'সম্রাজ্ঞী' (এম্প্রেস) উপাধি গ্রহণের জন্য আয়োজিত দরবারে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়—বাঙালি কবিকে প্রতিবাদ জ্ঞাপনে উত্তেজিত করেছে—"উপাধি লভিয়া কীর্ত্তি রাখিবারে / কেন, ভিকটোরিয়ে, হইলে বিহ্বলা ? / এ যে কীর্ত্তি নয়—কলঙ্কের ভারে / চির তরে তোমা করিল অচলা !" (ভারত-ভাগ্য, অবসর-সরোজিনী, দ্বিতীয় ভাগ)। 'বীণা' নামে কবিতার মধ্যেও এই একই উপলক্ষে জাতির মর্মবেদনা প্রকাশ করেছেন কবি—"ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী ভিক্টোরিয়া, / কেন নিরদয় দয়া বিসর্জিয়া ? / 'এম্প্রেস অফ ইণ্ডিয়া' উপাধি গ্রহণ, / করিছ কেন গো এ হেন কালে ? / এত দেখে শুনে করুণা হল না ? / এ কেমন, রাজ্ঞি, তোমার বাসনা ? / ভারতের নেত্র সলিলে ভাসিছে, / তব ওষ্ঠাধর আনন্দে হাসিছে ; / এ ঘটনা কভু দেখে নি নয়ন, / এ ঘটনা কর্ণ করে নি শ্রবণ ; / তব রাজ্যে এই অদ্ভুত ঘটন, / ইতিহাসে লেখা রবে চিরন্তন।"

শুধু বিদেশি শাসক নয়, স্বদেশি 'মহারাজা'র দেশদ্রোহী ভূমিকাও রাজকৃষ্ণের কশাঘাত লাভ করেছে। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করার সময়ে গভর্নর জেনারেলের পার্শ্বদ্‌দের মধ্যে একজন বাঙালিও ছিলেন, যাঁর উদ্দেশে কবি লেখেন—"সেই পাণ্ডুলিপি যে চক্ষে দেখিয়া, / পরমতে মত মিলাইয়া দিলে, / বল, মহারাজ ! বল, কি করিয়া / ভাসালে না তারে শোকের সলিলে ? / সে পবিত্র কর, বল কি করিয়া, / আঘাতিলে নাহি আপন মাথায় ?" ('মহাভিক্ষা', অবসর-সরোজিনী, দ্বিতীয়ভাগ)। তারপর 'ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব দেবসদৃশ গবর্ণর জেনারেল লর্ড রিপন মহোদয় কর্ত্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালোপী এই সর্ব্বনাশকর আইন পঞ্চত্বলাভ করিয়াছে—১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে।' ('মহাভিক্ষা' কবিতার পাদটীকা)। লিটনের প্রতি ভারতবাসী যেমন বিরূপতা পোষণ করেছে, রিপনের প্রতি তেমনই অনুরাগ প্রকাশ করেছে। 'অবসর-সরোজিনী' কাব্যের তৃতীয় ভাগে স্থান পেয়েছে রিপনের ভারতবর্ষ থেকে বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে লেখা 'বিদায়-সঙ্গীত'—কীর্তনাঙ্গ একটি গান।

বসুমতী-প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলীর চতুর্থ ভাগে 'সাময়িক কবিতা' শিরোনামায় তিনটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছে—'আবার ছাব্বিশে', 'বাঘের মুখে মেষ' এবং 'বড় সুখে রেখে গেলে'। কবিতাগুলি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা প্রবাসকালে লেখা। ঢাকায় টর্নাডোর বর্ণনায় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও বিরোধের উল্লেখ আকস্মিক মনে হলেও, ঘটনাটির ঐতিহাসিক ও সামাজিক তাৎপর্য আছে। তবে 'বড় সুখে রেখে গেলে' কবিতাটি ভাব-ভাষা-ছন্দের একাত্মতায় সাময়িক প্রসঙ্গের কবিতার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—"বড় সুখে রেখে গেলে, মনে গাঁথা রবে / কি জাগ্রত, কি স্বপনে, / জেগে তুমি রবে মনে, / জপমালা সম জিহ্বা তব নাম লবে ॥ / ব্যঞ্জন খাবার কালে / নুনশূন্য ঝোলে ঝালে / আলুনির স্বাদে, প্রভু ! তুমি দেখা দিবে। /

পেট্রোলিয়ম করে / আলো না জ্বলিবে ঘরে ; / আঁধারে ভারতবাসী তোমারে ভজিবে ॥ / ইনকম ট্যাকসের সুখে তোমারে তুলিয়া বুকে, / নাচিবে ভারতবাসী দিবস-রজনী, / ভাল সুখে রেখে গেলে, ওহে গুণমণি ॥" নাম উল্লেখ না করলেও স্পষ্টই বোঝা যায়, 'গুণমণি' হলেন, গভর্নর জেনারেল আর্ল অফ্ ডাফ্‌রিন।

॥ দেশপ্রেম ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ॥

উনিশ শতকে বাঙালি কবির ইতিহাসচেতনা, আধুনিককালে অস্বচ্ছ দৃষ্টি ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোভঙ্গির নিদর্শন বলে মনে হতে পারে। অন্যদিকে যে স্বদেশপ্রেম ভ্রান্ত ইতিহাসচেতনা চালিত, তার পক্ষে বিদেশি শাসকের প্রশস্তি রচনা এবং পরাধীনতার বেদনাপ্রকাশ—একই সঙ্গে সম্ভব। সেইজন্য ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালকে স্বাজাত্যবোধের উদ্‌গাতা বলার সময় তাঁদের দ্বিধাবিভক্ত চিত্তের কথাও বলতে হবে। ঈশ্বর গুপ্ত বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুরকে স্নেহ করার কথা বলেন সত্য, অথবা বলেন "স্বদেশের প্রেম যত / সেই মাত্র অবগত / বিদেশেতে অধিবাস যার।"[২১] কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর কণ্ঠেই শোনা যায়—"ভারতের প্রিয় পুত্র, হিন্দু সমুদয় / মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিসের জয়।…পুড়ুক বিপক্ষদল, মনের অনলে / উড়ুক ব্রিটিস-ধ্বজা সমুদয় স্থলে।"[২২]

রাজকৃষ্ণের একাধিক কবিতায় ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। যার সব চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত 'কালচক্র'। 'কালচক্র' কাব্যে দু'টি কবিতা স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে প্রথমটি আকারে দীর্ঘ—'বেলীগারদ লখ্‌নৌ'। কবিতার পাদটীকায় কবি জানিয়েছেন, "আমি বাং ১২৭৯ সালের শীত ঋতুতে লখনৌ নগরে ছিলাম। ঐ সময়ে ময়মনসিংহের অন্যতম প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ও তথায় ভ্রমণার্থ গমন করেন। তিনি আমাকে উক্ত স্থান সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা লিখিতে বলেন। তদনন্তর আমি এই পদ্য প্রবন্ধটি রচনা করিয়া তদীয় নিবাসস্থান ময়মনসিংহে তাঁহার নিকট প্রেরণ করি।"[২৩] এই ধরনের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ অবলম্বনে কবিতা রচনায় নবীনচন্দ্র সেন বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। রাজকৃষ্ণের পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রশংসনীয় হলেও ইতিহাসচেতনার অভাব তাঁর রচনাকে যথার্থ ঐতিহাসিক কাব্যের তাৎপর্য দেয়নি। সেই সঙ্গে ভাষা ও শব্দব্যবহারে রাজকৃষ্ণ কিছুটা অসতর্ক, যে জন্য তাঁর কাব্য মনে হয় ভাবাতিশয্যময়, আবার কখনো মধুসূদনের অনুসরণ প্রয়াসের জন্য 'কালচক্রের'র মতো রচনাকে মনে হয় কৃত্রিম—

"কারু-কর-কৃত-কারু / দেখিলাম নহে কা'রু, / সবি কাল গ্রাসিয়াছে, হায়! / সিপাহী বিদ্রোহ-কালে, / এ সব নেশেছে কালে, / এ কালে কি আছে শোভা

আর। / এবে দেখিবারে পাই, / ভগ্নশেষ ঠাঁই ঠাঁই / দুখে হয় হৃদয় বিদার।"[২৪]

কিংবা,

"ব্রিটনীয় মহাবল সেনাদল-পতি / হেন্‌রি লরেন্স বীর সমরে সুমতি, / বিদ্রোহ সময়ে তিনি স্বদল সহিত / আছিলেন যে ভবনে ডরে লুক্কায়িত, / ( যেন রে ভস্মের মাঝে প্রখর অনল, / অথবা বিবরে বিষধর মহাবল। )"[২৫]

সিপাহী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে কবির মনোভাব খুবই কৌতুককর। সিপাহীদের অত্যাচার বর্ণনায় তিনি উৎসাহ বোধ করেছেন—"ননীর পুতুলী মত, বালক বালিকা যত" এবং "ইংরাজের কত নারী পীড়ন সহিতে নারি প্রাণ দিল সিপাহীর করে।"[২৬] সিপাহীদের তিনি বারবার ধিক্‌কার জানিয়েছেন। তবে সেই সঙ্গে কবি দেখেছেন "অনন্ত কালের চক্রে ঘুরিছে সকল।" এই কালচক্রের রহস্যোদ্‌ঘাটনে তাঁর আগ্রহ নেই—তিনি ইংরাজ শাসনকেই কালের বিধান বলে গ্রহণ করেছেন, যদিও "আরো কি হইবে পরে—কে জানে সন্ধান?"[২৭]

'কালচক্রে'র দ্বিতীয় কবিতাটি হলো 'ছত্রমঞ্জিল—লখনৌ'। এখানে ওয়াজিদ আলি শা'কে একদিকে 'কামাতুর রাজা', বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং মদনোপাসনার অনিবার্য পরিণাম হিসাবে "রাজ্য, ধন, বল সবি গেল তাঁর, / নিভিল নামের উজল জ্যোতি"[২৮] জানানো হয়েছে, অন্যদিকে সেই সঙ্গে পাদটীকায় রজনীকান্ত গুপ্তের 'ভারতের ইতিহাস—ইংরেজ রাজত্ব' বই থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে—"সেই সময়ের ইঙ্গরেজ-শাসিত দেশের সহিত তুলনা করিলে সপ্রমাণ হইবে যে, অযোধ্যায় এরূপ অরাজকতা ঘটে নাই, এবং এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার ও অবিচারও হয় নাই।"[২৮]

এর সঙ্গে রাজকৃষ্ণের 'ভারত-সান্ত্বনা' পাশাপাশি রেখে পড়লে তাঁর তথাকথিত ইতিহাসচেতনার স্বরূপ স্পষ্ট হবে। 'ভারত-সান্ত্বনা' নামে 'কবিতাত্মক দৃশ্যরূপক'-টিকে সমালোচকদের মধ্যে একজন ঐতিহাসিক নাটক নামে অভিহিত করেছেন।[২৯] কিন্তু 'ভারত-সান্ত্বনা'কে রাজকৃষ্ণের নাট্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তিনটি অতি ক্ষুদ্র দৃশ্যে রূপক কাব্যের আধারে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম দৃশ্যে সমুদ্র বক্ষে নৌকারোহণে ভারতমাতার প্রবেশ এবং সরোদনে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি করে একটি গীত, এবং গানটি শেষ হলে "সহসা আকাশে 'মাভৈ মাভৈঃ' শব্দ ও দুইজন ব্রহ্মদূতের অবতরণ এবং পতনোন্মুখী ভারতমাতাকে লইয়া শূন্যে অন্তর্ধান।"[৩০] দ্বিতীয় দৃশ্যে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা কর্তৃক ভারতমাতাকে আশ্বাসদান এবং ঐক্য ও সাহসকে ভারতবর্ষে প্রেরণ। তৃতীয় দৃশ্যে হিমালয় পর্বততলে নিবিড় বনে ঐক্য ও সাহসের ভারতবাসীর উদ্দেশে আকাশবাণী এবং ভারতসন্তানগণের পর্বতে ওঠার পুনঃপুনঃ প্রয়াস ও ভূতলে পতন। 'ভারত-সান্ত্বনা'কে নাটক বলা সম্ভব নয়, বড়ো জোর নাট্যকাব্য বলা যায়। তবে কাহিনী বা চরিত্র কোনো কিছুই, স্বল্প পরিসরে

হলেও, যতটা পূর্ণতা পাওয়ার কথা তা পায়নি। অন্যদিকে 'ভারত-সান্ত্বনা'কে ঐতিহাসিক নাটক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ, আখ্যাপত্রে কবি জানিয়েছেন, "ভারতের শেষ নরপতি পৃথ্বুরাজ যবনগণ কর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইলে ভারত পরাধীন হয়। সেই পরাধীন অবস্থায় শতবর্ষ ব্যাপী সময়ের ভারত লইয়া এই 'ভারত সান্ত্বনা' রচিত হইল।"৩০ কিন্তু কবিতাটির সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই। যে কোনো পরাধীন দেশের দুর্দশা বর্ণনা এবং ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি লাভের স্বপ্ন কবিতাটির মধ্যে সন্ধান করা যেতে পারে। ভারতমাতা, ব্রহ্মা, সাহস, ঐক্য প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলা অসংগত, এবং 'দৃশ্যরূপক'টির মধ্যে কোথাও 'পৃথ্বুরাজ' বা 'যবন'দের উল্লেখ না থাকায় দেশকালের স্পর্শ বর্জিত এইরচনা স্বদেশপ্রেমমূলক রূপক কবিতা হিসাবেই বিচার্য।

'ভারত-ভাগ্য' (১৮৭৭) নামে বারো পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি দেখার সুযোগ না হলেও, রাজকৃষ্ণের 'ভারত-গান' (১৮৭৯) নামে গ্রন্থটিতে 'ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় এক শত গানে'র মধ্য দিয়ে তাঁর ভারতচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে মূল সুর বিলাপ—"জাগায়ো না ভারতেরে সখা হে আমার, / জাগিলে ভারত, শোক জাগিবে আবার।" তবে সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ স্বপ্নও কোথাও কোথাও প্রকাশ পেয়েছে—"যাও, নিদ্রা! যাও ছাড়ি / যা রে অনৈক্য, ছাড়ি দেশ, / যা রে বিলাস, হয়ে লীন, / যা রে স্বার্থ দর্প দ্বেষ।" 'অবসর-সরোজিনী'র একাধিক কবিতাতেও এই একই সুর ধ্বনিত হয়েছে, যথা 'ভারত-বিলাপ-গীতিকা' (মনে হয় 'ভারত-সান্ত্বনা'র বীজ এই কবিতাটির মধ্যে ছিল), 'কালের শৃঙ্গবাদন', 'উদ্দীপনা' প্রভৃতি।

### ।। আখ্যানের ক্ষীণ সূত্র ।।

শুধু মধ্যযুগে আখ্যায়িকা কাব্য লেখা হয়েছে তাই নয়, উনিশ শতকেও আখ্যায়িকা কাব্য রচনার ধারা অব্যাহত। তবে একদা যা ছিল দেবমাহাত্ম্য-প্রচারের বাহন, এখন তা কখনও ইতিহাসাশ্রয়ী, কখনও বা প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা কাব্য বলে পরিচিত। তারপর উনিশ শতকের শেষভাগে আখ্যায়িকা কাব্যের ভাবগত ও গঠনরীতিগত আবার পরিবর্তন দেখা গেল, যাকে সমালোচকেরা 'গাথা কাব্য' নামে অভিহিত করেছেন। এর বৈশিষ্ট্য—"সংবেদনশীল মানব-মনকে এগুলি সহজেই অভিভূত করে। কাব্যগুলির ভিতর গীতিকাব্যের আবেগ উচ্ছ্বাস কিছু রহিয়াছে, কিন্তু কবির ব্যক্তিমানসের অনুভূতির স্পষ্ট প্রকাশ নাই। কবি ইহাতে কাব্যের পশ্চাতে থাকিয়া কাহিনীর ভিতর দিয়া নিজ ভাবানুভূতির গতি নির্দেশ করেন। গীতিকাব্যের সঙ্গে এই স্থানেই গাথাকাব্যের পার্থক্য।…অন্যান্য

কাহিনী—কাব্যে ঘটনার বাহুল্য ও জটিলতা, বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ও সংঘাত, মানব-ভাগ্যচক্রের উত্থান-পতনের বিচিত্র বর্ণসম্ভার প্রভৃতি চিত্রিত হইয়া কাহিনীকে পরিণতির দিকে লইয়া যায়। গাথাকাব্যে এই জটিলতা ও বাহুল্য, এই বিচিত্র অনুভূতি ও বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশের স্থান কম। সেখানে একটি অনুভূতি, আবেগ বা উচ্ছ্বাসের তীব্রতা সহজ, সরল ভাষার মধ্য দিয়া সমস্ত কাহিনীর মধ্যে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে এবং কাহিনীর অগ্রগতি বিধান করে।"[৩১] ইংরেজিতে অনেক সময় এগুলিকে 'মেট্রিক্যাল রোমান্স' নামে অভিহিত করা হয়। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' (১৮৭৪), রবীন্দ্রনাথের 'কবি-কাহিনী' (১৮৭৮) ও 'বনফুল' (১৮৮০) এবং ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' (১৮৮১) কাব্যে আখ্যান ধারা অনুসরণে রোমান্টিক কবিমনের প্রকাশ ঘটেছে। রাজকৃষ্ণের 'নিভৃত নিবাস' (১৮৭৮) কাব্যকে আমরা এই ধারার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। ক্ষীণ কাহিনী-সূত্র কাব্যকে সর্গবদ্ধ আখ্যান-কাব্যের আকৃতি দিলেও আখ্যানকাব্য লেখা রাজকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল না। এদিক থেকে বিহারীলালের কাব্যের মতো 'নিভৃত নিবাসে' নিসর্গপ্রকৃতির সবিশেষ গুরুত্ব সত্ত্বেও কাব্যটি শেষ পর্যন্ত বিষয়ী-প্রধান অর্থাৎ 'সাবজেকটিভ' রচনার নিদর্শন। তবে রাজকৃষ্ণের নিসর্গদৃষ্টির মধ্যে যেমন কোনো অসামান্যতা দেখা যায় না, তেমনি মানবজীবন ও মানবসমাজ পর্যালোচনার আগ্রহ সত্ত্বেও সেখানে কোনো অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন মেলে না। আসলে এই ধরনের কবিতায় রোমান্টিক ইম্যাজিনেসনের পরিবর্তে রোমান্টিক ফ্যান্সির উন্মার্গগামী বিস্তার, তার মধ্যে এক ধরনের অগভীর দার্শনিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, যা আধুনিক পাঠকের কাছে আপত্তিকর বিবেচিত হবে।

'নিভৃত নিবাস' কাব্যপরিকল্পনায় পূর্বাপর সংগতি নেই। কাব্যের প্রথম সর্গ 'নিশীথ-চিন্তা' (১৮৭৭) নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশকালে লালবিহারী দে কাব্যটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—"These 'Night Thoughts' are good, and the language in which they are conveyed is adequate to them. The poet ought to have had too high an appreciation of his own divine art to submit his performance to the judgment of a prose-critic however competent."[৩২] কালীপ্রসন্ন ঘোষকে 'নিশীথ-চিন্তা' উৎসর্গকালে রাজকৃষ্ণ লেখেন, "যে করে 'প্রভাত চিন্তা' করিলে সৃজন / সে করে 'নিশীথ চিন্তা' করিনু অর্পণ।" তবে নামটুকু ছাড়া কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধগ্রন্থের সঙ্গে রাজকৃষ্ণের কাব্যের কোনো সাদৃশ্য নেই। 'নিশীথ-চিন্তা'র ভূমিকা থেকে আমরা জানি "এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচনা করিয়া অনেক দিন পরে মুদ্রাঙ্কন করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সহসা তাহা করিতে সাহস হয় নাই।" অর্থাৎ কাব্যটি রচনা ও মুদ্রণের মধ্যে যথেষ্ট কালগত ব্যবধান

আছে। পরে 'নিভৃত নিবাস' গ্রন্থ প্রকাশের সময় রাজকৃষ্ণ জানান, "নিভৃত, নিবাসের এই সর্গটি [ প্রথম সর্গ ] নিশীথ চিন্তা নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার একত্রে প্রকাশ করা গেল।" কিন্তু 'নিভৃত নিবাসে'র পরবর্তী আটটি সর্গের সঙ্গে প্রথম সর্গ 'নিশীথ-চিন্তা'র কোনো ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। 'নিশীথ-চিন্তা'র মধ্যে জাহ্নবী নদী ও নদীতীরস্থ নিসর্গপ্রকৃতির বর্ণনা স্বতন্ত্রভাবে কখনও পাঠককে আকর্ষণ করতে পারে—"আপনি আপন মনে করিয়া কল্পনা, / প্রদোষের নানাবিধ রঙ সুরঞ্জিত / ছবিগুলি মুছি' ফেলি', প্রকৃতি ললনা / কাল রঙে নীলাকাশ করে বিলেপিত; / কখন আপন মনে উজ্জ্বল বরণে / আঁকে শশী সে আঁধারে; বিলীন আঁধার; / কভু হীরকের খণ্ড—অসংখ্য গণনে—/ আঁকে সে আঁধারে;—দৃশ্য অতি চমৎকার / অন্ধকার যেইরূপ; সেই রূপই থাকে, / অথচ হীরক-খণ্ড জলে ঝাঁকে ঝাঁকে।" কিন্তু নিসর্গবর্ণনাও কবির উদ্দেশ্য নয়, তিনি চান সমাজদর্শন রচনা করতে। সমাজে ধনীদরিদ্রের বিচিত্র অবস্থান বর্ণনা প্রসঙ্গেই আসে বিদ্যাবত্তা প্রদর্শনের সুযোগ—"গৌতম, কণাদ, মিল, কোমৎ, হামিল্টন / ইত্যাদি দর্শনবিৎ পণ্ডিতনিচয় / নারিল বাসনা মোর করিতে পূরণ! / কিসের দর্শনবিৎ?—বাজে কথা কয়! / নিদ্রিত শিশুর সহ তোমার ঘটন / যে বলিবে—মোর মতে বিজ্ঞ সেই জন।"

'নিভৃত নিবাসে'র পরবর্তী আটটি সর্গকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন কবি। প্রথম পাঁচটি সর্গ 'প্রথম খণ্ড' আকারে প্রকাশিত হয়। শেষ চারটি সর্গ অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি—পরে 'গ্রন্থাবলী'তে প্রথম খণ্ডের সঙ্গে একত্রে স্থান পেয়েছে। 'নিভৃত নিবাসে'র দ্বিতীয় সর্গের নাম 'জীবন-সংশয়'। প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই কাহিনীর সূচনা। রোগশয্যায় শায়িতা মুমূর্ষু নলিনীর একমাত্র ভরসা 'জীবন-ঈশ্বর' বিজয়। তার অসুস্থতার সূত্র ধরে কবি নানা প্রাণঘাতী ব্যাধির বর্ণনায় অগ্রসর হয়েছেন, যদিও বাঙালির দুর্গতি ও বিনাশের কারণ শেষ পর্যন্ত দৈহিক ব্যাধি নয়—কবি 'অধীনতা-ব্যাধি'র কথা ভেবেই বেশি দুশ্চিন্তিত। ( এইভাবে দ্রুত প্রসঙ্গান্তর রাজকৃষ্ণের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য )। কাব্যের পরবর্তী সর্গে জানতে পারা যায়, দারিদ্র্য নলিনীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে। শোকে মূর্ছিত বিজয় মোহের ঘোরে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে দেখে—স্বর্গের দেবীরা নলিনীকে মর্ত্য থেকে স্বর্গে নিয়ে চলেছে। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের পর প্রিয়ার প্রাণহীন দেহ দর্শনে সে কাতর হয়ে পড়ে। রাত্রি অবসানে অরুণোদয়—আর সেখানেই 'চিরপ্রস্থান' নামে তৃতীয় সর্গের সমাপ্তি। চতুর্থ সর্গের সূচনা হয়েছে প্রভাতের নিসর্গপ্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে। এ-সর্গের নাম 'বিলাপ'। মৃতা নলিনীর জন্য বিজয়ের শোকবিহ্বলতার প্রকাশ ঘটেছে এখানে। প্রিয়তমার মৃত্যুতে বিজয়ের মুখে বিলাপবাক্য উচ্চারিত হয়েছে। পঞ্চম সর্গে কল্পনায় বিজয় ও নলিনীর

মিলন। চিরন্তন এ-বিচ্ছেদ বিজয়কে যন্ত্রণাক্লিষ্ট করে তুলেছে। প্রেয়সীর বিয়োগ-ব্যথায় সে প্রলাপোচ্চারণ করেছে। বাহ্যজগৎ-বিস্মৃতি এখানে লক্ষণীয়। জীবিত-কালে নলিনী বহির্জগৎ বিমুখ ছিল, বিজয়ও তাকে অন্য কারও সংস্পর্শে আসতে দেয়নি—তাকে একান্ত আপন, অন্তরের ধন করে রেখেছিল। তাই মৃত্যুর পরে একাই তাকে নিয়ে শ্মশানযাত্রা করলো। তাই এ-সর্গের নাম 'শ্মশানযাত্রা'। এই পাঁচটি সর্গ নিয়ে কাব্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে সাময়িক পত্রে মন্তব্য করা হয়—

"Properly speaking, here commences the real story ; for the end, however, we must wait till a future occasion. The book not being finished yet, it would be unwise to pronounce a judgment upon it. But we should observe that the first part is beautiful, and displays considerable powers of the author."[৩৩]

ষষ্ঠ সর্গের নাম 'শ্মশান প্রবেশ'। নলিনীর শব স্কন্ধে বহন করে বিজয় শ্মশানে আসে। কবির মনে হয়েছে শ্মশানের অন্য নাম স্বর্গধাম, কারণ শ্মশানেই মানুষের ইহজীবনের সমাপ্তি, আর এখানেই স্বর্গের প্রবেশপথ। কাহিনী-সূত্র ছেড়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সূচনা হলো। সপ্তম সর্গ তাই 'জীবন রহস্য' নামে অভিহিত হয়েছে। নলিনী 'নির্জীব জীবন' নিয়ে বেঁচে ছিল, মৃত্যুপারে সে পেল 'জীবন্ত জীবন'। কবির কাছে মানবজীবনের রহস্যভেদ হলো। 'ঐশিকী চিন্তা' নামে অষ্টম সর্গে মূল কাহিনীর আর বিশেষ কোনো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। নলিনীর প্রাণ-টুকু কেড়ে নিয়ে বিজয়কে কেন দুঃখ দিলেন—এ প্রশ্ন জেগেছে কবির মনে। জীবন মৃত্যু ও ঈশ্বর—তিনটি প্রসঙ্গকে এইভাবে মেলাবার চেষ্টা দেখা গেছে। নবম অর্থাৎ অন্তিম সর্গে বিজয়-নলিনী কাহিনীর পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। গঙ্গাবক্ষে বিজয় প্রিয়তমা নলিনীকে ভাসিয়ে দিতে এসেছিল। ভেবেছিল নদীর শীতল কোলে নলিনীর শেষ আশ্রয় মিলবে। কিন্তু চোখের জলে সে অনুভব করলো ইহলোক-পরলোকে ভিন্নতা নেই—ইহজগতেই সন্ধান পাওয়া যেতে পারে পরপারের। কাব্যশেষে শোকোন্মাদ বিজয় নলিনীকে বুকে নিয়ে অশ্বত্থগাছে উঠে সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়েছে নদীতে—"এতেক কহিয়া যুবা, নলিনীর মৃতদেহ, জোরে চাপি আপন হৃদয়ে, সম্বোধিয়া কহিল গঙ্গারে ;— / 'কোথা গো মা, পরলোক ? তোমারি নিভৃত কোলে, ওই কোলে লও মা আমারে। / ওই কোল পরলোকে, থাকিব আমরা দোঁহে, স্বর্গ নাই ওই কোল বই, এইরূপ আমার বিশ্বাস ; / এ লোকে নরকভোগ, না চাহি থাকিতে হেথা, এ লোকের কোলে কোলাহল ; তোর কোল নিভৃত নিবাস'।"[৩৪] এই ভাবে নবম সর্গের তথা কাব্যের নামকরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'নিভৃত নিবাস' কাব্যে কাহিনীর ক্ষীণ সূত্র থাকলেও একে নিশীথ-চিন্তা বলা এক হিসাবে বেশি সংগত। বিচিত্র বিষয়ে কবির গভীর ও অগভীর চিন্তার সমাবেশ ঘটেছে এখানে। তবে তার মধ্যে মৌলিকতার সন্ধান করে লাভ নেই। রাত্রি, অশ্রু, সতী, স্বার্থপরতা, প্রণয়, শ্মশান—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবিকল্পনায় তার বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়। রাজকৃষ্ণ বিশ্বসাহিত্যের প্রাঙ্গণ থেকে তুলে এনেছেন তারই কিছু অনুপম বর্ণনাময় ভাবচিত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসাই প্রবল হয়েছে। শ্মশান সম্বন্ধে মানুষের ভীতি থাকলেও, সেখানেই সকলের গতি। কবির শ্মশান সম্বন্ধে যেন এক বিশেষ পক্ষপাত ছিল—তিনি তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম দেন 'শ্মশান ও জীবন' (১৮৮৩)। প্রকৃতপক্ষে সেটিকে কোনো স্বতন্ত্র কাব্য হিসাবে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ সেখানেও 'মৃত নলিনীস্কন্ধে' বিজয়ের শ্মশানদর্শন ও জীবন পর্যালোচনা। কাব্যে পরিণামী বাক্য থেকে রাজকৃষ্ণের জীবনদর্শন সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব—"তাই বলি—/ এই যে বিশাল বিশ্ব সম্মুখে আমার / জাগে নিরন্তর, / ইহার সহিত / অটুট সম্বন্ধে আমি বাঁধা চিরকাল ; / আমার জীবন সহ বিশ্বের জীবন / এক বই দুই নয়—প্রাণের মিলন।" এই তত্ত্ব কোনো অভিনব জীবনসত্য হিসাবে আধুনিক কালে সমাদর লাভ করবে বলে মনে হয় না, কিন্তু সে-কালে কালীপ্রসন্ন ঘোষের মতো বিচক্ষণ সমালোচকের মনে হয়েছে, "ইহাতে দার্শনিক চিন্তা ও কবিতার কলগাথা একত্র মিশিয়াছে এবং আমাদিগের বিবেচনায় ইহা একখানি সুপাঠ্য বস্তু হইয়াছে।"[৩৫] অন্য আর একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন, "রাজকৃষ্ণবাবু অনেক কবিতা লিখিয়াছেন—তন্মধ্যে এই ক্ষুদ্র কাব্য আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাব্য ও বিজ্ঞানে কিমিয় সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা—সৌন্দর্য্য ও বলের বাঞ্ছনীয় পরিণাম সংঘটনের যত্ন, তিনি আর কখন পাইয়াছেন, এমত আমাদের স্মরণ হয় না। এই কাব্যের অনেক স্থলে আমরা উচ্চ কবিত্বশক্তির স্ফূর্তি দেখিয়া প্রীত হইয়াছি।"[৩৬]

## ॥ গীতিকাব্য ॥

'অবসর-সরোজিনী' (প্রথমভাগ, ১৮৭৬) প্রকাশের পর লালবিহারী দে লেখেন, "This is a collection and reprint of about forty lyrical pieces which formerly appeared in the Bengalı periodicals. They are of great merit ; indeed, they are second only to the best lyrical poet of Bengal, Babu Hem Chandra Banerjea."[৩৭] বালক রবীন্দ্রনাথ 'অবসর-সরোজিনী'র প্রশংসা না করলেও, কাব্যগ্রন্থটিকে বাংলা গীতিকাব্যের দৃষ্টান্ত হিসাবেই গ্রহণ করেছেন।[৩৮] অবশ্য গীতিকাব্যের

স্বরূপ সম্বন্ধে তখনও বাঙালি পাঠকের ধারণা কিছুটা অস্বচ্ছ বলে মনে হতে পারে, অন্তত 'অবসর-সরোজিনী'র অন্তর্গত রাজকৃষ্ণের সব কবিতাকে আমরা গীতিকাব্য বলে গ্রহণ করতে পারি না। নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, "গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।"[৩৯] বলাবাহুল্য এখানে 'গীতিকাব্য' শব্দটি খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে, তা বুঝতে পারি বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদত্ত দৃষ্টান্ত থেকে—ভবভূতির 'উত্তর-চরিতে' সীতাবিসর্জনকালে ও তারপর রামের ব্যবহারে "ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন।"[৩৯] উনিশ শতকের অধিকাংশ সমালোচক মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা', হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী', নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ-রঞ্জিনী'কে গীতিকাব্যের নিদর্শন বলে গ্রহণ করেছেন ( দ্র. রাজকৃষ্ণের 'অবসর-সরোজিনী' সম্বন্ধে সমসাময়িক মন্তব্য—"মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা, হেমবাবুর কবিতাবলী, নবীনবাবুর অবকাশ-রঞ্জিনীর ন্যায় অবসর-সরোজিনী একখানি উৎকৃষ্ট কোষ-কাব্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি। এরূপ হৃদয়গ্রাহী, ভাবপূর্ণ কবিতা আমরা অল্পই পড়িয়াছি। ভাষা এরূপ প্রাঞ্জল যে, পাঠ করিলে বোধ হয় যেন কবির মনের ভাব আপনা আপনিই সুললিত ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে।"[৪০] ) কিন্তু 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' বা 'সারদামঙ্গলে'র উল্লেখ করেননি। আসলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবোচ্ছ্বাসকেই তখন গীতিকাব্য বলা হতো ; সেই সঙ্গে তার মধ্যে সংগীতের আকৃতি ও প্রকৃতি ( স্বরচাতুর্য ও শব্দচাতুর্যময় ক্ষুদ্র রচনা ) থাকলেই যথেষ্ট। ফলে 'অবসর-সরোজিনী'র প্রথম কবিতা 'ভিখারিণী'তে কবি যখন বলেন,—"দুয়ারে দুয়ারে দীনা ভিখারিণী, / সহায়-বিহীনা ক্ষীণা অনাথিনী, / অবলা সরলা কাঙ্গালী কামিনী, মরমে মরিয়া কাঁদিয়া চলে। / হেন দুখিনীরে করুণ-লোচনে / চেয়ে দেখি কেহ যাতনা-মোচনে / অগ্রসর নয় ; ছি ছি, কি সরম ! / মানব-জাতির এই কি ধরম / বেদে-বাইবেলে-কোরাণে বলে ?" তখন আধুনিক পাঠক তাকে গীতিকবিতা বলতে রাজি হবে না। বিশেষত ভিখারিণীর উপর যখন রূপক তাৎপর্য আরোপিত হয়, দেশমাতৃকার ভিখারিণী-রূপ যখন কবির বর্ণনীয় বিষয় হয়ে ওঠে, তখন তাকে গীতিকবিতার নিদর্শন বলা কঠিন। কিংবা 'ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি' কবিতায় কবি যখন বলেন, "বঙ্গবাসিগণ ! কঠোর বচন / যা কিছু বলিনু—ভালরি কারণ, / ভেবে দেখ মনে ; ক'র না রাগ। / রাগ ত কর না দাসত্ব করিতে, / রাগ ত কর না নিগার হইতে, / পাদুকা বহিতে, অধীন রহিতে / হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্ক-দাগ।" তখন রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য খুব কঠোর মনে হলেও অসংগত বলা যায় না—"অবসর-সরোজিনীর কবি ভাবিতেছেন তিনি হাসিতে হাসিতে, উপহাস করিতে করিতে

খুব বুঝি অর্থ স্পর্শ করিতেছেন, কিন্তু 'বাঙ্গালী ভায়ারা' [ পরবর্তী সংস্করণে এই অংশ পরিবর্তিত ] ইত্যাদিতে কবিতার উপর অভক্তি ভিন্ন আর কোন ভাব মনে আসে না। তাঁহার মনোরচিত কবিতার মধ্যে ছন্দ আছে বটে, কিন্তু ভাব নাই।"[৪১] অথচ সেকালের অনেক পাঠকের কাছে কবিতা দুটির ভাবোচ্ছ্বাস খুব উপাদেয় মনে হয়েছিল—"The way in which he gives vent to his poetical feelings is indeed striking. The poet has the merit of producing by the manner of his writing deep impressions on the mind of his readers. To corroborate this we recommend our readers to read the pieces under head of *Bhutale Bangali adhama jati* and *Bhikharini*. According to our estimation, Baboo Rajkrishna Roy stands very high as a lyrical poet."[৪২]

আসলে উনিশ শতকে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খণ্ডকবিতা কখনও ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে গীতিময় হলেও, সাধারণভাবে সেখানে বিষয়ী অপেক্ষা বিষয়ের প্রাধান্য। রাজকৃষ্ণের কবিতাকেও এর ব্যতিক্রম বলা যায় না। অন্যদিকে বিহারীলালের মতো নিজস্ব কবি-ভাষা সৃষ্টি করতে না পারার ফলে রাজকৃষ্ণের কবিতা অনেক সময় কৃত্রিম প্রথাসর্বস্ব বলে মনে হয়। তবে যেখানে তিনি মন্ময়ভাবে চালিত হয়ে প্রথার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন সেখানে তাঁর রচনা গীতিকাব্য লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে আবার কবিতা রচনার থেকে গান রচনায় তিনি অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, যেমন 'অবসর-সরোজিনী'র অন্তর্গত—"কি আর গাইব কারে বা শুনাব / প্রাণভরা ভালবাসা? / সুরভরা বীণা খসিয়ে পড়িল, / হৃদয়ে লুকাল আশা। / থাক্ থাক্ বীণে! নীরব হইয়ে, / আমিও নীরব এবে; / মরমের তার গিয়েছে ছিঁড়িয়ে, / কে আর বাঁধিয়ে দেবে!"

গীতিকার হিসাবে রাজকৃষ্ণ একসময়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নাটকের জন্য তাঁকে গান লিখতে হতো, আর সে সব গান বাঙালির মুখে মুখে ফিরতো। এগুলিকে আমরা নাট্যগীতি বলতে পারি। নাটকে গানের প্রয়োগ সব সময় শিল্পসার্থকতা লাভ করেনি সত্য[৪৩], কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে গানগুলির কাব্যমূল্য স্বীকার্য। সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, "রাজকৃষ্ণের নাট্যরচনার মধ্যে কিছু ভালো গান ছড়াইয়া আছে।"[৪৪] নাটকের জন্য যেমন গান লিখেছেন, তেমনি আনন্দ-বেদনার ব্যক্তিগত প্রকাশও সংগীতের বিশিষ্ট শিল্পরূপের আশ্রয় নিয়েছে। শরচ্চন্দ্র দেব যখন রাজকৃষ্ণের সংগীতসংগ্রহ 'গান' ( ১৮৮৮ ) প্রকাশ করেন, তখন তার মধ্যেও সব গান স্থান পায়নি, কারণ "এত বিলম্ব করিয়াও রাজকৃষ্ণবাবুর অনেকগুলি অপ্রকাশিত গান সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। রাজকৃষ্ণবাবু কাহাকেও কোন প্রবন্ধ দিলে প্রায় তার প্রতিলিপি নিজের নিকট রাখেন না; এইজন্যই ঐ

সকল পরহস্তগত গান সংগ্রহ একান্ত দুঃসাধ্য।" এবং "সকল গ্রন্থের সকল গানই উদ্ধৃত করি নাই। যেগুলি আমি ভাল বুঝিয়াছি সেইগুলিই সংগ্রহ করিয়াছি।" (শরচ্চন্দ্র দেবের 'বিজ্ঞাপন')। গান থেকেই গীতিকাব্যের জন্ম; বিশেষত যে সব গানে কথা ও সুরের যথার্থ মিলন ঘটেছে, সেগুলিকে গীতিকাব্য বলে গ্রহণ করতে বাধা নেই।

॥ বিবিধ ॥

রাজকৃষ্ণের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা যেমন নিতান্ত অল্প নয়, তেমনি তাঁর কাব্যের বিষয়গত বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধব গিরি, গৃহস্থ-কন্যা এলোকেশীর উপর অত্যাচার করায় তার কারাবাস হয়, সেই উপলক্ষে লেখা হয় অসংখ্য নাটক ও প্রহসন।[৪৫] রাজকৃষ্ণ এই সময় লেখেন বারো পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র কাব্য—'মহন্ত বিলাপ !!!' (১৮৭৪)। এই অকিঞ্চিৎকর কৌতুককাব্যটি বর্তমানে বিলুপ্ত-প্রায়। আবার এরই পাশাপাশি লেখা হয়েছে 'স্তবমালা'র মতো দেব-স্তোত্র বা মহিমা-গান। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী প্রকাশিত 'গ্রন্থাবলী'র (প্রথম ভাগ, ১৮৮৪) 'বিজ্ঞাপনে' গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'স্তবমালা' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১২৮১ সালে। মনে হয় ইউরোপীয় ওডের গঠন-বৈশিষ্ট্য মনে রেখে রাজকৃষ্ণ 'স্তবমালা' রচনা করেন, অর্থাৎ স্ট্রফি, অ্যান্টিস্ট্রফি এবং এপোডের মতো সমবেত গীত, প্রথম শাখা, সমবেত গীত, দ্বিতীয় শাখা, সমবেত গীত, তৃতীয় শাখা, সমবেত গীত, চতুর্থ শাখা প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে কয়েকটি ভাগে তিনি লেখেন লক্ষ্মীনারায়ণের স্তব। রচনাকৌশলটি চমকপ্রদ হলেও বিষয়বস্তুতে বা বর্ণনায় কবিত্বপ্রকাশের অবকাশ ছিল কম। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীবন্দনা বা চৌতিশার আধুনিক রূপান্তর হিসাবে স্তবমালার উল্লেখ করা যায়,—সেকালে এর জনপ্রিয়তাও আমরা কল্পনা করতে পারি, কিন্তু কবিতা হিসাবে 'স্তবমালা' রাজকৃষ্ণের গৌরব বৃদ্ধি করেনি। রচনার নিদর্শন—"জয় জয় জয় লক্ষ্মীনারায়ণ / শোক-ভয়-পাপ-তাপ-নিবারণ, / নিখিল-জগত-সৃজন-কারণ, / দুখি-জন-দুখ-হারী হে। / অগতির গতি, পতিত-পাবন, / অখিলের পতি, শমন-শাসন, / পরম দয়ালু, জীবের জীবন, অতুল কুশলকারী হে!"[৪৬]

অনুরূপ প্রথানুসারী কাব্য 'শারদোৎসব'। শাক্তসংগীতের ধারাবাহী আগমনী গান রচনার প্রয়াস উনিশ শতকেও দেখা গেছে। ১২৮১ সালের ২৫শে ভাদ্র রাজকৃষ্ণ 'দুর্গামঙ্গল' নাম দিয়ে এই ধরনের কয়েকটি গান ও কবিতা লেখেন, যেগুলি 'শারদোৎসব' কাব্যে স্থান পেয়েছে। 'শারদোৎসব' স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি, ১৮৮৪ সালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কবি-নাট্যকারের যে 'গ্রন্থাবলী'

প্রকাশ করেন, তাতে 'দুর্গামঙ্গল', 'সুখের শরৎ', 'দুর্গোৎসবে বঙ্গবাসীর আনন্দ' ও 'উৎসব-দর্শনে' স্থান লাভ করে। 'দুর্গামঙ্গলে' আছে পাঁচটি গান—যার মধ্যে নিদ্রাভঙ্গে মেনকার বিলাপ, গিরিরাজের প্রতি মেনকা, উমার প্রতি মেনকা, উমা-আগমনে হিমালয়ের মহোৎসবকে শাক্তসংগীতের আধুনিক রূপান্তর বলতে পারি। এই সব গানে প্রসাদীসংগীতের স্বতঃস্ফূর্ততা বা সরলতা রক্ষিত হয়নি, তবে বঙ্গে শারদোৎসবের আনন্দময়তাকে কবি আধুনিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন, যেমন—

" 'জয় উমা, জয় জয়!' রবে পূর্ণ দিক্‌চয়,
প্রতিধ্বনি সেই ধ্বনি করিছে বহন।"[৪৭]

'উৎসব-দর্শনে' কবি সুখী হলেও জাতীয় জীবনে অভাব অনটনের চিন্তা তাঁকে পীড়িত করে, অন্যদিকে পূজার বাহ্য আড়ম্বরেও তিনি ক্ষুব্ধ—"যে দেবীরে পূজ এত ঘটা ক'রে, / ভক্তি যদি থাকে, ভাব না অন্তরে;—/ যদি তিনি কভু দেন শুভ দিন, / ফিরে দেন হৃত-ধন সমীচীন, / তবে এ উৎসবে হয়ো মগন।"[৪৮]

'দেবসঙ্গীত' (১৮৭৯) মঙ্গলকাব্য ও শাক্তপদাবলীর বিষয়াবলম্বনে লেখা হলেও কবির সমাজচেতনার পরিচয় বহন করে। বিরাশিটি শ্লোকে সম্পূর্ণ এটি একটি দীর্ঘ কবিতা। কৈলাসপর্বতে হরপার্বতীর অবস্থান। সেখানে সরস্বতীর আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে প্রথম বাইশটি শ্লোকে। তারপর পার্বতী তিন দিনের জন্য ভারতদর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন শিবের কাছে—স্পষ্টই বোঝা যায় দেবীর শরৎকালীন মর্ত্যাবতরণের ভূমিকা প্রস্তুত হয়েছে এইভাবে। শিব বলেছেন, "এস, বরাননে! / এই তিন দিন প্রতি বর্ষে মোর / নরক-নিবাস—মনে যেন রয়। এস, প্রিয়তমে! এস তবে, সতি! / কেশরিবাহনে কর শুভ গতি, / ভারত দেখিয়া, অবিলম্বে পুন / এস, যেন বেশী বিলম্ব না হয়।" কিন্তু এমন সময় সেখানে দেবী সরস্বতী এসে পার্বতীকে জানালেন—'অয়ি বিশ্বেশ্বরি! / কোথা যাও আজ গৃহ পরিহরি? / থাম, দেবি! থাম;—এ মিনতি করি / কেশরিবাহনে কোথায় যাবে?" তারপর সরস্বতী দেবসংগীতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের নরকাবস্থা বর্ণনা করলেন, যদিও এই নরক বর্ণনার যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করা কঠিন। দান্তের নরকবর্ণনার সঙ্গে হিন্দুপুরাণের নরকবর্ণনা এখানে মিলেছে। তবে কবি নিসর্গচিত্র অঙ্কনে বেশি আগ্রহী, এবং সেখানেই তাঁর কিছুটা কৃতিত্বের প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু কবিতাটি রচনার উদ্দেশ্য সব মিলিয়ে পাঠকের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বিচ্ছিন্নভাবে কৈলাসের বর্ণনা বা সরস্বতীর বীণাবাদন কাব্যোৎকর্ষ লাভ করলেও সমগ্র কবিতাটি ভারতবর্ষের রূপকচিত্র হিসাবে সার্থকতা লাভ করেনি।

'গিরিসন্দর্শন' রাজকৃষ্ণের নিসর্গ কবিতার নিদর্শন হিসাবে মূল্যবান। 'গিরিসন্দর্শন' ও 'কালচক্র' স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেমুদ্রিত হয়নি, দুটি রচনাই বেঙ্গল

মেডিক্যাল লাইব্রেরী প্রকাশিত 'গ্রন্থাবলী'তে (প্রথম ভাগ) প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 'কালচক্রে'র আলোচনা আগে করা হয়েছে। 'গিরিসন্দর্শন' রচনার ইতিহাস কবির ভাষায়, "আমি বাঙ্গালা ১২৭৬ সালে রাজমহল, জামালপুর, মুঙ্গের ও মির্জাপুর অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। তত্রত্য পাহাড়গুলি সন্দর্শন করিয়া, সেই বৎসরের শেষে ও ১২৭৭ সালের প্রারম্ভে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছিলাম।" 'গিরিসন্দর্শন' প্রচলিত ধারায় সর্গবন্ধকাব্য—তবে কাহিনী বর্ণনা এখানে কবির উদ্দেশ্য নয়। আপাতদৃষ্টিতে বহিরঙ্গ অবয়ব বিচারে রচনাটিকে বিহারীলাল-ঈশানচন্দ্র ধারার কাব্য বলে মনে হয়। প্রথম তিনটি সর্গে যথাক্রমে প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাদর্শন; চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গে পৌর্ণমাসী-রজনী দর্শন ও অমাবস্যা-নিশীথ দর্শন; ষষ্ঠ সর্গে বিবিধ শোভা দর্শন। রাজকৃষ্ণের নিসর্গদৃষ্টির মধ্যে রোমান্টিক ভাবকল্পনা কিংবা অতীন্দ্রিয়বোধের স্পর্শ মেলে না—তাঁর কৃতিত্ব বস্তু বর্ণনায়, যেমন—"গিরি-শিরে বসে দেখিনু নয়নে, / প্রতীচী-বিভাগে গগন-রবি / গড়ায়ে গড়ায়ে পড়িছে কেমনে, / প্রকাশি নূতন লোহিত ছবি!" "নভোভাগ এবে লোহিত বরণে, / আহা, কি রঞ্জিত হয়েছে, মরি! / যেন অগ্নি লেগে সুদূর কাননে, / জ্বলিয়া উঠিছে হু হু হু করি!..." ইত্যাদি। নিসর্গ প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য বা মহিমাদর্শনে ঐশী শক্তির অবতারণা ("ঈশ হে, তোমার সম, / শিল্পকর অনুপম, / কে আছে জগতে আর? দেখি না কাহায়") কিংবা জাগতিক দৃশ্যরাশির মধ্যে স্রষ্টার সৃষ্টিমাহাত্ম্য বর্ণন ("ক্রমিক নূতন ভাবে সাজিয়া স্বভাব, / দেখাতে লাগিল বিশ্বনাথের কৌশল") সে কালের কাব্যধারায় সুলভ ও বহুপ্রত্যাশিত। তবে গিরিসন্দর্শন যেন ক্লান্তিকর পুনরুক্তিময় না হয় সে সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ সতর্ক ছিলেন, তাই পর্বতের সঙ্গে এসেছে পর্বতবাসীদের কথা—"ছাগপাল লয়ে ছাগল-পালক/গ্রাম্য তানে গেয়ে রাখালী গীত, / কোলে করে শিশু ছাগল-শাবক, / গৃহমুখে চলে,—হরিষ চিত।" কিংবা "দেখিলাম বৃদ্ধা এক বসিয়ে তথায়" এবং তারপর তার কাহিনী, কিংবা গিরিবনান্তে সমাধিদর্শন, বা গিরিশিখরে জনৈক ভ্রমণকারীর লিখনদর্শন ইত্যাদি প্রসঙ্গ। কিন্তু অপার্থিব নিসর্গসৌন্দর্যের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার যোগ সব সময় কার্যকর হয় না, বিশেষত অসতর্ক শব্দব্যবহার কাব্যের ভাবগাম্ভীর্যকে ব্যাহত করে।

এর বাইরে আছে কিছু শিশুপাঠ্য কবিতা। বিদ্যালয়ে পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে নির্বাচিত হবে ভেবেই হয়তো কবিতাগুলি লেখা, এবং দীর্ঘদিন এগুলি স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়ানোও হয়েছে। 'কবিতাকৌমুদী'র (দুই ভাগ, ১৮৭৫) একাধিক সংস্করণ-প্রকাশ তার জনপ্রিয়তার প্রমাণ। 'কবিতাকৌমুদী'র দ্বিতীয় ভাগের 'বিজ্ঞাপনে' রাজকৃষ্ণ লিখেছেন "অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে কবিতায় নীতিশিক্ষা দিবার নিমিত্ত আমি ইতিপূর্ব্বে কবিতাকৌমুদী প্রথম ভাগ প্রকাশ

করিয়াছি। কবিতাকৌমুদী দ্বিতীয় ভাগও সেই উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইল।” তারপর প্রকাশিত হয়েছে ‘শিশুকবিতা’ ( ১৮৮১ ), যার ‘বিজ্ঞাপনে’ কবি লেখেন, “তরলবুদ্ধি শিশুদিগকে প্রথম কবিতা শিক্ষা দিবার যোগ্য একখানি সরল পদ্য পুস্তকের নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় আমি ‘শিশু কবিতা’ নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচনা করিলাম। অল্পশিক্ষার অব্যবহিত পরেই যে প্রকার সরল পদ্য পুস্তক উহাদিগের পক্ষে শিক্ষোপযোগী হওয়া উচিত, তাহা আদৌ হয় না। প্রায় কঠিন শব্দাত্মক ও কঠিন ভাবসমন্বিত পদ্যপুস্তকই তাহাদের ভাগ্যে পড়িয়া যায়। যাহারা কিয়ৎপরিমাণে বয়স্থ তাহাদের পক্ষে, উহা ততটা কঠিন না হউক, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ন্যূনবয়স্কদিগের পক্ষে অধিকাংশস্থলেই ‘ওষুধ গিলিবার’ মত বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়। যাহাতে তাহা না হয়, তাহাই এই শিশুকবিতার উদ্দেশ্য। এমন কি, যাহাতে প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় প্রভৃতি প্রথম শিক্ষা পুস্তক যাহাদের অধীত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় অধীত হইতেছে, এই পুস্তকখানি তাহাদের পক্ষেও উপযোগী হইতে পারিবে বলিয়া, ইহাতে একেবারেই সংযুক্ত অক্ষরের কথা ব্যবহৃত হয় নাই।⋯ শিশুকবিতা পাঠের পর প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ কবিতা-কৌমুদী শিশুগণের পক্ষে পর্য্যায়ক্রমে পাঠ্য।” ‘শিশুকবিতা’র বিষয়—লেখাপড়া শেখার জিনিস ( বই, কাগজ, দোয়াত ইত্যাদি ), গুরুজন ( ভগবান্, পিতা, মাতা ইত্যাদি ), ভালোবাসবার লোক ( ছোট ভাই, ছোট বোন, দাসদাসী ইত্যাদি ), পশু ( সিংহ, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি ), দয়া করার লোক ( কানা, খোঁড়া, কাঙালি ), খেলা, পাখি। কবিতার দৃষ্টান্ত—“খুব জোরে—খুব ধীরে পড়া ভাল নয় / গোটা গোটা কথা পড়া বড় ভাল হয় / মনে মনে পড়ো না কো মনে নাহি রবে / কথা কয়ে পড় বই, মনে রবে তবে / আন-মনে থেকো না কো পড়ার সময় / পড়িতে পড়িতে খেলা কভু ভাল নয়।” কিংবা “এই হেতু বলি শিশুগণ / হয়ে থেকো খুব সাবধান / ঢিল টিল মেরো না কুকুরে / কামড়ায়ে নাশিবে পরাণ।” বলাবাহুল্য শিশুসাহিত্যে নীতিশিক্ষাদানের ইচ্ছা স্বাভাবিক, কিন্তু নীতি-উপদেশ শিশুদের মনোরঞ্জনে কতটা সক্ষম তা বলা কঠিন। তবে ‘কবিতাকৌমুদী’ ও ‘শিশুকবিতা’ প্রবীণ সমালোচকদের মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। ‘বান্ধব’ পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়—“আমরা এই পদ্যময় পুস্তক দু’খানির অনেক স্থান পড়িয়াই সুখী হইয়াছি এবং লেখকের ক্ষমতাশীলতার পরিচয় পাইয়াছি। ‘বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত’ এই কথা শুনিলে প্রথমেই এই বোধ হয় যে, গ্রন্থখানি ‘শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে’। কারণ, বালকশিক্ষার নিমিত্ত এ দেশের কোন উৎকৃষ্ট কবিই অদ্য পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন নাই। সচরাচর যাহা লিখিত হয়, তাহা পড়িতে বালকের কেন, বৃদ্ধেরও প্রাণান্তকর পিত্তবৃদ্ধি হয়। কবিতাকৌমুদীর বিষয় এই বলিতে পারি যে, ইহার সম্বন্ধে এ উক্তি কোন প্রকারেই সঙ্গত হয় না। ইহার কবিতা-নিচয়ে

রস আছে এবং পড়িতে প্রবৃত্তি জন্মে। বিদ্যালয় সমূহে এই পুস্তক দু'খানি আদর সহকারে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।"[৪৯]

'সংবাদ প্রভাকরে'র সমালোচক রাজকৃষ্ণের পুস্তিকা দু'টি সম্বন্ধে লেখেন, "ইহাতে বালকগণের পাঠোপযোগী কতিপয় কবিতা আছে। যে উদ্দেশ্যে লিখিত, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। অধুনা বাঙ্গালা পাঠশালা সমূহে যে সকল কবিতা পুস্তক অধীত হয়, তাহার মধ্যে কয়েকখানি উত্তম, কতগুলি জঘন্য। কবিতা-কৌমুদীকে উত্তম শ্রেণীতে গণনা করা যায়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এই দুইখানি পাঠ্যপুস্তক মধ্যে প্রবিষ্ট করিলে বালকগণের অনেক উপকার হইতে পারে।"[৫০]

রাজকৃষ্ণ আরও কিছু কবিতা লিখেছেন, কিন্তু সেগুলির মধ্যে বিষয়গত বা প্রকরণগত নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না বলে সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হলো না। রাজকৃষ্ণের কাব্যগ্রন্থগুলির আলোচনা কালে তাঁর কবিপ্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি নির্দেশ করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, কবিতা রচনায় তাঁর অনায়াসপটুত্ব ছিল, এবং এদিক থেকে তিনি স্বভাবকবি। তবে তত্ত্বদর্শনের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল এবং সেখানে হয়তো তাঁর পড়াশোনার পরিচয় মেলে। বিদেশি কবিতার সঙ্গে তাঁর ভালো পরিচয় ছিল, ফলে শুধু কবিতার ভাবানুবাদ নয়, অনেক সময় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁর কবিতায় বিদেশি কবিতার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে 'অবসর-সরোজিনী'র এই ধরনের কবিতাই ভালো লেগেছিল, যদিও তিনি মৌলিকতার অভাবের জন্য রাজকৃষ্ণের প্রশংসা করতে পারেননি।[৫১]

---

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ: ভূমিকা', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্যসংসদ, ১৩৬৬, পৃ. ৮৩৬।
২. নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্মৃতি, ১৩২৭, পৃ. ৭৩৩।
৩. নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্মৃতি, পৃ. ৭৩৭।
৪. নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্মৃতি, পৃ. ৭৫৩।
৫. H. J. C. Grierson, *Lyrical Poetry from Blake to Hardy.*
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৭৩, পৃ. ১০৬-০৭।
৭. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪১৬।
৮. রাজকৃষ্ণ রায়, 'বিজ্ঞাপন', বঙ্গভূষণ, ১২৮০, পৃ. /০।

৯. 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা', বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৮০, পৃ. ৫৭৫।
১০. *The Hindoo Patriot*, March 30, 1874, p. 152-53.
১১. 'পণ্ডিতবর ভরত মল্লিক', বঙ্গভূষণ, পৃ. ৩৫।
১২. জীবেন্দ্র সিংহরায়, আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতা: সনেট, ১৯৬৮, পৃ. ১৩৭-৪৪।
১৩. 'কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্র', বঙ্গভূষণ, পৃ. ৩৪।
১৪. Alex Preminger, ed., *Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*, 1975, p. 215.
১৫. রাজকৃষ্ণ রায়, 'বিজ্ঞাপন', কেশব-বিয়োগ, ১৮৮৪।
১৬. নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, নবীনচন্দ্র গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, ১৩৮১, পৃ. ৩৩৯।
১৭. মন্মথনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৪৫, পৃ. ৪।
১৮. রাজকৃষ্ণ রায়, ভারতে যুবরাজ (প্রিন্স অফ ওয়েলসের শুভাগমনোপলক্ষে), ১৮৭৫, 'ভূমিকা' পৃ. /.. √. ।
১৯. তদেব, পৃ. ৩১।
২০. দ্র. 'The Baroda Yellow-Book', *Mookerjee's Magazine*, March & April 1875.
২১. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত, ১৩০৮, পৃ. ৩৩৪।
২২. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩৩-৩৪।
২৩. রাজকৃষ্ণ রায়, গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ১৩০৫, পৃ. ১৮৮।
২৪. তদেব, পৃ. ১৮৯।
২৫. তদেব, পৃ. ১৯০।
২৬. তদেব, পৃ. ১৮৯।
২৭. তদেব, পৃ. ১৯৪।
২৮. তদেব, পৃ. ১৯৫।
২৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫১৫।
৩০. রাজকৃষ্ণ রায়, গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, পৃ. ৩৬০।
৩১. প্রভাময়ী দেবী, বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য, ১৯৫৮, পৃ. ২৫।
৩২. *The Bengal Magazine*, December 1877.
৩৩. *The Indian Mirror*. July 27, 1878.

৩৪. রাজকৃষ্ণ রায়, গ্রন্থাবলী, প্রথমভাগ, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, পৃ. ২৫৩।

৩৫. বান্ধব, পৌষ ১২৮৯।

৩৬. প্রতিনিধি, ১৮ শ্রাবণ ১২৯০।

৩৭. *The Bengal Magazine*, August 1876.

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ১০৬-০৭।

৩৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'গীতিকাব্য', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৭।

৪০. বঙ্গমহিলা, আষাঢ় ১২৮৩।

৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ১১০।

৪২. *The Indian Mirror*, January 9, 1878.

৪৩. "এমন সব চরিত্রের কণ্ঠে গান দেওয়া হয়েছে, বা শুধুমাত্র গানের জন্যেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে যা নাটকের বিচারে বিসদৃশ। অথচ সে যুগের দর্শকদের কাছে তা অসংগত মনে হয় নি।"—প্রভাতকুমার গোস্বামী, বাংলা নাটকে গান, পৃ. ১৬৫।

৪৪. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩:৬।

৪৫ তদেব, পৃ. ৩২২-২৩।

৪৬. রাজকৃষ্ণ রায়, গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, পৃ ১৫৮।

৪৭. তদেব, পৃ. ১৩৫।

৪৮. তদেব, পৃ. ১৩৮।

৪৯. বান্ধব, শ্রাবণ ১২৮২।

৫০. সংবাদ প্রভাকর, ২৫ ফাল্গুন ১২৮১।

৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ১০৮।

## পদ্য ও গদ্য গল্প

সেই আদিমকাল থেকে মানুষের মনে জেগেছে গল্প শোনার ইচ্ছা, আর ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে অসংখ্য গল্প। আধুনিক গল্পকার সমারসেট মমের মনে হয়েছে, সম্পত্তিবোধের মতো গল্প সম্বন্ধে আগ্রহ, সেই গুহামানবের মধ্যেও দেখা গেছে—"From the beginning of history men have gathered round the camp-fire, or in a ground in the market place, to listen to the telling of a story. That the desire is as strong as ever is shown by the amazing popularity of detective stories in our own day."[১] তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে গল্প ছিল সাধারণভাবে আখ্যানধর্মী, সেখানে কালপরম্পরা অনুসরণে একটি কাহিনী বিবৃত হতো, শ্রোতা বা পাঠকের মনে ছিল শুধু একটি জিজ্ঞাসা—'তারপর ?'[২] এই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে রূপকথা-উপকথা, যার মধ্যে কখনো মিলবে নিছক চিত্তবিনোদনের ইচ্ছা, কখনো রূপকের সহযোগিতায় জ্ঞানাঞ্জন-প্রলেপন।[৩] আরব্য উপন্যাস আর দেকামেরনের গল্পে হয়তো উভয়ধারার সম্মিলন ঘটেছে।

ভারতবর্ষে রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে যেমন অজস্র স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের সন্ধান মেলে, তেমনি গল্পসংকলন হিসাবে আমরা পেয়েছি জাতক সাহিত্য, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বৃহৎকথামঞ্জরী, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি। গল্প সে সময়ে কখনও পদ্যে রচিত হয়েছে, কখনো গদ্যে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে গদ্য রচনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—আখ্যায়িকা ও কথা। তবে পদ্যেও আখ্যায়িকা এবং কথা রচনা সম্ভব, যার নিদর্শন ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেবের রচনা। আখ্যায়িকা ও কথা—উভয়েরই উদ্দেশ্য গল্প বলা। ভামহ আখ্যায়িকার মধ্যে অধ্যায়ভাগ, বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত শ্লোক এবং নায়কের স্বচেষ্টিত বৃত্ত বর্ণনার কথা বলেছেন, কথার মধ্যে বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত শ্লোক বা অধ্যায়ভাগ থাকে না এবং কাহিনীর বক্তা নায়কের পরিবর্তে অন্য কেউ।[৪] কিন্তু আখ্যায়িকা ও কথার এই ভেদ পরবর্তী আলংকারিকেরা স্বীকার করেন না। সাধারণভাবে অলংকারশাস্ত্রে আখ্যায়িকাকে 'বৃত্তাশ্রয়ী' ( traditional ) এবং কথাকে 'স্বগুণাবিষ্কৃত' ( fanciful ) বলা হয়েছে, অর্থাৎ আখ্যায়িকায় খানিকটা ইতিহাস থাকে, আর কথায় থাকে কল্পিত কাহিনী।[৫]

অন্যভাবেও আখ্যায়িকা ও কথার স্বরূপ নির্দেশ করা সম্ভব। আখ্যায়িকা ও কথার রসগত স্বাতন্ত্র্য তখন বিচার্য। আখ্যায়িকাকে বলা হয়েছে 'Tale' যার কাহিনী বহু ধারায় বিস্তীর্ণ, অধ্যায়ভাগ বা একাধিক গল্পের সংকলন সেখানে দেখা

যায়। আর কথাকে বলা হয়েছে 'Fable' যার আকার সংক্ষিপ্ত, কাহিনী একমুখী। 'Tale'-এর মধ্যে জীবনরস বেশি, 'Fable'-এর মধ্যে নীতিশিক্ষার প্রয়াস। তবে বাংলা গল্প-কবিতায় সব সময় এই দুই ভাগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়নি। সাধারণ-ভাবে গল্প-কবিতাকে 'কথা' বললে ভুল হবে না। অন্তত রবীন্দ্রনাথের 'কথা' নামে কাব্যগ্রন্থে যে সব গল্প স্থান পেয়েছে সেগুলি কল্পনাশ্রয়ী কাহিনী নয়, তাদের উৎস ইতিহাস বা জাতক-অবদানের মতো পুরাকাহিনী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথার কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা। তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক-একটি খণ্ড দৃশ্য। ছবির অভিমুখিতা বাইরের দিকে, নিরাবিল দৃষ্টিতে স্পষ্ট রেখায়। সেইজন্যে মনের মধ্যে এই ছবির প্রবর্তনা এমন বিষয়বস্তুকে বেছে নেয় যার ভিত্তি বাস্তবে। এই সন্ধানে এক সময়ে গিয়ে পড়েছিলুম ইতিহাসের রাজ্যে।...এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরী হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যার রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।"[৬] এসব কবিতাকে অনেকে 'গাথাকবিতা'ও বলেছেন।[৭]

উনিশ শতকে আধুনিক গীতিকবিতা ও আধুনিক ছোটগল্প সৃষ্টির আগে আমরা পেয়েছি এই রকম অনেক গাথা-কবিতা। ঐতিহাসিক এই ধরনের কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "এসময় এমন কিছু গাথা-কবিতাও রচিত হয় যেগুলির আয়তন ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়া মানব মনের অনুভূতির বিকাশ এগুলির মধ্যে পাই। মানুষের জীবনে এমন অনেক ছোট ছোট ঘটনা সংঘটিত হয় যাহা তাহার সমস্ত জীবনকে অভিভূত করিয়া ফেলে—কোন প্রাণের ক্ষুদ্র স্পর্শ তাহার জীবনে জন্মান্তর আনয়ন করে—কোন ঘৃণা বা অবহেলা তাহাকে পশুতে পরিণত করে। এই রকম ক্ষুদ্র ঘটনার প্রভাবে নায়ক নায়িকার জীবনে অদম্য-আবেগ এই সকল কবিতার বস্তু। এগুলি এক হিসাবে যেন ছোটগল্পেরই পূর্ব্বাভাস এবং ছোটগল্পের কাব্যিকরূপ।"[৮] কিন্তু অধিকাংশ সময়ই মানবমনের অনুভূতির বিকাশ বা ছোট-গল্পের ভাবব্যঞ্জনা উনিশ শতকের গাথা-কবিতায় প্রকাশ পায়নি। রচয়িতা সেখানে নিছক একটি গল্প বলতে চেয়েছেন, যার সঙ্গে প্রাচীন Tale বা Fable-এর সাদৃশ্য প্রকট। গল্প কখনো অভিজ্ঞতানির্ভর, কখনো কিংবদন্তী-আশ্রয়ী। ফলে কবিতা রচনা বা গল্প নির্মাণের দিকে সেখানে তেমন জোর দেওয়া হয়নি।

আসলে গল্পের একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে আমরা বাংলা সাহিত্যে আখ্যানকাব্য বা গীতিকার নিদর্শন যেমন প্রচুর পাই ( মঙ্গলকাব্য, নাথসাহিত্য, পূর্ববঙ্গগীতিকা ) তেমনি পাই কথাশ্রয়ী খণ্ড কবিতার নিদর্শন। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তপদাবলী, এমন কি চর্যাগীতির মধ্যেও তাই খুঁজে পাওয়া যায় কাহিনীসূত্র।[৯] এই সব গল্প বা গল্পাভাস বিশেষ কোনও ভাববস্তুকে অবলম্বন করে

একাধিক কবির রচনায় বারবার ফিরে এসেছে। দীনেশচন্দ্র সেন একে বলেছেন 'পুচ্ছগ্রাহিতা'[১০] যদিও এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাঙালি মানসের বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকে বাঙালি সমাজজীবনে বড়ো রকমের পরিবর্তন সত্ত্বেও গল্পনিরপেক্ষ কবিতার আবির্ভাব হতে অনেক সময় লেগেছে। ইংরেজি metrical romance-এর আদর্শ অনুসরণ করেছেন একালের কবিরা, তবে লঘু কবিতায় রোমান্সের গাম্ভীর্য ও সুদূরতা রক্ষা সম্ভব হয়নি। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রথম ছোটগল্পের জন্ম হওয়ার আগে পর্যন্ত কবিতায় লেখা গল্প আমরা পেয়েছি, কিন্তু তার মধ্যে ছোটগল্পের অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ শিল্পরূপের সন্ধান মেলে না।

রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর কবিতায় লেখা গল্পগুলিকে 'খোসগল্প' নামে অভিহিত করেছেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'খোসগল্প' শব্দের অর্থ লিখেছেন 'কৌতুকজনক গল্প, চিত্রকথা'[১১], জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে শব্দটির অর্থ 'আমোদজনক কথোপকথন'।[১২] গদ্যে কৌতুকজনক গল্পের নিদর্শন আমরা পেয়েছি উনিশ শতকে নকশা-জাতীয় রচনায়। তবে নকশায় পূর্ণাঙ্গ গল্পের সন্ধান সব সময় মেলে না—খোসগল্প সেদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ গল্প হিসাবেই বিচার্য। গল্প কাকে বলে তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক থেকেই যাবে, এবং সেদিক থেকে এগুলিকে আমোদজনক কথোপকথন বলা সম্ভব। কিন্তু প্রাচীন আখ্যায়িকার মতো নিছক চিত্তবিনোদন রাজকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল না। কাহিনী কখনো বৃত্তাশ্রয়ী এবং অধ্যায় ভাগ কখনো অপরিহার্য হলেও এগুলি প্রাচীন 'কথা' শ্রেণীর রচনা বলেই পরিগণিত হবে। একদিকে চিত্র ও চরিত্রের সমাবেশ, অন্যদিকে বৈঠকী আড্ডায় গল্প বলার রীতি। উনিশ শতকে এই ধারায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু কবিতা রচনা করেছেন। তবে রাজকৃষ্ণের রচনায় তীক্ষ্ণ শ্লেষ বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য তেমনটা প্রাধান্য পায়নি। ফলে মজার গল্প হিসাবে উপভোগ্য সত্য, কিন্তু অনেক সময়ই ভাষা ব্যবহারে গ্রাম্যতা ও রুচির বিকার আধুনিক পাঠককে তাঁর রচনার প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে।

মাইকেল মধুসূদনের রচনাবলীতে আমরা কিছু 'নীতিগর্ভ কাব্যে'র নিদর্শন পাই, যেগুলি ঈশপের গল্পের মতোই পশু-পক্ষী অবলম্বনে রচিত। মধুসূদন এই ধরনের কবিতা লেখার সময় লা ফঁতেনের কবিতার আদর্শ অনুসরণ করেন।[১৩] কাক ও শৃগালী, রসাল ও স্বর্ণলতিকা, অশ্ব ও কুরঙ্গ, কুক্কুট ও মণি, সিংহ ও মশক —'কথামালা'র গল্প মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু শুধু পশুপক্ষী নয় মানবমানবী নিয়েও মধুসূদন এই ধরনের গল্প-কবিতা লিখেছেন, যার মধ্যে সবচেয়ে উপভোগ্য—'গদা ও সদা'। এই ধরনের কবিতায় নীতি-উপদেশ-দানের উদ্দেশ্য গোপন করা হয়নি, বরং কবিতার অন্তিম কয়েকটি চরণে খুব স্পষ্টভাবে পাঠককে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে "এই উপদেশ কবি দিলা এ প্রকারে"। রাজকৃষ্ণ রায়ের অধিকাংশ গল্প-কবিতাই

নীতিগর্ভ রচনা, কবিতার শেষে তিনি মধুসূদনের এই ধরনের কবিতার মতোই নীতি-উপদেশ উচ্চারণ করেছেন। এখানে 'গদা ও সদা'র মতো কবিতার প্রভাব নির্দেশ করা যায়। তবে রূপক কবিতা রচনায় রাজকৃষ্ণের আগ্রহ ছিল না। গল্পের শেষে নীতিবাক্য পরিবেশনের ক্ষেত্রেই উভয়ের সাদৃশ্য, যেমন—

মধুসূদন : "উচ্চশির যদি তুমি কুল-মান ধনে,
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে,
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে।" (রসাল ও স্বর্ণলতিকা)[১৪]
"ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি লোক অবহেলে যারে,
বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে,
এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে।" (সিংহ ও মশক)[১৪]
"মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে?
নরকুলে পশু বলি লোকে তারে মানে,—
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভাবে।" (কুক্কুট ও মণি)[১৪]

রাজকৃষ্ণ : "ধর্ম্মপথে থাকবে সদা—ভয় কোরবে পাপে!
থাকবে ভাল, পাপ কোল্লে মারবে ছোবল সাপে।
গোকুলমোহন সৌদামিনীর শেষ দশটা ভাবো।
মারবে হরি, এমন কোরে, পাপে যদি ডোবো॥"
(ষোল বছুরে পেত্নী)[১৫]
"কবি বলে, হিতবাক্য যা'র পক্ষে নিম।
নফরচাঁদের মতন তারো ভাগ্যে ঘোড়ার ডিম।" (ঘোড়ার ডিম)[১৬]

উনিশ শতকে বেশ কয়েকজন নাট্যকার কখনও পদ্যে, অধিকাংশ সময়ে গদ্যে, গল্প লিখেছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ পনেরোটি গল্প লিখেছেন, তার মধ্যে কয়েকটিকে অস্পষ্টভাবে 'নক্‌সা' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন 'নবধর্ম' বা 'নসে'।[১৭] হাসির গল্পও তিনি লিখেছেন, কিন্তু তাঁর গল্প মুখ্যত অভিজ্ঞতানির্ভর, তাঁর সামাজিক নাটকের সঙ্গে এগুলির যোগ বেশি। করুণরস না হোক, অন্তত শোকভাব সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। গিরিশচন্দ্রের সম্ভবত প্রথম গল্পরচনা 'হাবা' (অগ্রহায়ণ ১২৮৭)। সেখানে গল্পের শেষে "নীরদ ফাঁসিতে ঝুলিল।...উন্মাদিনী (সৌদামিনী) সেইখানেই মরিলেন।"[১৮] 'সই' গল্পে দেখানো হয়েছে পিতার "পাপের বিভীষিকার পূর্ণ ছবি সন্তানকে স্পর্শ করিতে পারে।" এবং তাই "স্থিরদামিনী প্রাণত্যাগ করিল।"[১৯]

অমৃতলাল বসুও নাটক-প্রহসনের সঙ্গে গল্প লিখেছেন। তাঁর লেখা প্রথম গল্প 'নিমাইচাঁদ' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে, শেষ গল্প 'টুনটুনি' ১৯২৯ সালে। এই দীর্ঘ কালপরিধির মধ্যে তাঁর দু'ধরনের লেখার সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথমত ও প্রধানত নক্শা ও রসরচনা, যেমন নিমাইচাঁদ, বিরাট্ বৃহস্পতি, বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব, রসের টুকরো প্রভৃতি। আর আছে কিছু মজলিসী গল্প, যেগুলিকে খোসগল্প বললে অন্যায় হয় না, তবে প্রহসনের মতো এখানে সামাজিক অসংগতির প্রতি ব্যঙ্গদৃষ্টি প্রধান হওয়ায় গল্পের নিটোলতা সর্বদা প্রত্যাশিত নয়। গল্প বলার ক্ষমতা ছিল অমৃতলালের,—রাজকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্রের তুলনায় তিনি নিপুণতর গল্পকথক। তবে সমালোচক সংগত কারণেই মন্তব্য করেন, "এই সকল গল্প ও নক্শায় সুসংবদ্ধ কাহিনী-সঞ্জাত গল্পরস অপেক্ষা অঙ্কিত চরিত্রাবলীর হাস্যকর কার্যকলাপই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।...তাঁহার প্রহসনে যেমন তিনি কাহিনীর দিকে গুরুত্ব আরোপ না করিয়া কতকগুলি চরিত্র ও খণ্ডদৃশ্যের সমন্বয়ে শেষ পর্যন্ত একটা বক্তব্যে উপনীত হইয়াছেন, গল্প-উপন্যাসেও সেইরূপ আগে কতকগুলি বিশিষ্ট ধরনের চরিত্রের চিন্তা করিয়া পরে সেই চরিত্রগুলিকে বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার মধ্যে স্থাপন করিয়া জীবনের এক একটা অনাবিষ্কৃত দিক সহসা উন্মুক্ত ও হাস্যোজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন।"[২০]

রাজকৃষ্ণ রায়ের গল্পসংখ্যা চোদ্দ। তার মধ্যে এগারোটি গল্পকে তিনি একত্রে 'খোসগল্প' বলে অভিহিত করেছেন। এগুলির রচনাকাল ১৮৮০-৮৫ সাল। গল্পগুলি হলো—১। ঘোড়ার ডিম ( ১৮ অক্টোবর ১৮৮০ ) ১২ পৃষ্ঠা ২। কুঁপো-কাৎ ( ১৫ আগস্ট ১৮৮১ ) ১২ পৃষ্ঠা ৩। পাঁচ ঝাঁটা ( ১৮৮২ ? ) ১২ পৃষ্ঠা ৪। ষোলবছুরে পেত্নী ( ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ ) ২৪ পৃষ্ঠা ৫। আদুরে ছেলে ( ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫ ) ২৪ পৃষ্ঠা ৬। রসগোল্লা ( ৩ মে ১৮৮৫ ) ১২ পৃষ্ঠা ৭। গেঁজেল গদা ( ৬ মে ১৮৮৫ ) ১২ পৃষ্ঠা ৮। এ মেয়ে পুরুষের বাবা ( ২১ জুন ১৮৮৫ ) ১২ পৃষ্ঠা ৯। টাকার তোড়া ( ২৮ জুন ১৮৮৫ ) ২০ পৃষ্ঠা ১০। নতুন বৌ এবং ১১। বোকা শিবে ( 'বীণা' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ ১২৯৩ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত ), অন্য তিনটি গল্পের মধ্যে একটি হলো ১২। 'অদ্ভুত গল্প' ( রাজকুমারী সরলা )। পূর্বোক্ত সব কয়টি গল্পই কাব্যাকারে রচিত। অন্য যে দুটি গল্প গদ্যের আশ্রয় নিয়েছে সেগুলি হলো—১৩। চীনের কলসী ( ডিসেম্বর ১৮৮২ ) ও ১৪। দুই সন্ন্যাসী।

১। ঘোড়ার ডিম—দরিদ্র নফর, মাখন জেলের কাছে মাছ চাইলে 'কাঙাল পুতের ঘোড়া রোগ' বলে অপমানিত ও তিরস্কৃত হয়। নফর প্রতিজ্ঞা করে বসে একটি ঘোড়া কেনার। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে অপারগ হয়ে সঞ্চিত একটি টাকা দিয়ে সে ঘোড়া কেনার বাসনা চরিতার্থ করতে চায়। কিন্তু এক টাকায় ঘোড়া দিতে কেউ সম্মত হয় না, বরং তাকে উন্মাদ বলে প্রত্যাখ্যান করে। তখন সে ভাবে—

"তিন শ'টাকা বড় ঘোড়া, বাচ্চা ঘোড়া কুড়ি।
নিদেন পক্ষে একটা টাকা, ঘোড়ার ডিমের কড়ি।।"[২১]

তারপর ঘোড়ার ডিম কিনবে মনস্থ করে হাটে যায়। কিন্তু কোথাও ডিম মেলে না। অবশেষে একজন প্রতারক দোকানদারের কাছ থেকে সে চুণ-মাখানো পচা কুমড়ো ঘোড়ার ডিম বলে কেনে। বাড়ি ফেরার পথে একটি লাউমাচায় ডিমের ঝুড়িটি রাখে। হঠাৎ ভারি ঝুড়ি মাটিতে পড়ে যায়—কুমড়ো যায় ফেটে। সন্ধ্যের অন্ধকারে শব্দ শুনে একটি শৃগাল ছুটে পালায়। নির্বোধ নফর 'ঘোড়ার ডিম যে গেল ফুটে, / ঐ যে ঘোড়ার বাচ্চা ছোটে' মনে করে তার পিছনে ধাওয়া করে।

২। কুঁপোকাৎ—অত্যন্ত সৎ ও সরল দুই ভাই গৌর আর নিতাই নাগ, দুই ভিন্ন গাঁয়ে বাস করে। দু'ভাই-এরই মুদীর দোকান আছে। বৌ নিস্তারিণী সরলা গ্রাম্যবধূ। একটানা ন'দিন ধরে গৌরের জর। জয় ডাক্তার দুশ্চরিত্র—তাই গৌরকে কড়া ওষুধ খাইয়ে 'প্রাণ থাকতে মড়া' করেছে। নিস্তারিণীকে কুপ্রস্তাব দিয়ে সে জানায়, এ প্রস্তাবে রাজি হলে স্বামীকে ভালো করে দেবে। এ সময়ে শ্যাম-বৈদ্যকে সঙ্গে করে ছোট ভাই নিতাই উপস্থিত হয়। জয় ডাক্তার ভীত হয়ে কুঁপোর মধ্যে আত্মগোপন করে। নিস্তারিণী ভয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। ক্রমে নিতাই সব ঘটনা জানতে পারে। জয় ডাক্তারকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে নাকখৎ দেওয়ায়। 'গউর ম'লে দায়ী আমি' খৎ লিখতেও বাধ্য করে। অবশেষে ডাক্তার কার্যকর ওষুধ খাওয়ালে গৌরও ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে।

৩। পাঁচ ঝাঁটা—চণ্ডীপুর গ্রামের ছেলে হেম গাঙ্গুলী। কলকাতায় বি. এ. পড়ে, ছুটিতে বাড়ি এসেছে। লেখাপড়ায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও কুসঙ্গের ফলে সে হয়ে উঠেছে চরিত্রহীন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দুপুরেও চন্দ্রাবতী নদীতীরে সে বসে থাকে—জল নিতে আসা গ্রাম্য মেয়েদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য—অন্য উদ্দেশ্যও গোপন থাকে না। গ্রামের কৃষক মাধব ঘোষ, তার স্ত্রী চন্দ্রমুখী ও গ্রাম-সম্পর্কিত নাতি নিমাই-এর সমবেত পরিকল্পনায় হেম গাঙ্গুলী মাধবের বাড়ি আমন্ত্রিত হয়। চন্দ্রমুখী-বেশী নিমাই এবং মাধব, হেমকে প্রহারের সাহায্যে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সমর্থ হয়।

৪। ষোল বছুরে পেত্নী—হুগলী জেলার চালতাডাঙ্গার ধনী পুত্র, দুশ্চরিত্র গোকুলমোহন—স্ত্রী কমলমুখী। সুন্দরী সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি গোকুলের কোনো আকর্ষণ নেই। চালতাডাঙ্গার ক্রোশখানেক দূরে মামুদপুরে সৎ বৈদ্য রূপনারায়ণ গুপ্তের বাস। স্ত্রী সোদামিনীকে তিনি সর্বদা কাছে রাখতে চান। কারণ 'জায়ার প্রতি টান' তাঁর প্রবল। কিন্তু বাপের বাড়ি শিমুলতলায় না যেতে পারায় সে অশান্তি করে। তখন বাধ্য হয়ে রূপনারায়ণ তাকে শিমুলতলা পাঠিয়ে দেন।

চালতাডাঙ্গার গোকুলের সেখানে পিসির বাড়ি। এক শীতের রাতে অসৎ গোকুলের সঙ্গে অসতী সৌদামিনীর সাক্ষাতের পরিকল্পনা হয়। কিন্তু তা বিফল করে দিয়ে কেউটের বিষে কিভাবে উভয়েরই মৃত্যু ঘটে—তাই গল্পকারের বর্ণনীয় বিষয়।

৫। আদুরে ছেলে—গঙ্গার তীরে টগরনগর শহরে প্রজাপীড়ক জমিদার দয়ালবাবুর বাস। প্রভূত বিত্তের অধিকারী তিনি। শীতের এক বিকেলে স্ত্রী গৌরবিণী এবং পুত্র খোকাকে নিয়ে তিনি তাঁর অন্যতম বাগানবাড়িতে বেড়াতে যান। সঙ্গে ইয়ার বন্ধু এবং দাসদাসীরা। কিন্তু খোকার আবদারে এবং স্ত্রীর নির্দেশে রাতদুপুরে স্ত্রৈণ দয়ালবাবুকে বাঁদর সেজে এবং বাঁদর নাচ নেচে কিভাবে তাদের মনোরঞ্জন করতে হলো—তা এ গল্পের মধ্য দিয়ে জানতে পারা যায়।

৬। রসগোল্লা—লবণদহ গ্রামে অধ্যাপক চন্দ্রচূড় চূড়ামণি, পত্নী গিরিবালাকে নিয়ে বাস করে। শিবু মালীর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে—তাই তার ছেলে হাবলা চন্দ্রচূড়ের কাছেই থাকে—কাজ করে আর গান গায় আপন মনে। গিরিবালা প্রত্যহই কাত্যায়নীর মন্দিরে 'বাটী ভরা রসগোল্লা, ঘটি ভরা জল' নিয়ে ব্রত পালনে যায় 'পতিব্রতা' হবে বলে। একদিন হাবলার কথামতো চন্দ্রচূড় গোপনে মন্দিরে গেল—জানতে পারলো সব রহস্য। স্ত্রী তারই মরণ কামনা করে—শ্যামাচরণ ধোপাকে বিয়ে করবে বলে। খাঁড়ার ঘায়ে চন্দ্রচূড় উপস্থিত শ্যামাচরণ ও গিরিবালা—উভয়েরই ইহলীলা সাঙ্গ করে দিল।

৭। গেঁজেল গদা—বিষ্ণুপুরের সংগীতগুরু কৃষ্ণ নায়েকের শিষ্য হলো ময়রা গদাধর। গদাধরের বিকট স্বরের গান সহ্য করতে না পেরে গুরু তাকে ছুটি দেন। বলেন, দেশান্তরে গিয়ে 'মোজরো' করো। গাঁজাপ্রিয় অর্থাৎ গেঁজেল গদা গাঁজা টেনে বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করে। তার বাড়ি মুগুরপুরে। মায়ের নাম তারা—কলহপরায়ণা বুড়ি সেখানে একা থাকে। বুড়ির জ্বালায় অশ্বত্থগাছের ভূতও পালায়। মা বাড়ি ফিরে সংগীতসাধক ছেলেকে দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। পরস্পরে বাক্‌যুদ্ধ চলে—পরিণামে গদার মারের চোটে মা মৃতপ্রায় হয়। গদাকে চৌকিদার থানায় ধরে নিয়ে যায়।

৮। এ মেয়ে পুরুষের বাবা—দিল্লীর বাদশা মহামদ-শা একদিন বৃদ্ধ উজীর মইজুদ্দীনকে দুনিয়ায় বুদ্ধি কার বেশি—এই প্রশ্ন করেন। মেয়েদের বুদ্ধিই বেশি—উজীরের এ মন্তব্যে বাদশা অসন্তুষ্ট হন। বাদশা জানান, এক সপ্তাহের মধ্যে এ কথার প্রমাণ দিতে না পারলে উজীরকে কারারুদ্ধ করবেন। মইজুদ্দীন মহাচিন্তায় পড়েন। কিন্তু তাঁর রূপবতী, বুদ্ধিমতী কন্যা রোশিনারা মোতিয়া বেলা বাঈজী সেজে কৌশলে বাবার এ চিন্তা দূর করে। সেইসঙ্গে উচিত শিক্ষা দেয় মহামদ-শা ও তাঁর পুত্র অহম্মদকে।

৯। টাকার তোড়া—সাঁপলাহাটি গ্রামে বদন বসুর বাড়িতে পুত্রবধূ

রাইকিশোরী এবং দাসী 'নাপ্তে ফেলী' থাকে। ছেলে রাধামাধব কলিকাতায় চাকরী করে, সপ্তাহান্তে বাড়ি আসে। বৃদ্ধ হয়েছে বলে বদন বসুর কষ্ট ও অযত্নের শেষ নেই। 'গোঁসাইবাটী' গ্রামের কেশব গোঁসাই বৃদ্ধের পরম বন্ধু। বদনের কষ্ট দেখে তাকে একশ টাকা দেয় এবং সকলের দৃষ্টির অগোচরে রোজ তা গুণতে বলে। টাকার শব্দ শুনে সকলের টনক নড়ে। ফাঁদে ধরা দেয় রাধামাধব, রাইকিশোরী, এমন কি দাসী ফেলীও। বৃদ্ধের যত্ন অতিরিক্ত বেড়ে যায়। কেশব গোঁসাই পরে টাকা ফিরিয়ে নেয়—কিন্তু বদনের সুখ পূর্ববৎ থাকে।

১০। নতুন বৌ—'কজাভাঙা' গ্রামের রসিকহৃদয় সেনের স্ত্রী কমলমণি রূপে-গুণে লক্ষ্মী। কিন্তু সন্তান না হওয়ায় রসিক পরে নয়নতারাকে বিয়ে করে। তবু পতিব্রতা কমল স্বামীর সেবা করে আর অশেষ কষ্টে দিন কাটায়। কুরূপা নয়নতারা রাণীর মতো থাকে নিজের স্বার্থ নিয়ে। রসিক কমলের প্রতি বিরূপ হয়, নয়ন হয়ে ওঠে তার প্রাণপ্রিয়া। কিন্তু তার এ অন্যায়-আচরণ লোকচক্ষুর অগোচর থাকে না। প্রতিবেশী গোপাল ঘোষাল একদা তাকে এ বিষয়ে সতর্ক করে এবং কথার সত্যতা যাচাই করতে বলে। গোপালের নির্দেশানুসারে রসিক বাড়ি ফিরে প্রথমে অসুস্থ ও পরে মৃতের অভিনয় করে। দুই বৌয়েরই প্রকৃত স্বভাব এ ঘটনায় ধরা পড়ে। রসিক কমলের কাছে ক্ষমা চায় এবং তাকেই একমাত্র পত্নী বলে ঘোষণা করে। আর অর্থলোলুপ নয়নতারাকে তিরস্কার করে বাপের বাড়ি চন্দ্রশেখরপুরে পাঠিয়ে দেয়।

১১। বোকা শিবে—সাধনপুরের তাঁতি শিবশঙ্কর কাজকর্ম করে না—কেবল খাওয়ার ধান্দা করে আর ঋণ করে। সবাই তাকে বোকা শিবে বলে। ঋণ করে সে ভাদ্র মাসে তাল-ফুলুরি খায়। বৌ আদরমণির অজান্তে সে ফুলুরির সংখ্যা গুণে রাখে—কিন্তু সামনে দেখায় খড়ি পেতে গুণে সে বলতে পারে। কিন্তু এ খড়ি-পাতাই তার জীবনে ভাগ্য ফেরালো—তারপর বিষ্ণুপুরের রাজার কাছ থেকে প্রচুর অর্থ এবং সম্মান আদায় করল সে। তার অবস্থার কিভাবে আমূল উন্নতি হলো তা বিস্তৃতভাবে আটটি পালায় বর্ণনা করা হয়েছে।

১২। অদ্ভুত গল্প ( রাজকুমারী সরলা )—অবন্তীপুরের রাজা মহেন্দ্রবিক্রমের ছয় কন্যা পিতার প্রশ্নের উত্তরে জানায় তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসা একমাত্র চিনির সঙ্গেই তুলনীয়। কিন্তু কনিষ্ঠা কন্যা সরলার 'তোমারে লবণসম ভালবাসি আমি'—উত্তরে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে কন্যাকে নির্বাসিত করেন। গহনবনে নির্বাসনকালে সরলা বিশাল প্রাসাদের মধ্যে সূচিবিদ্ধ মৃত রাজপুত্র চন্দ্ররশ্মি রায়ের সন্ধান পায়। সর্বাঙ্গ সূচিমুক্ত করে রাজপুত্রকে বাঁচালেও ভাগ্যদোষে সরলাকে হতে হয় দাসী এবং সরলার দাসী হয় রাণী। কারণ, রাজপুত্রের সূচিবিদ্ধ চোখ দু'টি মুক্ত করার সুযোগ পায় দাসী—সেইসূত্রেই সে রাণীর মর্যাদাও লাভ করে। দেশভ্রমণ শেষে রাজা রাণীর

জন্য প্রার্থিত অলংকার বস্ত্রাদি এবং দাসী সরলার জন্য 'ভানু-মণি পেটারিকা' এনে দেন। এই পেটারিকার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের ফলে রাজার কাছে সকল সত্য উন্মোচিত হয়। রাজা, সরলাকে রাণীর স্বীকৃতি দেন এবং দাসীকে স্বস্থানে ফিরে যেতে হয়।[২২]

১৩। চীনের কলসী—পাল বংশের এক রাজা যুদ্ধ-শেষে তিব্বত থেকে কিছু কারিগরকে কয়েদ করে আনেন বাংলা দেশে চীনাবাসন তৈরির জন্য। রাজ-সংসারবাসী বিজয়চন্দ্র একটি ছোট মেয়ে-কারিগরের দুঃখে ব্যথিত হয়ে বন্ধু সুবোধের পরামর্শে রাজসমীপে তার মুক্তির জন্য আবেদন করে। রাজা ঘোষণা করেন, এক মাসের মধ্যে যে সুন্দর একটি চীনের কলসী প্রস্তুত করে রাজাকে তুষ্ট করবে, তাকে তিনি পাঁচশত স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার অথবা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেবেন। মাসান্তে নির্বাচনকালে সবার মাঝে মেয়েটির কলসীই রাজা পছন্দ করলেন। বিজয়ের কথানুযায়ী রাজস্তুতি করে সে কলসীর নীচে চারলাইন কবিতা লিখেছিল। কিন্তু কলসী খুলে দেখা যায় তাতে পূর্বেই রাজ-নিন্দাসূচক একটি লাইন লেখা ছিল। সেই কারণে মুক্তি পেলেও মেয়েটি পুনর্বার, এবং সেইসঙ্গে বিজয়ও বন্দী হলো। সুবোধের প্রার্থনায় রাজা তাদের বিচারের ব্যবস্থা করলেন। বিচারকালে সুবোধের জেরায় সকল সত্যই উদ্‌ঘাটিত হলো। দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারখানার তত্ত্বাবধায়ক চিরজীবনের মতো শ্রীঘর গেল। রাজা বিজয়কে সহকারী সেনাপতি ও সুবোধকে নগরের প্রধান বিচারক নিযুক্ত করলেন। বালিকাটি মুক্ত হয়ে স্বদেশে গেল। মেয়েটির বুদ্ধি ও দেশভক্তির কথা শুনে বিস্মিত চীনরাজ তার পিতামাতার সম্মতিক্রমে তাকে কনিষ্ঠ পুত্রবধূ করলেন। রাজা পুত্রবধূর মতানুসারে তার মুক্তিদাতা সুবোধ ও বিজয়কে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দশটি চীনা স্বর্ণকলস পাঠালেন।[২৩]

১৪। দুই সন্ন্যাসী—চাঁদপুর গ্রামের জনার্দনের মৃত্যুর পর অকস্মাৎ একদিন তার শোকাকুল পুত্র ভাগ্যধর স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে পিতা তাকে সৎকর্মে ব্যাপৃত থাকতে বলছেন এবং আশীর্বাদ করছেন যে তার রাজকন্যা লাভ হবে। স্বপ্ন পূরণের জন্য পিতার সঞ্চিত টাকা নিয়ে সে গৃহত্যাগী হয়। ক্রমে ক্রমে শুভেশ্বর তীর্থ, সপ্তর্ষি-আশ্রম-তীর্থ, বৈদ্যনাথ তীর্থ পরিক্রমা করে সে কামরূপ তীর্থে পৌঁছয়। ইতিমধ্যে পথে আর্তের সেবা, তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণ, মৃত ব্যক্তির সদ্‌গতি প্রভৃতি বিভিন্ন সৎকর্ম সম্পাদন করে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে। পথ চলতে বান্ধবানন্দ সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরম বন্ধুত্ব হয়। সে ভাগ্যধরের নাম দেয় সখানন্দ। কামরূপ গিয়ে তারা অপরূপ রূপবতী রাজকন্যাকে দেখে। জানতে পারে, রাজা দেবীবর সিংহের এ-কন্যা তাকেই বিবাহে সম্মত হবে যে তার তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে—নচেৎ মৃত্যুদণ্ড। আজ পর্যন্ত দশহাজারের বেশি

লোকের এ-ভাবে মৃত্যু হয়েছে। তাই রাজকন্যাকে লোকে রূপসীরাক্ষসী বলে। রূপমুগ্ধ সখানন্দ সব শুনেও রাজকুমারীর উত্তরদানে সম্মত হলো। তখন বান্ধবানন্দের যাদুকৌশলে রাজকন্যার গোপন রহস্য ও তার গুরু যাদুকরের সন্ধান, সবই মিললো। বন্ধুর সহায়তায় সখানন্দ কিভাবে রাজকন্যার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে রাজকন্যা ও রাজত্ব লাভ করলো—তাই এ-গল্পের উপভোগ্য বিষয়।

পরিশেষে, বান্ধবানন্দ স্বর্গে ফিরে গেল। সখানন্দরূপী ভাগ্যধর জানতে পারলো যে ব্যক্তির সদ্‌গতি ভাগ্যধর পূর্বে করেছিল—বান্ধবানন্দ আসলে সন্ন্যাসী বেশধারী সেই মৃতের আত্মা।[২৪]

নাট্যকার রাজকৃষ্ণ যখন গল্প লেখেন, তখন গল্পে নাটকীয়তার সন্ধান প্রত্যাশিত। কিন্তু নাটকে তিনি কাহিনী বিস্তারের যে সুযোগ পেয়েছেন, গল্পে তেমনটা পাননি। ফলে তাঁর একটি গল্পে অনেক সময় বহু কাহিনীর সমাবেশ হয়েছে, আর এইভাবেই বহু গল্পের সম্ভাবনা একটি গল্পেই বিনষ্ট হয়েছে। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়ার এই প্রবণতা সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ নিজেও সচেতন ছিলেন, গল্প বলার মাঝে তাই বলে ওঠেন,

"ঐ যা আবার কি বলতে কি বোলচি এতক্ষণ
কাজের কথা বোলবো এবার, শোনো পাঠকগণ।"[২৫]

গল্প, বিশেষত খোসগল্প রচনায় তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। গোপাল ভাঁড়ের গল্পের মতোই এসব গল্পের পিছনে আছে দীর্ঘদিনের বহুজনের অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রকাশ। গল্পটি বীজাকারে তাই লোককথার (কদাচিৎ রূপকথার) মধ্যে লুকিয়েছিল, রাজকৃষ্ণ তাকে পল্লবিত করেছেন, নিজের বিশেষ প্রবণতা অনুসারে তাকে বিশেষ শিল্পরূপ দিয়েছেন। প্রহসনকার হিসাবে তিনি ছিলেন তির্যক ব্যঙ্গদৃষ্টির অধিকারী, তাঁর অধিকাংশ গল্পে কৌতুকরস পরিবেশনের আগ্রহ চোখে পড়ে। অন্যদিকে কবি হিসাবেই সাহিত্যজগতে তাঁর প্রথম আত্ম-প্রকাশ, গদ্য অপেক্ষা পদ্যের ব্যবহারে তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। খোসগল্পও গাথা-কবিতার নিদর্শন। তবে লঘু কৌতুকের সুর সাধারণভাবে প্রাধান্য পাওয়ায় রাজকৃষ্ণের সহজ কবিত্বের দিকটি সবসময় তেমন ধরা পড়েনি। তবু এই সব সরস গল্পেও যেখানেই সুযোগ মিলেছে সেখানেই কবিমনের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন

"চণ্ডীপুরে দক্ষিণ ধারে, বইচে নদী ধীরে ধীরে,
চন্দ্রাবতী সেই তটিনীর নাম।
যদিও সরু আকার তার, বর্ষাকালে খরধার,
গ্রীষ্মকালে বিধি তারে বাম॥

পার হওয়া যায় এখন হেঁটে,
তীরের মাটী উঠ্‌ছে ফেটে,
মাঝে মাঝে গলাখানেক জল।
কম জল তাই রবির করে, গরম হ'য়ে বইচে ধীরে,
হাঁটু জলে গজিয়ে গেছে দল॥
চন্দ্রাবতীর উভয় ধারে, দাঁড়িয়ে তরু সারে সারে,
ফুল ফুটেচে ফল ধ'রেচে কত।
কোন গাছটা ঝুঁকে আছে, আস্‌চে যেন জলের কাছে,
জল-পিয়াসে ঘাড়টি করে নত॥
লতা দিয়ে হামাগুড়ি, জড়িয়ে আছে গাছের গুঁড়ি,
ফোটা ফুলের গায়ে কুঁড়ি, ডগায় দোলে তার।
এ পার থেকে ও পার থেকে,
পাখিগুলি ডেকে ডেকে,
দেখে দেখে, থেকে থেকে হ'চ্চে নদী পার॥"[২৬]

তবে রাজকৃষ্ণের মূল উদ্দেশ্য গল্প বলা। এই গল্পগুলি অধিকাংশ সময় সমাজ-ভিত্তিক বা সামাজিক অভিজ্ঞতাভিত্তিক। যেমন, 'কুঁপোকাৎ', 'পাঁচ ঝাঁটা', 'ষোল বছুরে পেত্নী', 'আদুরে ছেলে', 'রসগোল্লা', 'টাকার তোড়া', 'নতুন বৌ'। 'কুঁপোকাৎ' ও 'পাঁচ ঝাঁটা'—গল্পদুটিতে একই ধরনের ঘটনা দেখা যায়। উচ্চ-শিক্ষিত হলেও মানুষের স্বভাব-চরিত্র সর্বদা ভালো হয় না। পরস্ত্রীতে আসক্তি শহুরে শিক্ষিত সমাজে প্রায়ই দেখা যায়। এ দু'টি গল্পেও যথাক্রমে জয় ডাক্তার এবং হেম উচ্চশিক্ষিত হয়েও দুশ্চরিত্র। কারণ তারা গৌর এবং মাধবের সতীসাধ্বী স্ত্রীদের প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু লেখক চিরকালের নীতির সমর্থক—তাই অসামাজিক প্রেমের জয় হয়নি, শেষ পর্যন্ত দুশ্চরিত্র জয় এবং চরিত্রহীন হেমের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। সর্বদেশে সর্বকালে সমাজজীবনে অবৈধ প্রেম ব্যাধিস্বরূপ এবং নিন্দনীয়। তাই একে কেন্দ্র করে রাজকৃষ্ণ রায়ও গল্প সৃষ্টি করতে ভোলেননি। তাঁর 'ষোল বছুরে পেত্নী', 'রসগোল্লা'—তারই প্রমাণ। এ গল্প দু'টিতে ত্রিভুজ প্রেমের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। রূপনারায়ণ-সৌদামিনী-গোকুলমোহন (ষোল বছুরে পেত্নী) এবং চন্দ্রচূড়-গিরিবালা-শ্যামাচরণ (রসগোল্লা)—দুটি গল্পের মূল চরিত্র। রূপনারায়ণ-সৌদামিনীর সুখের জীবনে দুশ্চরিত্র গোকুলমোহনের আবির্ভাব ঘটে। অসৎ গোকুল এবং অসতী সৌদামিনীর জীবনাবসান হয় প্রকৃতির হাতেই। কেউটের বিষেই তাদের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। এক্ষেত্রে লেখক প্রকৃতির উপরই তাদের বিচারের ভার ছেড়ে দিয়েছেন। পরবর্তী গল্পটিতে অধ্যাপক চন্দ্রচূড় এবং গিরি-বালার সংসারে ভাঙ্গন আনে রজক শ্যামাচরণ। গিরি এবং শ্যামাচরণের মধ্যে

অবৈধ প্রণয় গড়ে ওঠে। মন্দিরে চন্দ্রচূড়ের মরণকামনা করে গিরি। এই অন্যায় প্রেমের অবসান হয় চন্দ্রচূড়েরই খাঁড়ার আঘাতে। দুটি গল্পের মধ্য দিয়েই বোঝা যায় লেখক পরকীয়া প্রেমকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। আমাদের সমাজে দৈনন্দিন জীবনে এ-ধরনের অসামাজিক এবং অবৈধ প্রেমের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাই রাজকৃষ্ণের এই গল্পগুলির বিষয় যে সমাজ-সমস্যাকে ঘিরেই—তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এবং এ সব ক্ষেত্রে গল্পের পরিসমাপ্তিতে দুর্নীতিপরায়ণ, অসৎ, চরিত্রহীনদের পরাজয় ঘটবেই, কিন্তু যে নীতিনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, সত্যের পথানুসারী, চরিত্রবান—তার জয় অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দেবে। সত্যের জয় —পাপীর শাস্তি—এ নীতির দ্বারাই লেখক সর্বদা পরিচালিত হয়েছেন এবং এ গল্পগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়।

রাজকৃষ্ণের গল্পগুলিতে মানুষের পাপাচরণের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। 'কুঁপোকাৎ' গল্পে লেখক পাপের পরিণাম, পাপের পরাজয়ের দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়েছেন—

"কবি বলে পাপকর্ম্মের ফলটা হাতে হাত।
লাথির চোটে ভাগ্যে ঘটে এম্নি কুঁপোকাৎ॥"[২৭]

সে কালের সাময়িকপত্রে 'ঘোড়ার ডিম' ও 'কুঁপোকাৎ' এইজন্যই বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল—"পুস্তক দুইখানির নাম শুনিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, বটতলার সরস্বতী দেবীর দুইটি ক্রীড়নক। কিন্তু তাহা নহে, দুই খানিতেই সার-বস্তু আছে। কাঙালের ছেলের ঘোড়া রোগ হইলে কিরূপ অনর্থোৎপত্তি ও তাহাকে কিরূপ 'নাকাল' হইতে হয়, তাহা গল্পচ্ছলে প্রথম পুস্তকখানিতে দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয়খানিতে একটি সাধ্বী স্ত্রীর আদর্শ, এবং সুচিকিৎসক কুচরিত্র হইলে, তাহা হইতে কিরূপ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। দুইখানিই পদ্যপ্রবন্ধ। দুইখানিরই ছন্দোবদ্ধ এবং বর্ণনা পরিপাটি হইয়াছে।"[২৮] অন্য একটি গল্প 'ষোল বছুরে পেত্নী'-তেও পাপকে ঘৃণা করার কথা বলেছেন,—"ধর্ম্মপথে থাক্‌বে সদা—ভয় কোরবে পাপে।"[২৯] অর্থাৎ সৎপথে ন্যায়নিষ্ঠভাবে জীবন কাটানোর উপদেশই তিনি দিয়েছেন। বাংলা দেশের গ্রামে লম্পট-দুশ্চরিত্র মানুষের অভাব নেই। শহুরে শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তাদের চারিত্রিক উন্নতি ঘটে না—'পাঁচ ঝাঁটা' গল্পে হেম গাঙ্গুলী এমনই একটি চরিত্র। রাজকৃষ্ণ এদের করুণ পরিণতি দেখিয়ে হিতবাক্য উচ্চারণ করেছেন—

"কবি বলে, এম্নিতর যে সব ব্যাটা নাককাটা।
হেম গাঙ্গুলীর মতন তাদের পিঠে পড়ে পাঁচ ঝাঁটা॥"[৩০]

মানবচরিত্রে সততা সর্বদা কাম্য। দুশ্চরিত্র হলে ধর্ম তাকে রক্ষা করে না। অধর্মাচরণ মহাপাপ—এই নীতি-শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে গল্পকারের মনোভাব

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোথাও আরও স্পষ্টভাবে ধর্মের জয়গান শোনা যায়। যেমন 'রসগোল্লা' গল্পের অন্তিম দুই পংক্তিতে—

"ধর্ম্ম ছেড়ে পাপকর্ম্মে এগিও নাকো কেউ।
ধর্ম্ম নিজে হাবল সেজে তুল্‌বে মরণ ঢেউ॥"৩১

রাজকৃষ্ণের বিভিন্ন গল্পে মানুষের ষড়রিপুর অন্যতম 'লোভে'র প্রতিও সাবধান-বাণী উচ্চারিত হয়েছে। 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'—এ নীতি-বাক্যটি স্মরণে রেখে নানা গল্পে মানুষকে জীবনপথে নির্লোভ থাকতে বলেছেন রাজকৃষ্ণ। মানুষ কেমন করে তার মনুষ্যত্বটুকু হারিয়ে ফেলে, অথচ অর্থের প্রলোভনে পড়ে সে-মানুষই তার কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে কুণ্ঠিত হয় না—'টাকার তোড়া' গল্পে সে-রহস্য উদ্ঘাটন করে রাজকৃষ্ণ মানুষের অর্থ-লালসা ও তার পরিণামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা থাকা ভালো, কিন্তু স্ত্রৈণ হওয়া কোনো পুরুষেরই গর্বের নয়। স্ত্রৈণতার প্রতি কটাক্ষপাত লক্ষ্য করা যাবে 'আদুরে ছেলে' গল্পে। হিতোপদেশ মানুষের মঙ্গলের জন্য, কিন্তু অনেকের কাছে তা আপত্তিকর 'জ্ঞানদান' বলে মনে হয়। সংকথা না শোনার বিড়ম্বনা অনেক। যেমন, 'ঘোড়ার ডিম' গল্পে নফরচাঁদের ভাগ্যে অপ্রাপ্তির বেদনা দেখা দিল—এই কথার বাজী ধরেই। নফরচাঁদের মতো 'হিতবাক্য যার পক্ষে নিম', তার কপালে যে ঘোড়ার ডিম জুটবে এটাই স্বাভাবিক। আরও কঠোর শাস্তি যে তাকে পেতে হয়নি, এই তার ভাগ্য। চারিত্রিক বহু বৈশিষ্ট্য যে জন্মসূত্রে মানুষ পিতামাতার কাছ থেকে অর্জন করে—ভালোমন্দ যাইহোক—তা রাজকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছিলেন। বাবা-মা সন্তানের কাছে আদর্শস্বরূপ। সেই কারণেই তাদের নিজেদের চারিত্রিক দোষ-গুণ সম্পর্কে সচেতনার প্রয়োজন। মা-বাবার কুপ্রভাবে সন্তান কুচরিত্র হয়ে ওঠে। মা কলহপরায়ণা হওয়ায় পুত্র গদাধরের আচরণ কত ভয়ানক হয়—'গেঁজেল গদা' গল্পে তার প্রমাণ পাই। গল্পকার এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন এইভাবে—

"কবি বলে, বাপ-মা যাদের ঝগড়া ভালোবাসে।
ছেলে তাদের গদার মত বিগ্‌ড়ে ওঠে শেষে॥"৩২

মানবচরিত্র বিচিত্র। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মানুষের স্বভাবের রূপান্তর, চরিত্রের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সাংসারিক জীবনে অতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারী মানুষের সন্ধান যেমন মেলে, তেমনই স্ত্রৈণ ব্যক্তিও বিরলদৃষ্ট নয়। রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর 'আদুরে ছেলে' গল্পটির মধ্য দিয়ে এ-ধরনেরই এক স্ত্রৈণ চরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন। দয়ালবাবু স্ত্রী গৌরবিণীর কথায় ওঠেন বসেন, তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা বলে কিছু নেই। স্ত্রীর এবং সেই সঙ্গে আদুরে ছেলের মন জুগিয়ে কাজ করতে করতে তাঁর অবস্থা শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়িয়েছে, কত করুণ হয়েছে—তা লেখক দেখিয়েছেন। স্ত্রীর অত্যধিক অনুরাগী হওয়ায় শেষ পর্যন্ত রাতদুপুরে তাঁকে পুত্রের

আবদাররক্ষার্থে স্ত্রীর নির্দেশে বাঁদর সেজে এবং বাঁদর নাচ নেচে তাদের সন্তুষ্ট করতে হয়েছে। এ গল্পে রাজকৃষ্ণ সমাজের আর একটি দিকও সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। বিত্তবান, প্রজাপীড়ক জমিদার শ্রেণীর চিত্র দয়ালবাবুর চরিত্রে ফুটে উঠেছে। সেইসঙ্গে জমিদারের ইয়ারবন্ধু, দাসদাসীদের চরিত্র চিনে নিতেও আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না।

মানুষের জীবনে অর্থ সব অনর্থের মূল। টাকার জন্য মানুষ কী ভীষণ নিষ্ঠুর, নীচ, স্বার্থপর হতে পারে---তারই দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন রাজকৃষ্ণ 'টাকার তোড়া' গল্পকাহিনীর মধ্য দিয়ে। বৃদ্ধ হয়ে গেলে মানুষ যখন আর অর্থোপার্জনে সক্ষম হয় না, তখন প্রায়ক্ষেত্রেই সংসারে তার দুর্ভোগ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত পুত্র-পুত্রবধূর সংসারে পিতা অনেকসময় গলগ্রহ রূপেই থাকেন। এই নিয়ে নিত্য-নৈমিত্তিক অশান্তির সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবে রাজকৃষ্ণের লেখনীতে আমাদের সমাজের রূঢ় বাস্তব এই সত্যকাহিনী রূপ পেয়েছে বদন বসু, পুত্র রাধামাধব, পুত্রবধূ রাইকিশোরী চরিত্রকে ঘিরে। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কেশব গোঁসাই ও নাপ্তে কেলী। বদনের প্রতি রাইকিশোরীদের অনাদর-অবহেলা সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু যখন বদনের টাকার সুর শুনলো, তখনই বৃদ্ধের প্রতি সকলের ব্যবহার পরিবর্তিত হয়ে সহানুভূতিপূর্ণ হয়ে উঠলো। টাকার লোভে তাদের ব্যবহারেও রূপান্তর ঘটলো।

'নতুন বৌ' গল্পেও সামাজিক সমস্যার এবং সত্যের উদ্‌ঘাটন হয়েছে। আমাদের সমাজে বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল এবং সন্তান না হলে বংশরক্ষার্থে অনেকক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী পরিগ্রহণ করা হতো। নবীনা স্ত্রীর গুরুত্ব অনুভব করে তাকে অত্যধিক মূল্য দেওয়া হতো, ফলে প্রাচীনা পত্নীর কপালে জুটতো অশেষ দুর্ভোগ, লাঞ্ছনা। নিজের জীবন-ধারণ এবং ভরণ-পোষণের বিনিময়ে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতে হতো—সহ্য করতে হতো নীরব অবহেলা---অকারণ অপমান। প্রয়োজনে কিন্তু সেই স্ত্রীই এগিয়ে আসতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। নতুন বৌ নিজের স্বার্থ নিয়েই থাকতো, তার লক্ষ্য সম্পত্তি। আলোচ্য গল্পে কমলমণি-রসিকহৃদয়-নয়নতারার মধ্য দিয়ে অনুরূপ চিত্রই স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে।

'চীনের কলসী' গল্পটির কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের ক্ষীণ সম্বন্ধ আছে। সে কালের ক্রীতদাসী বালিকা—এ কাহিনীর মূল চরিত্র। পরাজিত রাজ্যের মানুষকে বিজয়ী রাজা কিভাবে নিজদেশে ক্রীতদাস করে রাখতেন—তা আমরা জানতে পারি। কিন্তু ক্রীতদাসের কাছে অর্থাপেক্ষা নিজের দেশে স্বাধীনতার সুখ যে অনেক বড়, তার প্রমাণ বালিকাটির চরিত্রের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। 'চীনের কলসী' গল্পটি রাজকৃষ্ণ রায়ের 'গ্রন্থাবলী'তে স্থান পেলেও, এটি শরচ্চন্দ্র দেবের রচনা বলে মনে হয়। শরচ্চন্দ্র দেব রাজকৃষ্ণের জীবনী রচনাকালে জানিয়েছেন 'বীণা'

পত্রিকার তৃতীয় বর্ষে "অপরাপর একজন লেখকের চীনের কলসী নামক গল্প বাহির হইয়াছিল।"৩৩

'এ মেয়ে পুরুষের বাবা' ও 'বোকা শিবে'—দুটি ভিন্ন স্বাদের গল্প। প্রথম গল্পে বাদশা মহামদ শ'-এর খেয়ালীপনা এবং উজীর মইজুদ্দীনের চতুরা কন্যা রোশিনারার উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয় পাই। এ গল্পের প্রতিপাদ্য—নারীর বুদ্ধিই বেশি। দ্বিতীয় গল্পে অকর্মণ্য লোক শিবকিঙ্কর কিভাবে চতুরতা ও কৌশলের সাহায্যে তার অবস্থার আমূল পরিবর্তন করে উন্নতি করলো, তা দেখা যায়।

'ঘোড়ার ডিম' ও 'গেঁজেল গদা' রাজকৃষ্ণের দু'টি দুর্বল রচনা। 'ঘোড়ার ডিম' গল্পে দরিদ্র নফরের ঘোড়া কেনার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিভাবে ঘোড়ার ডিম ভেবে চূণ-মাখানো পচা কুমড়ো কিনে সে বোকামির পরিচয় দেয়—তা আমরা জানতে পারি। পরবর্তী গল্পে বিরাট সংগীতসাধক গঞ্জিকাপ্রিয় ময়রা গদাধর এবং তার মা কলহপরায়ণা বুড়ি তারার সাক্ষাৎ আমরা পাই। পরস্পরের তিক্ত সম্পর্ক, বিবাদ-বাক্‌যুদ্ধ-অবশেষে মায়ের মুমূর্ষু অবস্থা এবং গদাকে চৌকিদারের ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা গল্পে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর তুচ্ছতা প্রকৃতপক্ষে দু'টিকেই ব্যর্থ গল্পের পর্যায়ভুক্ত করে তুলেছে। তবে সে কালের পাঠক যে এ ধরনের গল্পও পছন্দ করেছেন তার প্রমাণ সাময়িক পত্রিকার মন্তব্য—"অতি সহজ ভাষায়, বেশ নাচ্‌নি ছন্দে খোস গল্পগুলি রচিত। এক পৃষ্ঠা পড়িলেই কবির ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের পল্লীগাঁয়ের দুরবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, এবং কাব্য লিখিতেছেন বলিয়া কোন স্থানে অতিরঞ্জিত করেন নাই। যেটি যেমন, সেটি ঠিক সেইভাবে রাখিয়াছেন, অথচ সমস্ত দৃশ্যের উপর কাব্যের এমনই একটি সুন্দর আবরণ আছে যে, পড়িলে আনন্দ হয়, মন হরণ করে।"৩৪

রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর কোনো কোনো গল্পকে অলৌকিক রসসিক্ত করেছেন। 'অদ্ভুত গল্প' (রাজকুমারী সরলা) এবং 'দুই সন্ন্যাসী'—এ ধরনেরই দু'টি গল্প। 'অদ্ভুত গল্প'—রূপকথার গন্ধ-মাখানো। এর কাহিনী রাজা মহেন্দ্রবিক্রম, রাজকন্যা সরলা, রাজপুত্র চন্দ্ররশ্মি এবং এক দাসীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। লোকাতীত নানা ঘটনার সমাবেশ হয়েছে এ গল্পে। যেমন—'ভানু-মণি-পেটারিকা'র ক্রিয়াকলাপ একান্তই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সূচীবিদ্ধ রাজকুমারকে সূচীমুক্ত করা—এক হিসাবে রূপকথার জগতের ঘটনা। একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মতো, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র-'কাজললতা' গল্পের কাহিনীর সঙ্গে এ গল্পের কাহিনীর সাদৃশ্য। অনেকাংশে দু'টি গল্পে মিল লক্ষ্য করা যায়।

'দুই সন্ন্যাসী' গল্পে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ হয়েছে। ভাগ্যধর এ-গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার স্বপ্নদর্শন, ইচ্ছাপূরণ নিয়েই এর কাহিনী

দানা বেঁধেছে। সৎকর্মে অর্থব্যয় করলে সুফল পাওয়া যায়—রাজকৃষ্ণের এ ধারণা ব্যক্ত হয়েছে ভাগ্যধর চরিত্রের ক্রিয়াকলাপে মধ্য দিয়ে। কিন্তু লেখক ভাগ্যধরের (পরে যার নাম হয় সখানন্দ) ইচ্ছাপূরণ করতে গিয়ে নানা অলৌকিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। অবাস্তব ঘটনায় পরিপূর্ণ এ-গল্প। বান্ধবানন্দের রহস্যজনক পুঁটলী, গাছের ডালের সাহায্যে নিজেকে অদৃশ্য রাখা, ডানা লাগিয়ে আঁধার রাতে উড়ে যাওয়া, গুরু যাদুকরেরর দশহাজার দশজন প্রেমিককে বুলি দিয়ে ব্রত উদ্‌যাপন, কামরূপের রূপবতী রাজকন্যার অমরত্ব লাভের প্রয়াস,—সবই বড় অবাস্তব বলে মনে হয়। তবে গাছের ডালের সাহায্যে আচ্ছন্ন করে রাখা বা সাময়িক আচ্ছন্নতা থেকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কবিরাজী শাস্ত্রজ্ঞান অবাস্তব বা অস্বাভাবিক নয়। রাজকৃষ্ণ এ কাহিনীবিন্যাসে শুধু অলৌকিকতা নয়, যাদুবিদ্যারও উল্লেখ করেছেন। রাজকন্যার গোপন রহস্যজাল সৃষ্টি করতে রাজকৃষ্ণের এ যাদুকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ। সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হতে হয়, যখন জানা যায়—এ গল্পের বিশিষ্ট চরিত্র বান্ধবানন্দ আসলে মৃত আত্মা—জীবিত ব্যক্তি নয়। তখন বাস্তবের স্পর্শ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয় এ-গল্প।

বাস্তব-অবাস্তব সবরকম কাহিনীরই সন্ধান মেলে রাজকৃষ্ণের গল্পে। ঘটনার চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন—তার প্রমাণস্বরূপ অলৌকিক গল্পগুলির উল্লেখ করা যায়। আর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর গল্পকাহিনীতে ধরা পড়ে—তা হলো নাট্য-উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে তোলা। বিশেষত তাঁর সামাজিক গল্পগুলিতে এই নাটকীয়তার আভাস লক্ষ্য করা যায়। গল্পের পরিণতি জানার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অবশ্য এ-কৌতুহল তাঁর ভিন্নস্বাদের গল্পগুলিতে, 'চীনের কলসী' বা অলৌকিক গল্পগুলির ক্ষেত্রেও আছে বলে মনে হয়। অধিকাংশ কাহিনীতে গল্পরস জমিয়ে তুলতে লেখকের কিছুমাত্র অসুবিধা হয়েছে বলে মনে হয় না—'খোসগল্পে'র মেজাজ সর্বত্রই বর্তমান।

খোসগল্পে কৌতুকের ভাব প্রাধান্য পাবে এটাই স্বাভাবিক। তবে সূক্ষ্ম বা গভীর হাস্যরস সৃষ্টি নানা কারণেই রাজকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সে কালে দর্শকদের হাসাবার জন্য যে-প্রহসন পরিবেশন করা হতো তাতে একধরনের স্থূল কৌতুকের উপাদান থাকতো। অবশ্য হাসির মধ্যে প্রায় সময়েই একটা স্থূলতা লুকিয়ে থাকে, তাই পরিশীলিত-চিত্ত প্রবীণের কাছে হাসির ব্যাপার পরিত্যাজ্য। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বলা হয়েছে "স্ত্রী নীচবাল মুর্খাদি বিষয়ো হাস্য ইষ্যতে। প্রহাসশ্চাতিহাসশ্চ ধীরাণাং নৈব্য দৃশ্যতে।"[৩৫]—নাটকাদিতে স্ত্রী-নীচবালমূর্খাদি বিষয়েই হাসি কাম্য। ধীর চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রভাস বা অতিহাস কখনোই দেখানো উচিত নয়। আরিস্টটলও অনেকটা এই ধরনের কথাই বলেছেন,

"Comedy is···an imitation of characters of a lowar type—not however, in the full sense of the word bad, the ludicrous being merely a sub-division of the ugly."[৩৬]

নীচধরনের চরিত্র যাকে কুৎসিতেরই একটি অংশ বলা হচ্ছে, তার অনুকরণ যে হাসির জন্ম দেয় তাকে খুব উচ্চস্তরের সাহিত্য-নিদর্শন বলা যায় না। তবে কৌতুকহাস্যের মধ্যে একটা 'ছেলেমানুষি'র দিক আছে, যার প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ প্রবল। রবীন্দ্রনাথ কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে আলোচনাকালে "ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসংগতি, কথার সহিত কার্যের অসংগতি"র[৩৭] মধ্যে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা দেখলেও তার মধ্যে হাসির উপাদান লক্ষ্য করেছেন। অপরের দুর্দশা যখন অন্যের আত্মপ্রসাদের কারণ হয় তখন "we always find an avowed intention to humiliate, and consequently to correct our neighbour."[৩৮]

রাজকৃষ্ণের খোসগল্পে মানুষের চরিত্রগত নির্বুদ্ধিতা, লোভ, অসৎ-আচরণ শুধু কৌতুকের সামগ্রী হয়ে থাকেনি, তার উপস্থাপনায় লেখকের তিরস্কার করার ও সংশোধন করার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। গল্প হিসাবে কৌতুকের স্পর্শে এগুলি যেমন উপভোগ্য তেমনি প্রহসনকার রাজকৃষ্ণের সমাজচেতনার পরিচয়ও বহন করে বলে রচনাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রত্যেকেই নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মনে করে, তাই অন্য কেউ বোকামি করছে বা নাকাল হচ্ছে দেখে মানুষ আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এর মধ্যে কখনো নিছক কৌতুকবোধ কাজ করে যেমন, ঘোড়ার ডিম সংগ্রহে নফরের উদ্যম ও তার পরিণাম বর্ণনায়। চতুর দোকানী পাঁচ টাকা বাকি রেখে এক টাকায় তথাকথিত ঘোড়ার ডিম দিতে রাজি হয়। নির্বোধ নফর নিজেকে ভাবে বুদ্ধিমান—সে পাঁচ টাকা কোনোদিনই শোধ দেবে না, এক টাকাতেই মহামূল্যবান ঘোড়ার ডিম আয়ত্ত হয়। কিন্তু "কালনিমের সে লঙ্কাভাগ। / নফরচাঁদের তেমনি ভাগ, / পাথর ভেবে প্রবল স্রোতে ধস্‌কা বালির বাঁধ।"[৩৯] পাঠকের মজা লাগে নির্বোধের এই বুদ্ধিমান সাজার প্রয়াসে। দোকানী চুনমাখানো পচা কুমড়োকে ঘোড়ার ডিম বলে নফরকে বিক্রয় করে, শুধু সাবধান করে দেয়, মাটিতে রাখা চলবে না এই ডিম। ক্লান্ত বিধ্বস্ত নফর ডিমের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে একটি লাউয়ের মাচায় ঝুড়ি রাখে, কিন্তু হঠাৎ মাচা ভেঙে "ধপাস করে শব্দ হলো। / একটা শিয়াল লুকিয়েছিল। / চমকে উঠে পালিয়ে গেল মাচার তলা ছেড়ে"। আর "অমনি নফর লাফিয়ে উঠে। / 'ঘোড়ার ডিম যে গেল ফুটে। / ঐ যে ঘোড়ার বাচ্চা ছোটে', / বলে ছোটে তেড়ে।"[৪০] আধুনিক পাঠক এই ধরনের গল্প শুনে

খুশি হয় না সত্য, কিন্তু নফরের এই নাকাল হওয়ার গল্প এককালে বাঙালিকে আনন্দ দিত।

নাকাল না হয়ে বোকা যদি কখনও বুদ্ধির পরিচয় দেয়, আর বোকা শিবের মতো কেউ 'এক জোড়া শাল হাজার টাকা' বক্শিস পায়, তাহলে আর এক ধরনের 'আমোদ' সৃষ্টি হয়। শিবশঙ্কর বা 'বোকা শিবে' "বড্ড বোকা, যেমন বোকা তেমনি ন্যাকা। / কাজের বেলায় ভ্যাবাচ্যাকা, খাবার বেলায় পাকা"[৪১]—কিন্তু ভাগ্য তার অনুকূল। এখানে ঘটনার চমকই কৌতুক সৃষ্টি করে,—ফুলুরির সংখ্যা-নির্ণয়ে, হারিয়ে যাওয়া ভেড়ার সন্ধান নির্দেশে বা বিষ্ণুপুরের রাজার ছেলের হীরের হার চুরির রহস্যভেদে শিবের সাফল্য তার গণনাকৌশল বা বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন নয়। আসলে বোকা শিবের দারিদ্র্য দূর করতে হবে, তাই কবি এমন এক কাহিনী রচনা করেন, যেখানে "দৈবলীলার কেমন খেলা কেউ বুঝতে নারে। / বোকা শিবে বিপদ থেকে বাঁচলো বারে বারে। / সত্য কথা, দয়াল হরি যখন দয়ায় ভান। / আপনা হতে সিদ্ধি এসে হয় মূর্তিমান।"[৪২] অথচ খোসগল্পের কোথাও 'দৈবলীলা'র মাহাত্ম্য প্রদর্শন করা হয়নি।

ঘটনাচক্রে এখানে দুষ্টের শাস্তি ঘটে, দুর্গত বিপন্ন পুরস্কৃত হয়। জয় ডাক্তার বা হেম গাঙ্গুলী দুশ্চরিত্র—পরস্ত্রীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়। পরিণামে জয় ডাক্তারকে শুধু লাথির ঘায়ে মাটিতে লুটোতে হয় না, নাকে খৎও দিতে হয়, আর হেম গাঙ্গুলীর কপালে জোটে পাঁচ ঝাঁটা। উপকথা লোককথার চরিত্রপরিকল্পনায় জটিলতা প্রত্যাশিত নয়। চরিত্রগুলি সাধারণত একমুখী সমতলসদৃশ অর্থাৎ flat character। চরিত্রের অন্তর্জগৎ এবং স্ববিরোধী প্রবৃত্তির প্রকাশ এখানে ঘটে না। কিন্তু কৌতুক সৃষ্টির জন্য এই ধরনের চরিত্রই বেশি উপযোগী। নির্বুদ্ধিতা বা কপটতা এই ধরনের চরিত্রের একমাত্র পরিচয়। চরিত্রগুলিকে আমাদের চেনা জগৎ থেকেই তুলে আনা হয়েছে। রাজকৃষ্ণের কৃতিত্ব, অল্প কয়েকটি রেখায় একটি চরিত্রকে জীবন্ত প্রত্যক্ষবৎ করে তোলায়, যেমন গোকুলমোহনের বর্ণনা—

"নামটি মধুর—গোকুলমোহন, বয়েস সাতাশ ঘেঁসে
মদের বোতল উজোড় করে, গাঁজাও টানে কোসে।
পাঁচপাঁচী গোচ গড়নখানা, ওজনখানা ভারি
তুঁদিয়ে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায় ডরায় নরনারী।
কথায় কথায় রেগে ওঠে, চেঁচিয়ে ওঠে কড়া
চাকরদিগে ঠেঙিয়ে মারে, দুষ্টু ধেড়ে ছোঁড়া।"[৪৩]

কিংবা রূপনারায়ণের চেহারা ও বেশভূষার বিবরণ—

"সাদাসিদে ধরণখানা, গড়নখানা ক্ষীণ
কাঁচা পাকা চুল মিশানো, কানে আঁচীল চিন।

টাক্‌পড়া তাঁর ব্রহ্মতালু, ধারে বিরল চুল
নামে শিখ', কাজে বাঁধা রয় না তাতে ফুল।
চটি জুতা পরেন পায়ে, ধরেন বেতের ছাতি
জাঁকজমক নাই সাজসজ্জার—সাদা চাদর ধুতি।"[৪৪]

খোসগল্পে নিছক কৌতুকসৃষ্টি প্রাধান্য পেলেও কোথাও কোথাও রাজকৃষ্ণের সমাজ ও স্বদেশচিন্তার পরিচয়ও মেলে। সেখানে বিদ্রূপ বা শ্লেষের ভঙ্গিটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাবে। বাঙালির মধ্যে দান করার ইচ্ছা শুধু দেখা যায় 'সাহেব-সুবো চাইলে চাঁদা'। কারণ সেখানে লক্ষ্য,—

"গেজেটেতে নাম উঠবে, পড়বে লাটের চোকে।
'দাতা বাবু' 'রাজা' খেতাব পাবেন হাসিমুখে॥
'রায় বাহাদুর' কেউ বা হবেন, কেউ বা 'মহারাজ'।
ভুঁইশূন্য রাজরাজড়ার ধামাধরার কাজ॥
দেখচি এবার বদ্দি ভায়া। তোমার পোহাবারো।
বিষ্ণুতেলের চড়াও খোলা, মসলা যোগাড় করো॥
বাঙ্গালাদেশের 'রায়বাহাদুর' 'রাজা' 'মহারাজা'।
তোমার তেলে সাহেব প্রভুর করবে জুতো সোজা॥
'রায় বাহাদুর' 'মহারাজা' 'রাজা' ছাড়া আর।
'খাঁ বাহাদুর' 'নবাব সাহেব' তোমার খরিদ্দার॥
'K. C. S. I.' 'C. S. I.' 'আর C. I. E.' খেতাবধারী।
বদ্দি ভায়া! বিষ্ণুতেলের এরাও গোঁড়া ভারী॥"[৪৫]

তবে এ ধরনের ব্যঙ্গ খোসগল্পে সর্বত্র নেই। সরস বৈঠকী গল্প জমিয়ে বলা রাজকৃষ্ণের উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে সে কালের পাঠকের রুচি ও প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। বাংলা গল্পের আবহমান ইতিহাসে রাজকৃষ্ণের গল্প কোনও অভিনব সংযোজন নয়, কিন্তু সেই ধারাকেই তা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে এমন বললে অন্যায় হবে না।

১. W. S. Maugham, 'The Art of Fiction', *Ten novels and their authors*, Penguin Books, 1969, p. 22.
২. দ্র. "It is a narrative of events arranged in their time sequence—dinner coming after breakfast, Tuesday after Monday, decay after death, and so on.' E. M. Forster, *Aspects of the Novel*, London, 1949, p. 29.
৩. দ্র. "জ্ঞানাঞ্জন-প্রলেপন এবং চিত্ত-বিনোদন, এই দ্বৈত প্রেরণা থেকেই গল্পের

আবির্ভাব।" নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, ১৩৬৯, পৃ. ২।
৪. দ্র. A. Berriedale Keith, *Classical Sanskrit Literature*, 1958, p. 59.
৫. দ্র. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭১, পৃ. ১২৯।
৬. সূচনা, কথা ও কাহিনী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৭২ পৃ. ৫।
৭. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অবশ্য পদ্য-গল্পকে 'গাথা' নামে অভিহিত করার যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। দ্র. 'গল্প', কি লিখি, কলিকাতা, ১৩৬৩, পৃ. ১৩৫।
৮. প্রভাময়ী দেবী, বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮, পৃ. ২৫-২৬।
৯. দ্র. Alokeranjan Dasgupta, *The Lyric in Indian Poetry*, Calcutta, 1962, p. 3-6.
১০. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃ. ৬৯।
১১. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬৬।
১২. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ১৯৩৭।
১৩. "I have not been doing much in the poetical line, of late, beyond imitating a few Italian and French things."—মধুসূদনের পত্র। দ্র. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত মধুসূদন রচনাবলী, ১৯৬৫, পৃ. ৪৫।
১৪. মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৫, পৃ. ১৮৮, পৃ. ১৯৪, পৃ, ১৯২।
১৫. ষোল বছুরে পেত্নী, 'খোসগল্প', রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, ১৩১৯, পৃ. ১৯। পরে 'খোসগল্প' নামে উল্লিখিত।
১৬. ঘোড়ার ডিম, 'খোসগল্প', পৃ. ৪।
১৭. দ্র. অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, কলিকাতা, ১৩৩৪, পৃ. ৫০৫।
১৮. দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, গিরিশ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ, ১৯৭১, পৃ. ৭৪৪।
১৯. তদেব, পৃ. ৭৭৩।
২০. অরুণকুমার মিত্র, অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৩৬৫।

২১. ঘোড়ার ডিম, 'খোসগল্প', পৃ. ৩।
২২. 'অদ্ভুত গল্প', রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ, ৩৮-৪৫।
২৩. 'চীনের কলসী', রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ১-৭।
২৪. 'দুই সন্ন্যাসী', রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৮-২৭।
২৫. ষোল বছুরে পেত্নী, 'খোসগল্প', পৃ. ১৪।
২৬. পাঁচ ঝাঁটা, 'খোসগল্প', পৃ. ৮-৯।
২৭. কুঁপোকাৎ, 'খোসগল্প', পৃ. ৮।
২৮. এডুকেশন গেজেট, ৮ আশ্বিন, ১২৮৮, পৃ. ।।.।
২৯. ষোল বছুরে পেত্নী, 'খোসগল্প', পৃ. ১৯।
৩০. পাঁচঝাঁটা, 'খোসগল্প', পৃ. ১২।
৩১. রসগোল্লা, 'খোসগল্প', পৃ. ৩০।
৩২. গেঁজেল গদা, 'খোসগল্প', পৃ. ৩৫।
৩৩. শরচ্চন্দ্র দেব, রাজকৃষ্ণ জীবনী, রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ, ১৯১৫ পৃ. ।/.।
৩৪. সাধারণী, ৩রা আশ্বিন, ১২৮৮, পৃ. ।।.।
৩৫. জগদ্ধর, সঙ্গীতসর্বস্ব। অজিত দত্তের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস (১৯৬০) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৮।
৩৬. S. H. Butcher, *Aristotle's Theory of Poetry And Fine Art*, with a critical text and translation of the Poetics, Dover Publications, 1951, p. 21.
৩৭. 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা', পঞ্চভূত, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৬৬, পৃ. ৬২৫।
৩৮. Bergson, *Laughter*, দ্র. অজিত দত্ত, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, পৃ. ৯।
৩৯. ঘোড়ার ডিম, 'খোসগল্প', পৃ. ৪।
৪০. ঘোড়ার ডিম, 'খোসগল্প', পৃ. ৪।
৪১. বোকা শিবে, 'খোসগল্প', পৃ. ৫১।
৪২. বোকা শিবে, 'খোসগল্প', পৃ. ৬১।
৪৩. ষোল বছুরে পেত্নী, 'খোসগল্প', পৃ. ১২।
৪৪. ষোল বছুরে পেত্নী, 'খোসগল্প', পৃ. ১৩।
৪৫. কুঁপোকাৎ, 'খোসগল্প', পৃ. ৬।

## অনুবাদ কাব্য

অল্প বয়স থেকেই অনুবাদকর্মে রাজকৃষ্ণের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেছে। যদিও স্কুল-কলেজে উচ্চশিক্ষার সুযোগ তিনি পাননি, কিন্তু নিজের চেষ্টায় ইংরেজি ও সংস্কৃত ভালোভাবে শিখেছেন। কত ভালোভাবে শিখেছেন তার প্রমাণ ইংরেজি ও সংস্কৃত থেকে রাজকৃষ্ণ-কৃত অনুবাদ-কাব্য। অনুবাদের কাজে তাঁর আগ্রহের কারণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পুষ্ট করা। সেই সঙ্গে সাধারণ পাঠক যাঁরা ইংরেজি বা সংস্কৃত জানেন না, তাঁদের সাহিত্যরস-পিপাসা নিবৃত্ত করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। 'বীণা' পত্রিকা সম্পাদনাকালে দেখা যাবে, নিয়মিতভাবে তিনি বিচিত্র ধরনের কবিতা ও গান অনুবাদ করেছেন। যেমন, হিউ ফ্রেজার সংকলিত 'ফোকলোর ফ্রম ইস্টার্ণ গোরখ্‌পুর' থেকে 'উত্তর পশ্চিম'প্রদেশের পূর্ব্ব-গোরখ্‌পুরী গীত' (কার্ত্তিক ১২৯৩), 'দি লেডিজ ট্রেজারি' গ্রন্থে প্রকাশিত জার্মান কবিতার ইংরেজি ভাষান্তর থেকে অনূদিত 'নিরাশ প্রেম' (পৌষ ১২৯৩), 'ফোকটেল্‌স ফ্রম দি আপার পাঞ্জাব' গ্রন্থ থেকে 'পাঞ্জাবী কাহিনী' (ফাল্গুন ১৩৯৩), জেফারসনের 'এ জার্নি অফ ডিসকভারি' থেকে 'নীতি-কবিতা' এবং ভিনসেণ্ট স্মিথের 'পপুলার সঙ্‌স অফ হামিরপুর ডিস্ট্রিক্‌ট ইন বুন্দেলখণ্ড' থেকে 'বুন্দেলা জাতির গীত' (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪) প্রভৃতি। নিতান্ত বালক বয়সে যখন রাজকৃষ্ণ ফ্রী চার্চ ইনস্টিটিউশনের ছাত্র তখন থেকেই ইংরেজি কবিতার বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেছেন। ফলে 'অবসর-সরোজিনী'র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি তিনি ইংরেজি কবিতার ভাবানুবাদ বলে উল্লেখ করলেও, অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁর রচনা হয়ে উঠেছে ইংরেজি কবিতার নবরূপান্তর তথা অনুসৃষ্টি (ট্রান্স-ক্রিয়েশন)। 'ভারতী' পত্রিকার সমালোচক অভিযোগ করেন, "গ্রন্থকার কিঞ্চিৎ অকাতরে ইংরেজী কবি হইতে ভাব লুণ্ঠন করেন। স্থানে স্থানে দু একটি ভাব দেখিতে পাইলে আমরা একথার উল্লেখই করিতাম না,—কিন্তু তাঁহার 'নিভৃত নিবাস' নামক কাব্যের ৪৬ পৃষ্ঠা হইতে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কেবল অপহৃত 'বমালে' পরিপূর্ণ। ইংরাজী কবি শেলীর কুইন ম্যাব নামক কবিতার আরম্ভের সহিত পাঠকগণ উক্ত দশ পৃষ্ঠার তুলনা করিলেই আমাদের কথার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন।"[১] বালক রবীন্দ্রনাথও 'অবসর-সরোজিনী' সমালোচনাকালে অনুরূপ ভাবে হেরিক ও মুরের কবিতার ভাবাবলম্বনে লেখা 'মধুমক্ষিকা-দংশন' ও 'প্রবাহি চলিয়া যাও অয়ি লো' তটিনী'র কথা বলেছেন।[২] অবশ্য 'দি উণ্ডেড কিউপিড' কবিতাটি হেরিকের লেখা নয়, কবিতাটির রচয়িতা আনাক্রেয়ন (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাটির একটি সুন্দর অনুবাদ করেছেন,—'শিশু-কন্দর্পের শাস্তি'[৩])। কিন্তু

ভাবানুবাদে রাজকৃষ্ণের সাফল্য কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না—তিনি আদৌ আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করেননি, মূল কবিতার ভাবটি বাংলা ভাষায় সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন, আর তাই মদনের মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁর কবিতায় রতি। হেরিক-কৃত ইংরেজি অনুবাদের শেষ কয়েকটি পংক্তির বঙ্গীয় রূপান্তর এখানে উল্লেখ করা যায়—

"At which she smiled ; then with her hairs
And kisses drying up his tears
Alas, said she, my wag ! if this
Such a pernacious torment is ;
Come, tell me then, how great's the smart
Of those thou woundest with thy dart ?"

—"ব্যথিত হৃদয়ে, অথচ হাসিয়ে / কহে কামে রতি, হাতে হাত দিয়ে ;—/ ছোট মৌমাছি দিয়েছে বিঁধিয়ে / বিষভরা হুল তোমার পায় ; / তাই তুমি, নাথ, হইলে কাতর ! / ভাল, বল দেখি দাসীর গোচর,—/ কতই জ্বলিবে তাহার অন্তর, / পঞ্চশর তুমি বিঁধিবে যায় ?" এখানে যেটুকু ভাব-বিস্তার লক্ষ্য করা যাবে, তা কবিতার আবহ বা বিশেষ ভঙ্গির দিক থেকে আদৌ আপত্তিকর নয়, বরং ছয় মাত্রার কলাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে কবির কৃতিত্ব খুবই প্রশংসনীয়। ( রুদ্ধদল অবশ্য এখানে সাধারণভাবে একমাত্রা বলে পরিগণিত। )

রাজকৃষ্ণের রচনাবলীর মধ্যে ইংরেজি গীতিকবিতার অনুবাদ প্রয়াস প্রচুর দেখা যাবে, তবে দীর্ঘ আখ্যানকাব্যের অনুবাদে তিনি একবারই আত্মনিয়োগ করেছেন—'অশ্বায়নের কবিতাবলী'। গেলিক ভাষা থেকে জেমস ম্যাকফার্সন ( ১৭৩৬-১৭৯৬ ) অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওসিয়ানের কাব্য 'কাথ্-লোদা' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। সমালোচকেরা অবশ্য ম্যাকফার্সনের রচনাকে অনেক পরিমাণে তাঁর নিজের রচনা বলে অভিহিত করেছেন—"His *Fingal* and *Temora* purported to be translations of the Gaelic of Ossian but it seems likely that, while he used Gaelic fragments, they are largely his own invention."[8] 'কাথ্-লোদা' কাব্যের কাহিনী হলো, ফিঙ্গল যৌবনে ওর্কনেস-এর উদ্দেশে সমুদ্র-যাত্রা করলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সে ডেনমার্কে গিয়ে পৌঁছয়। রাজা স্তার্নো তাকে একটি ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করলে, ফিঙ্গল তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। স্তার্নো তখন তাঁর পুত্রকে বলে রাত্রিতে নিদ্রিত ফিঙ্গলকে হত্যা করতে। কিন্তু পুত্র প্রস্তাব অস্বীকার করলে ফিঙ্গল যেখানে ঘুমিয়ে আছে সেখানে পিতা স্বয়ং এসে হাজির হন। ফিঙ্গল পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে আগেই সতর্ক হয় এবং স্তার্নোকে

একটি ওক্ গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলতে সক্ষম হয়। সকালে যখন সে শৃঙ্খলিত রাজাকে দেখে তখন তাকে মুক্তি দিয়ে ফিঙ্গল বলে—"I have spared thy life for the sake of thy daughter, who once warned me of an ambuscade."

রাজকৃষ্ণ 'কাথ্-লোদা' কাব্যের সবটুকু অনুবাদ করে উঠতে পারেননি, ফলে 'অসম্পূর্ণ' অংশটি 'গ্রন্থাবলী'তে স্থান পেলেও স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে কোনোদিন প্রকাশিত হয়নি। 'অশ্বায়নের কবিতাবলী' প্রথমে 'বীণা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়,[৬] কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় দুয়ান্ অনুবাদের পর তৃতীয় দুয়ানের অনুবাদ শুরু করলেও সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে রাজকৃষ্ণ যেটুকু অনুবাদ করেছেন তা থেকে তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। 'ওসিয়ান' যেমন 'অশ্বায়নে' রূপান্তরিত, তেমনি অধিকাংশ বিদেশি চরিত্রের স্বদেশি নামান্তর ঘটেছে, যার মধ্যে 'পিঙ্গল' অন্যতম। রাজকৃষ্ণের রচনার নিদর্শন হিসাবে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—"প্রাচীন কালের দিকে দেখি তাকাইয়া, / কিন্তু তাহা অশ্বায়ন-চক্ষের উপর / ঘোর ঘোর বোধ হয়, যেন দূরস্থিত / হ্রদের উপরি চন্দ্রকান্তি বিভাতিত। / হেথায় যুদ্ধের রক্ত-কিরণের ছটা। / সেথায় নিবসে এক বলক্ষীণ জাতি / নীরবে নীরবে, আহা, অস্পষ্ট আঁধারে! / তাহারা তাদের কার্য্য করে নি চিহ্নিত/সময়েরে; ধীরে ধীরে চলি যায় তারা।" অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার যে এখানে খুব স্বচ্ছন্দ বা সার্থক, তা বলা যায় না, কিন্তু মূল কবিতার (ইংরেজির) ভাবগাম্ভীর্য রক্ষায় রাজকৃষ্ণ অনেকটা সক্ষম হয়েছেন।

শুধু ইংরেজি থেকে বাংলা নয়, বাংলা থেকেও ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন রাজকৃষ্ণ। এই ধরনের দ্বিভাষিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াস সে কালে কমই দেখা গেছে, একালেও খুব সুলভ নয়। রাজকৃষ্ণের বইটির নাম 'স্পেসিমেনস্ অফ বেঙ্গলি পোয়েট্রি'...'উইথ ইংলিশ ট্রান্স্লেসনস্ অ্যাণ্ড নোট্স' বা 'কতিপয় কবিতা ...ইংরাজি অনুবাদ ও টীকা সহিত' (১৮৯০)। পনেরোটি বাংলা কবিতা বা কবিতার অংশবিশেষ প্রথমে মুদ্রিত হয়েছে (এগুলি রাজকৃষ্ণের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলিত), পরে সেগুলির ইংরেজিতে অনুবাদ ছাপা হয়েছে। এখানে কবিতা নির্বাচনে রাজকৃষ্ণ গল্পাশ্রয়ী বা বর্ণনাশ্রয়ী কবিতাই গ্রহণ করেছেন, এবং অনুবাদ যথাসাধ্য মূল্যানুগ। তবে বাংলা বা ইংরেজি কোনো অংশকেই সার্থক কবিতার নিদর্শন বলা যাবে কিনা সন্দেহ—"মস্ত ফটক, রঙের চটক, আস্তাবলের গায়। / গাড়িখানা, ঘোড়াখানা, সারি সারি তায় / খাটিয়া পেতে, নেশায় মেতে, সহিস্ কচুমান / ক্যাঁকোর ক্যাঁকোর বাজিয়ে সারঙ্ ছাড়চে নাকী তান্।"[৭]

"The Gates are high, the stables are painted bright /

Carriages, horses are grouped in order right. / Drivers and grocms, all drunk, would sit on bed, / And nasal sing to tune of Sarang sweet."[৮]

বিদেশি পাঠকের কথা ভেবেই বোধহয় অনুবাদের সঙ্গে টীকাটিপ্পনী যোগ করেছেন অনুবাদক। অর্থাৎ 'সারঙ্' যে তারের বাদ্যযন্ত্র তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে পাদটীকায়।

শুধু ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তর নয়, সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদের ব্যাপারেও রাজকৃষ্ণের অধ্যবসায় ও নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। ১২৮৪ সালে রাজকৃষ্ণ অন্যবিধ কাজকর্মের মধ্যে বাল্মীকির রামায়ণের বাংলায় পদ্যানুবাদের সংকল্প গ্রহণ করেন। রাজকৃষ্ণ-অনূদিত 'রামায়ণ' (১৮৭৭-৮৫) খণ্ডাকারে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের (বালকাণ্ড) ভূমিকায় রাজকৃষ্ণ নতুন পদ্যানুবাদের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন—"কৃত্তিবাস যেমন কবিত্ব দেখাইয়াছেন, সেইরূপ যদি বাল্মীকি রামায়ণের অবিকল পদ্যানুবাদ করিতেন তাহা হইলে বাস্তবিক মণিকাঞ্চনযোগ হইত—কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তাহা করেন নাই। বঙ্গভূমির আপামর সাধারণেই প্রায় তদনুবাদিত রামায়ণ আহ্লাদের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু বাল্মীকির অমূল্য রামায়ণের যে কি চমৎকারিতা ও কল্পনাচ্ছটা, তাঁহারা তাহার কতকটা ছায়ামাত্র দেখিতে পান—প্রকৃতরূপে দেখিবার উপায় নাই। আমরা এই জন্যই মহর্ষি বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণ সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পদ্যে অবিকল অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহাতে সর্ব্বসাধারণ, বিশেষতঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাল্মীকির তেজস্বিনী প্রতিভা, কল্পনার ক্ষমতা, সৃষ্টি চাতুর্য্য, মনোমোহিনী বর্ণনা এবং কবিত্বের বৈচিত্র্য বুঝিতে পারেন, তাহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে কথা এই মূলে যাদৃশ রস থাকে, অনুবাদে তাহা ঠিক সেইরূপ কখনই থাকিতে পারে না। কিন্তু যাহাতে মূলের সহিত অনুবাদের ঘটনাদি সম্বন্ধীয় বৈলক্ষণ্য দোষ না ঘটে, আমরা সেই রূপ করিতেছি।"[৯] কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে বাল্মীকি-রামায়ণের নির্ভর-যোগ্য অনুবাদ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, তা নিয়ে তর্ক নেই। কিন্তু রাজকৃষ্ণ 'অবিকল' অনুবাদের কথা যখন বলেন, তখন আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, অনুবাদ কখনোই 'অবিকল' হয় না, হতে পারে না। অন্য ভাষা, স্বতন্ত্র যুগ এবং অনুবাদকের প্রবণতা ও সামর্থ্য—মূল রচনা ও রচয়িতার সঙ্গে অনূদিত রচনার যে ব্যবধান সৃষ্টি করে, তা দূর করা কখনোই সম্ভব নয়। রাজকৃষ্ণ সে কথা জানতেন, তাই মূলের রস যে অনুবাদের মধ্যে সঞ্চার করা যায় না, সে কথা জানিয়েছেন। গীতিকবিতার অনুবাদে সমস্যা অনেক প্রবল, কারণ সেখানে ব্যঞ্জনাময় কবি-ভাষার

রূপান্তর প্রায়-অসম্ভব। তুলনায় কাহিনী-কাব্য অনুবাদ সম্ভব, কারণ 'মূলের সহিত অনুবাদের ঘটনাদি সম্বন্ধীয় বৈলক্ষণ্য' না ঘটলে তা সাধারণভাবে গ্রাহ্য হয়। রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদকালে রাজকৃষ্ণ কাহিনী-বর্ণনাতেই তাঁর সবটুকু শক্তি নিয়োগ করেছেন, সেই সঙ্গে তিনি কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছেন মহাকাব্য দুটি থেকে, যেমন—"বাল্মীকির সময়ে প্রাচীন ভারত এবং আর্য্যদের কিরূপ অবস্থা ও কতদূর উন্নতি হইয়াছিল তাহা বালকাণ্ড পাঠ করিলে বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়।"[১০] "মহাত্মা বাল্মীকির সময়ে ভারতবর্ষের কিরূপ ভৌগোলিক অবস্থা ছিল, তাহা এই অযোধ্যা-কাণ্ডের মধ্যে অনেকটা বিবৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় রাজারা কিরূপ সুন্দর রাজনীতি পালন করিতেন, তাহাও ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।"[১১] বলাবাহুল্য তথ্যপরিবেশনে এবং ঘটনাবর্ণনায় রাজকৃষ্ণের কৃতিত্ব স্বীকার্য, এবং রামায়ণের পদ্যানুবাদ প্রকাশের পর তিনি যে প্রশংসা লাভ করেছিলেন তা এক হিসাবে তাঁর প্রাপ্য ছিল—"Babu (Pundit) Hem Chunder Bhuttacharjee is publishing a prose translation of the poem. But a versified translation was never before attempted. Had it been simply for that reason, and we would have given a hearty welcome to the attempt of Babu Rajkrishna Roy. But when we add to this the ability with which the work is being conducted, the chaste simplicity of the versification, the valuable footnotes added to work, and last, though not the least, the neatness of the printing, the value of the work increase very largely indeed. The author has already acquired some reputation as a poet. And we think his translation of Ramayana will not detract him from that reputation. The work of translation, especially versified translation, is a very difficult one and the author has proved himself in no way unworthy of the task."[১২]

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য রামায়ণের গদ্যানুবাদ প্রকাশ করতে শুরু করেন ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। কোনো সন্দেহ নেই, রামায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক তিনি, তাঁর সঙ্গে রাজকৃষ্ণের তুলনা অসংগত। তবে গদ্যানুবাদের থেকে পদ্যানুবাদ যে দুরূহতর, সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। সে কালে কালীপ্রসন্ন ঘোষ উচ্ছ্বসিত ভাষায় রাজকৃষ্ণের রামায়ণ-অনুবাদের প্রশংসা করলেও, সেই সঙ্গে পদ্যানুবাদের সমস্যার কথাও জানিয়েছিলেন—"এই অনুবাদে কোথাও দুই একটি শব্দ পরিত্যক্ত, কোথাও বা দুই একটি শব্দ নূতন প্রবিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন স্থলে, সামান্যতঃ

পংক্তিব্যত্যয় কিংবা এক আধটু পদব্যত্যয়ও ঘটিয়াছে।" পাদটীকায় আরও মন্তব্য করা হয়েছে, "কোন বিষয়ে পদ্যে অনুবাদ করিতে গেলে ছন্দ ও মিলের অনুরোধে এই কএক প্রকার ত্রুটি কোনমতে এড়াইতে পারা যায় না।"[১৩] আমরা রাজকৃষ্ণের অনুবাদ থেকে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করে তাঁর অনুবাদ-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেব—

'আরণ্যকাণ্ডে' সীতাহরণকালে রাবণের নিজমূর্তি ধারণ (৪৯ সর্গ)। রাজকৃষ্ণ—"তখন প্রতাপশালী লঙ্কেশ রাবণ / পুনঃ পুনঃ করে কর করি' নিষ্পীড়ন / ধরিল নিজের মূর্ত্তি, কহিলা সীতারে: / সুন্দরি! এ হেন ভাবি মনের মাঝারে, /— উন্মত্তা রমণী তুমি, কাণ্ডজ্ঞান নাই, / আমার পৌরুষ বল তাই বুঝ নাই / আকাশে থাকিয়া আমি এ বাহুযুগলে / ধরারে বহিব অনায়াসে অবহেলে / সমুদ্র করিব পান, সমরপ্রাঙ্গণে / কৃতান্তের নিধনিব অসিবিঘূর্ণনে / তীক্ষ্মশরে দিবাকরে করিব ছেদন, / ভুমিরে ভেদিব করি আয়ুধ তাড়ন। / কামে আর সৌন্দর্য্যের গর্ব্বে তুমি, সীতে! / উন্মত্তা হয়েছ অতি, পেতেছি দেখিতে / আমিও লো কামরূপী, এবে একবার দৃষ্টি দানে প্রাণমন জুড়াও আমার। / লঙ্কেশ রাবণ এই বলিতে বলিতে / ধরিল প্রচণ্ড মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে / অগ্নি-প্রভ-শ্যামরেখা-লাঞ্ছিত লোচন / আরক্ত হইল ক্রোধে, দেখিতে ভীষণ / সৌম্য পরিব্রাজকের রূপ গেল ঘুচে / ঘুচিল কাষায় বাস, ফোঁটা গেল মুছে / কৃতান্ত সমান মূর্ত্তি নিতান্ত ভীষণ / সে মূর্ত্তি কখন সীতা করে নি দর্শন। / মেঘসম নীলবর্ণ, দশটা মস্তক / বিংশ হস্ত, বিংশ নেত্র জ্বলন্ত পাবক / পরিহিত রক্তাম্বর, স্বর্ণভূষা গায় / নিবিড় জলদে যেন বিজলী খেলায় / ভীষণ রাক্ষস রূপ করিয়া ধারণ / রোষকষায়িত চক্ষে চাহিল রাবণ / জানকীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া / রহিল উৎসুক চিতে তথা দাঁড়াইয়া।"[১৪]

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের গদ্যানুবাদ—"অনন্তর মহাপ্রতাপ রাবণ হস্তে হস্ত নিষ্পীড়নপূর্ব্বক নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল, এবং তৎকালোচিত বাক্যে সীতাকে পুনরায় কহিল, সুন্দরি তুমি! উন্মত্তা, বোধ হয়, আমার বল পৌরুষ তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। আমি আকাশে থাকিয়া বাহুদ্বয়ে পৃথিবীকে বহন করিব, সমুদ্র পান এবং রণস্থলে কৃতান্তকে হনন করিব, তীক্ষ্ণ শরে সূর্য্যকে ছেদ এবং ভূতলকেও ভেদ করিব। তুমি কামবেগে ও সৌন্দর্য্যগর্ব্বে উন্মত্তা হইয়া আছ, আমি কামরূপী, এক্ষণে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই বলিতে বলিতে রাবণের অগ্নিপ্রভ শ্যামরেখা-লাঞ্ছিত নেত্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে তদ্দণ্ডে সৌম্য পরিব্রাজকরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতান্ততুল্য প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার বর্ণ মেঘের ন্যায় নীল, মস্তক দশ, এবং হস্ত বিংশতি। সে রক্তাম্বর পরিধান করিয়াছে, এবং স্বর্ণালঙ্কারে শোভা পাইতেছে। রাবণ এইরূপ ভীষণ রাক্ষসরূপ ধারণপূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে জানকীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক তথায় দাঁড়াইয়া রহিল।"[১৫]

রাজকৃষ্ণ কখনও আক্ষরিকভাবে মূলের অনুসরণ করলেও (অগ্নিপ্রভ শ্যামরেখা-

লাঞ্ছিত লোচন ) অনেক সময়ে তিনি মূল থেকে দূরে সরে গেছেন ( পুনঃ পুনঃ করে কর করি নিষ্পীড়ন, ঘুচিল কাষায় বাস, ফোঁটা গেল মুছে )। কিন্তু ঘটনা বা তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে পদ্যানুবাদে কোনো স্খলন দেখা যায় না। যেখানে মূলের রূপান্তর ঘটেছে, সেখানে মনে হয় রাজকৃষ্ণ বাল্মীকির শ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন, অথবা সাধারণ পাঠকদের কথা ভেবে সেখানে তিনি ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন সীতার পাতাল প্রবেশ বর্ণনায় ( উত্তরকাণ্ড, ৯৭ সর্গ ) রাজকৃষ্ণ—"হেনকালে দিব্যগন্ধ মনোহর বায়ু / বহমান হৈল কিবা রামের সভায় / বায়ুর পরশ-সুখে সভাস্থ সকলে / পুলকিত হয়ে অতি 'ভাল ভাল' বলে / ত্রেতাযুগে হেন বায়ু কভু নাহি বয় / সত্যযুগ-বায়ুসম সুখস্পর্শ হয় / কাষায়বসনা সীতা এ হেন সময়ে / কৃতাঞ্জলিপুটে কহে অধোমুখী হয়ে / 'মহারাজ রাম ছাড়া যদি অন্য জনে / স্থান নাহি দিয়া থাকি আমার এ মনে / তাহলে পৃথিবী দেবী সেই পুণ্য বলে / বিদীর্ণ হউন, আমি প্রবেশি পাতালে / কায়মনোবাক্যে যদি পূজে থাকি আমি / জগৎ-ঈশ্বর রাম রঘুনাথ স্বামী / তা হলে পৃথিবী দেবী সেই পুণ্যবলে / বিদীর্ণ হউন, আমি প্রবেশি পাতালে / রাম বই আর আমি কারে নাহি জানি / যদ্যপি বলিয়া থাকি এই সত্যবাণী / তাহলে পৃথিবী দেবী সেই পুণ্যবলে / বিদীর্ণ হউন, আমি প্রবেশি পাতালে'।"[১৬]

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদ—"ঐ সময় দিব্যগন্ধ মনোহর পবিত্র বায়ু বহমান হইল। বায়ুর স্পর্শসুখে সভাস্থ সকলে পুলকিত হইয়া উঠিল। এবং ত্রেতাযুগের বায়ু সত্য যুগের ন্যায় সুখস্পর্শ, এই ভাবিয়া বিস্ময়ের সহিত বায়ুর এই অচিন্ত্য ও অদ্ভুত সঞ্চরণ পরীক্ষা করিতে লাগিল। এই অবসরে কাষায়বসনা জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন, আমি রাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনেতে স্থান না দিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রামের পর আর কাহাকেই জানি না যদি এই কথা সত্য বলিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।"[১৭]

পদ্যানুবাদকে অবশ্যই অনুবাদ হিসাবে যথার্থ হতে হবে, এবং সেই সঙ্গে কবিতা হিসাবেও পাঠযোগ্য হতে হবে। রাজকৃষ্ণ অনুবাদের ক্ষেত্রে যতটা নির্ভর-যোগ্য, কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে হয়তো ততটা সার্থক নন। অথবা উনিশ শতকের কবিভাষা সে কালের পাঠককে যতটা আকৃষ্ট করেছে, আধুনিক পাঠককে ততটা আকর্ষণ করতে সক্ষম নয়। তবে পদ্যানুবাদের সঙ্গে তিনি যে টীকাটিপ্পনী যোগ করেছেন তার বিশেষ উপযোগিতা আছে, সেখানেই তিনি সাধারণ পাঠকের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছেন। অন্যদিকে তিনি জানিয়েছেন, "এই পদ্য রামায়ণের

টীকার জন্য রামায়ণ সংক্রান্ত নানাবিধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করা হইয়াছে।"[১৮] এর মধ্যে একধরনের 'অ্যামেচার স্কলারশিপের' প্রকাশ ঘটেছে, যেমন তিনি বালকাণ্ডের পরিশিষ্টে সূর্যবংশ ও জনকবংশের তালিকা, অদ্ভুত রামায়ণের সারাংশ, পদ্মপুরাণান্তর্গত রামচরিতের সারাংশ প্রভৃতি বহুবিচিত্র তথ্য ও উল্লেখপঞ্জী উপস্থিত করেন।

'মহাভারত' (১৮৮৬-৯৩) অনুবাদকালে পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের চেষ্টা আরও বেশি দেখা যায়, সেখানে গ্রন্থের আখ্যাপত্রেই জানানো হয়েছে "বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র ও অন্যান্য বহুবিধ গ্রন্থ হইতে নানাবিধ টীকা সমেত"। রামায়ণের থেকে মহাভারত আকারে অনেক বড়ো, সমগ্র কাব্যটি 'অবিকল' অনুবাদ করা তাই খুব সহজ নয়। বিশেষত মহাভারত অনুবাদের সময় রাজকৃষ্ণ তাঁর রঙ্গমঞ্চ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, অর্থচিন্তায় বিব্রত। প্রথম খণ্ড (আদি ও সভাপর্ব) প্রকাশের পর বেশ কিছুদিন কেটেছে, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করে উঠতে পারেননি। 'অনুসন্ধান' পত্রিকার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি লেখেন, "মহাভারত অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া গ্রাহকগণের নিকট যে সামান্য টাকা পাইয়াছি, ইহা সম্পূর্ণ করিতে তাহা অপেক্ষা আরও বিস্তর টাকা আমাকে লোকসান দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া যে মহাভারত-প্রকাশে আমি পশ্চাৎপদ হইতেছি, তাহা নহে, আমি জীবিত থাকিতে মহাভারত কখনই অসম্পূর্ণ থাকিবে না। তবে লোকসানের মুখে তাহা প্রকাশ করিতে কিছু বিলম্বের জন্য অবশ্যই লজ্জিত আছি। আর, সে বিলম্বের প্রধান কারণ, সংপ্রতি আমার নিজের 'বীণা থিয়েটারটি' প্রস্তুত হওয়ায় তাহার জন্য আমি বিশেষ ব্যস্ত আছি। সেইজন্যই মহাভারত প্রকাশে যা কিছু বিলম্ব। যাইহোক নবম সংখ্যার অনেকাংশ ছাপা আছে, বিক্রীর কাপিও প্রস্তুত, শীঘ্রই প্রকাশ হইবে। ফলতঃ গ্রাহকগণ এ বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি করেন, এই প্রার্থনা।"[১৯] বিলম্বে হলেও মহাভারতের অনুবাদ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন রাজকৃষ্ণ, এবং সেটাই তাঁর বড়ো কৃতিত্ব বলা যায়। তবে তাঁর মৃত্যুর পর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাভারতের রাজসংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' জানান—"ভীষ্ম পর্ব্বের কিয়দংশ পর্য্যন্ত তিনি অতি বিস্তারিতভাবে লিখিয়া গিয়াছিলেন। অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার ইহলোকের কার্য্য শেষ হইবে বুঝিয়া, তিনি গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতে ব্যগ্র হন, এবং রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াই শেষ অংশের রচনা সমাপ্ত করেন। এজন্য অবশিষ্ট অংশ সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও, উহা সর্ব্বত্রই মূলের অনুগত ও একান্ত সুখপাঠ্য।"[২০]

রামায়ণের মতো, মহাভারতের ক্ষেত্রে রাজকৃষ্ণ 'সর্ব্বত্রই মূলের অনুগত' নন, এবং শুধু ভীষ্মপর্বের পরবর্তী অংশে নয়, সর্বত্রই অনুবাদ কিছুটা 'সংক্ষিপ্ত'। অবশ্য মহাভারতের প্রধান ঘটনাবলী কোথাও বর্জিত হয়নি, কিন্তু বর্ণনা অংশে কিছু কিছু

বর্জন করেছেন কবি। তার ফলে বাংলা-মহাভারতে এসেছে সংহতি এবং কিছুটা গাঢ়তা। এদিক থেকে কাশীরাম দাসের নামে প্রচারিত মহাভারতের সঙ্গে রাজকৃষ্ণের মহাভারতের মিল নেই। শুধু ভাষাছন্দের ক্ষেত্রে রাজকৃষ্ণ কাশীরাম-অনুসারী। তবে সময়াভাবের জন্য হোক অথবা কাশীদাসী মহাভারতের সঙ্গে ঐক্য রক্ষার জন্য হোক, সাধারণ ভাবে এখানে তিনি যেন বড়ো বেশি অসতর্ক ও অন্যমনস্ক। রাজকৃষ্ণের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষা-ছন্দের সঙ্গে মহাভারতের অনুবাদের যেন তেমন যোগ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র রাজকৃষ্ণের মহাভারত-অনুবাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা দেখে মন্তব্য করেন "অনুবাদ সকলের বোধগম্য অথচ সকলের পক্ষে মনোহর হইতেছে।"[২১] বলা-বাহুল্য অনুবাদ কতটা মনোহর হয়েছে তা নিয়ে মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু তা যে সকলের বোধগম্য—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। খাণ্ডবদাহপর্বাধ্যায়ের (২৩৪ অধ্যায়) শেষাংশ রাজকৃষ্ণ এইভাবে ভাষান্তরিত করেন—"এদিকেতে ভগবান্ দেব হুতাশন / প্রজ্বলিত হয়ে করি ঘোর গরজন / কৃষ্ণ আর অর্জুনের সাহায্য পাইয়া / বিশাল খাণ্ডবারণ্য সবলে দহিয়া / জীব জন্তুদের মেদ রসা করি পান / পরিতৃপ্ত হইলেন, আনন্দিত প্রাণ। / অনন্তর ভগবান দেবপুরন্দর / দেবগণে সঙ্গে লয়ে গগন উপর/কহিলেন কৃষ্ণ আর অর্জুনে ডাকিয়া—/ 'তোমরা উভয়ে আজ একত্রে মিলিয়া / যে মহৎ কার্য্যের করিলে অনুষ্ঠান / দেবেরো দুষ্কর ইহা, নাহি তাহে আন / তোমাদের পরাক্রম করি দরশন / অতিশয় হৈনু আমি আনন্দিত মন / ইচ্ছামত বর এবে লহ মোর পাশে / ছলনা করিব নাহি, দিব অনায়াসে।' / তখন অর্জুন কহে—'সহস্রলোচন! / আমারে সমস্ত অস্ত্র করহ অর্পণ' / সময় নির্দেশ ইন্দ্র করিয়া তখন / কহিলেন,—'ধনঞ্জয়! করহ শ্রবণ / যে কালে করিয়া তুমি তপস্যা কঠোর / প্রসন্ন করিবে মহাদেবের অন্তর / সেকালে সমস্ত অস্ত্র করিব প্রদান/আগ্নেয়, বায়ব্য, ঐন্দ্র অস্ত্র খর-শান।' / কৃষ্ণ কহিলেন,—'শুন, দেব পুরন্দর! / তব পাশে এই মাত্র মাগি আমি বর। অর্জুনের সনে মোর যেন কদাচন / প্রণয়-বিচ্ছেদ নাহি হয় সঙ্ঘটন।' / 'তথাস্তু' বলিয়া তবে ইন্দ্র মতিমান / শ্রীকৃষ্ণেরে সেই বর করিলা প্রদান।"[২২]

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের গদ্যানুবাদ এর পাশে রাখা যেতে পারে—"এ দিকে ভগবান্ হুতাশন প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন-সাহায্যে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিয়া তত্রস্থ জীবজন্তুগণের অপরিমিত রসা ও মেদ পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। তদনন্তর ভগবান্ পুরন্দর দেবগণ সমভিব্যাহারে অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, 'তোমরা যে মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা দেবতাদিগেরও দুষ্কর। আমি তোমাদের পরাক্রমদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' তখন অর্জ্জুন 'আমাকে সমস্ত অস্ত্র

প্রদান করুন', বলিয়া দেবরাজের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র সময়নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! যে সময়ে তুমি তপস্যা দ্বারা ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিবে, আমি তৎকালে তোমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিব। হে পাণ্ডব! তুমি সেই সময়ে আগ্নেয়, বায়ব্য ও মদীয় অস্ত্র-সমুদয় লাভ করিবে।' কৃষ্ণ কহিলেন, 'সুররাজ! আমি এইমাত্র বর প্রার্থনা করি, যেন অর্জ্জুনের সহিত আমার কদাচ প্রণয়-বিচ্ছেদ না হয়।' ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন।"[২৩]

এখানে অনুবাদের সময় রাজকৃষ্ণ সংক্ষেপকরণের প্রয়োজনে বিশেষ কিছু বাদ দেননি। বরং ইন্দ্রের মুখে 'ছলনা করিব নাহি, দিব অনায়াসে'—সংযোজনের নিদর্শন। জতুগৃহপর্বাধ্যায়ের (১৪১ অধ্যায়) ভাষান্তরের সময় সার-সন্ধানের চেষ্টা দেখা যাবে—"দুর্যোধন, শকুনি ও কর্ণ, দুঃশাসন / ধৃতরাষ্ট্র-পাশে পরে করিল গমন / নিরজনে কুমন্ত্রণা কৈল তাঁর সনে / পোড়াইতে কুন্তী আর পাণ্ডুপুত্রগণে / মহাত্মা বিদুর কিন্তু আকার ইঙ্গিতে / দুষ্টদের অভিসন্ধি পারিলা বুঝিতে / ছিলেন সদাই সেই বিদুর সুমতি / পাণ্ডবের হিতকামী, শুনহ নৃপতি / বাঁচাইতে পুত্রসহ কুন্তীর জীবন / করাইল তরী এক বিদুর রচন / সুদৃঢ় তরণী সেই পতাকা শোভিত / বাতসহ-যন্ত্র তাহে হৈল সংযোজিত / সাগর তরঙ্গ ঘোর বাত্যা সহকারে / সে তরণী ডুবাইতে অনা'সে না পারে / প্রস্তুত হইলে তরী বিদুর তখন / কহিলা কুন্তীর পাশে করিয়া গমন /—'শুন দেবি! ধৃতরাষ্ট্র দুষ্ট দুরাচারী / নিত্যধর্ম্ম ত্যজি আজি কীর্ত্তিক্ষয়কারী / অতএব এ তরীতে করি আরোহণ / পুত্রসহ শীঘ্র তুমি কর পলায়ন / তা হলে পাইবে রক্ষা, বাঁচিবে জীবন / নতুবা নিস্তার আর নাহিক এখন' / বিদুরের বাক্য কুন্তী শুনিয়া শ্রবণে / ব্যথিতা হইলা বড় ভয়াকুল মনে / তখনি লইয়া কুন্তী সঙ্গে পুত্রগণ / নৌকা চড়ি গঙ্গাপারে করিলা গমন / বিদুর-প্রদত্ত ধন করিয়া গ্রহণ / নির্বিঘ্নে অপর পারে কৈলা উত্তরণ।"[২৪]

কালীপ্রসন্ন সিংহের আক্ষরিক অনুবাদ এই রকম—"তদনন্তর সুবলনন্দন শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ দুষ্টমন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিল এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে দগ্ধ করিতে মনস্থ করিল। তত্ত্বদর্শী মহাত্মা বিদুর আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা ঐ পামরগণের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। ঐ মহাত্মা পাণ্ডবগণের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কুন্তী কুমার-গণ-সমভিব্যাহারে অনায়াসে পলায়ন করুন, এই অভিপ্রায়ে তিনি একখানি নৌকা প্রস্তুত করাইলেন। ঐ তরণী বাতসহ, যন্ত্রযুক্ত, পতাকাসুশোভিত ও সুদৃঢ়, বায়ুবেগোত্থিত প্রবল সমুদ্র-তরঙ্গও উহাকে হঠাৎ মগ্ন করিতে পারে না। নৌকা প্রস্তুত হইলে বিদুর কুন্তীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, 'হে শুভে! কুরুকুলের কীর্ত্তিনাশক বিপরীতবুদ্ধি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র নিত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত

হইয়াছেন, অতএব তুমি এই উত্তালতরঙ্গবেগসহা তরণী আরোহণ করিয়া সন্তানগণ সমভিব্যাহারে ত্বরায় পলায়ন কর, তাহা হইলেই তোমাদিগের প্রাণরক্ষা হইবে, নচেৎ আর নিস্তার নাই।' কুন্তী বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কুমারগণ-সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন।"[২৫]

রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদের পর রাজকৃষ্ণ কল্কিপুরাণের (১৮৯২) পদ্যানুবাদ করেন। ধর্মবিশ্বাসী হিন্দুর কাছে "উপপুরাণের মধ্যে কল্কিপুরাণ পরম-পবিত্র, আদৃত ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত। যখন সম্পূর্ণভাবে কলির প্রাদুর্ভাব হইবে তখন ভগবান হরি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ম্লেচ্ছ, যবন, পাষণ্ড বৌদ্ধ প্রভৃতিকে নিপাত করিয়া পুনরায় সত্যযুগের সৃষ্টি করিবেন। এই সকল ঘটনা কি প্রকারে হইবে, তাহাই অতীত উপাখ্যানচ্ছলে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধপুরুষেরা ভবিষ্যৎ ঘটনাকেও অতীতবৎ দর্শন করেন, সুতরাং ভবিষ্যৎ ঘটনাকে অতীতরূপে বর্ণনা করায় দোষ লক্ষিত হয় না।"[২৬] উনিশ শতকের শেষপাদে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান আন্দোলনকালে 'বৌদ্ধধর্মের উৎসাদন' অপেক্ষা 'ম্লেচ্ছ, যবন'-দমনের জন্য কল্কিঅবতারের আবির্ভাব একান্ত কাম্য বিবেচিত হয়েছিল। অন্যদিকে ভক্তিমূলক নাটকের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিমূলক পুরাণ-কাহিনীর জনপ্রিয়তাও বাড়ে। রাজকৃষ্ণ তাঁর 'কল্কিপুরাণ' গ্রন্থটি 'পরম ধার্মিক' গিরিশচন্দ্র ঘোষকে (ইনি নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নন) উৎসর্গকালে জানান 'কল্কিপুরাণও হরিভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ'।[২৭] অতএব এ ক্ষুদ্র উপহার সাদরে গৃহীত হবে।

কল্কিপুরাণের ভাষান্তর কালে রাজকৃষ্ণ পরিণতবুদ্ধি ও অনুবাদকর্মে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। মৃত্যুর মাত্র দু'বছর আগে কল্কিপুরাণ প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় এইভাবে বিবৃত—

"মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত / মূল সংস্কৃত হইতে / রামায়ণ ও মহাভারতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদক, ভারতকোষ সংগ্রহকার, / বিবিধ কাব্য, নাটক, অপেরা, কমিক অপেরা, প্রহসন, / উপন্যাস, খোসগল্প, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বাদি গ্রন্থপ্রণেতা / এবং / গ্রেট্ ট্র্যাজিও কমিডিয়ান্—(ইণ্ডিয়ান মিরার) / শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক / সরল বাঙ্গালা পদ্যে অবিকল অনুবাদিত ও নানাবিধ / অতি প্রয়োজনীয় টীকা সন্নিবেশিত।"

অধিকাংশ পুরাণেই কাহিনীর চমৎকারিত্ব দেখা যায়, তবে বিষ্ণুর দশম বা শেষ অবতার কল্কির কার্যকলাপের মধ্যে চমৎকারিত্ব কিছু বেশি। কলির শেষে পৃথিবী ম্লেচ্ছপূর্ণ হলে বর্ণবিভাগ আর রক্ষা করা যাবে না—চতুর্দিক পাপে ছেয়ে যাবে,—আর তখন বিষ্ণু শম্ভলগ্রাম-নিবাসী বিষ্ণুযশা নামে ধার্মিক ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কি

নামে জন্মগ্রহণ করবেন। কল্কিপুরাণের একবিংশ অধ্যায়ে সংক্ষেপে সমগ্র কাব্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—

সূত উবাচ। "অত্রাপি শুকসংবাদো মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
অধর্ম্মবংশকথনং কলোবিবরণং ততঃ॥
দেবানাং ব্রহ্মসদনপ্রয়াণং গোভুবা সহ।
ব্রহ্মণো বচনাদ্‌বিষ্ণোর্জন্ম বিষ্ণুযশোগৃহ॥
সুমত্যাং স্বাংশকৈর্ভ্রাতৃচতুর্ভিঃ শম্ভলে পুরে।
পিতুঃ পুত্রেণ সংবাদস্তথোপনয়নং হরে॥"...ইত্যাদি।[২৮]

রাজকৃষ্ণের অনুবাদ—"সূত কহিলেন শুন পূজ্য মুনিগণ।
এ কল্কিপুরাণে ঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন॥
প্রথমেই শুকমার্কণ্ডেয়ের সংবাদ।
করিলা কীর্ত্তন শুনি বাড়য়ে আহ্লাদ॥
তারপর অধর্ম্মের বংশবিবরণ।
কলিবিবরণ ব্যাস করিলা কীর্ত্তন॥
ধরা সুর সবাকার ব্রহ্মলোকে গতি।
কীর্ত্তন করিলা পরে ব্যাস মহামতি॥
ব্রহ্মার বচনমতে শম্ভলের গ্রামে।
ধর্ম্মপরায়ণ বিষ্ণুযশা বিপ্রধামে॥
সুমতির গর্ভে ঈশ বিষ্ণুর জনন।
তাঁর অংশে চারিভ্রাতা জন্ম বিবরণ॥"[২৯]

দুই পক্ষযুক্ত শ্বেত অশ্বে আরোহণ, এক হাতে জলন্ত ধূমকেতুর মতো তরবারি, অন্য হাতে চক্র—কল্কির এই বর্ণনা ভীতি ও ভক্তি জাগানোর সহায়ক। তারপর কলিকে বিনাশ এবং ম্লেচ্ছকুল ও বিধর্মীদের নিশ্চিহ্ন করার দৃশ্য বেশ নাটকীয়। সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা—মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বপ্ন হিসাবে আকর্ষণীয়তা লাভ করবে—এটাই স্বাভাবিক।

রাজকৃষ্ণের পদ্যানুবাদ শুরু হয়েছে 'গণেশবন্দনা' দিয়ে—

"কি তান্ত্রিক কি বৈদিক সর্ব্বশাস্ত্রমাঝ।
প্রথমে বন্দনা যাঁর আছয়ে বিরাজ॥
সবার আশ্রয় সর্ব্বজ্ঞ যে জন।
অজ আর অচ্যুত নামেতে খ্যাত হন॥
সেই বিঘ্ন বিনাশন অনন্ত মহানে।
নমস্কার করি আমি ভক্তির বিধানে॥"[৩০]

কল্কিপুরাণের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক অবলম্বনে রাজকৃষ্ণ উপরের কয়েক

পংক্তি রচনা করেন, কিন্তু লক্ষণীয় যে, সেখানে গণেশের উল্লেখ নেই—"দেবেন্দ্র সহ অমরবৃন্দ, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মুনীশ্বরগণ ও লোকপালবর্গ সর্ব্বার্থসুসিদ্ধির জন্য প্রত্যহ ভক্তিসহকারে যাঁহার ভজনা করিয়া থাকেন, সেই বিঘ্নবিনাশন, অনন্ত, জন্মরহিত, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বাশ্রয়ভূত এবং বৈদিক তান্ত্রিকাদি নানা শাস্ত্রে সর্ব্বাগ্রে সম্পূজিত অচ্যুতদেবকে বন্দনা করি।"[৩১]

এখানে বিষ্ণু বা হরির বন্দনা করা হয়েছে। রাজকৃষ্ণ মনে হয় বাংলা মঙ্গল কাব্যের অনুসরণে গণেশবন্দনা দিয়ে তাঁর কাব্যের সূচনা করেছেন। 'বিঘ্নবিনাশন' বলতে গণেশকে বোঝানো হয়নি, আর 'বেদে'ও গণেশের উল্লেখ নেই। পরবর্তী তৃতীয় শ্লোকের অনুবাদকালে রাজকৃষ্ণ 'কল্কিবন্দনা' আখ্যায় কল্কির যে বর্ণনা করেছেন তা অনেক পরিমাণে মূলানুসারী—

"যদ্দোর্দণ্ডকরালসর্প কবলজ্বালাজ্বলদ্বিগ্রহারঃ।
নেতুঃ সৎকরবালদণ্ডদলিতা ভূপাঃ ক্ষিতিক্ষোভকাঃ॥
শশ্বৎ সৈন্ধব বাহনো দ্বিজজনিঃ কল্কির পরাত্মা হরিঃ।
পারাৎ সত্যযুগাদিকৃৎ স ভগবান্ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রিয়ঃ॥"[৩২]

রাজকৃষ্ণের বঙ্গানুবাদ—"ধরণীপীড়ক যত ধরাপতিগণ।
যাঁর সর্পমুখ সম করে অনুক্ষণ॥
কবলিত হয়ে হৈল ভস্ম অবলেষ।
তীক্ষ্ণধার তরবালে বিদীর্ণ বিশেষ॥
অশ্ব-আরোহণে যাঁর নিয়ত গমন।
সত্য আদি চারি যুগ যাঁহার সৃজন॥
ধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে সদা প্রবৃত্তি যাঁহার।
দ্বিজকুলসমুদ্ভূত ধর্ম্ম-অবতার॥"[৩৩]

এখানে রাজকৃষ্ণ আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করেননি, তবে 'সরল বাংলা পদ্যে' পুরাণের মর্মার্থ প্রকাশে তিনি সফল হয়েছেন। আসলে বাংলা-পদ্যপাঠে অভ্যস্ত পাঠকের দিকে তাকিয়ে তিনি ব্যাখ্যাধর্মী অনুবাদ-রীতি গ্রহণ করেছেন। কাহিনী বর্ণনায় এই রীতির উপযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য, যেমন—

"রাবণ এ হেন কালে কুটীরে আসিয়া।
লঙ্কাপুরে নিয়া গেল সীতারে হরিয়া॥
কুটিরে আসিয়া রাম না হেরি সীতায়।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হয়ে কঠিন ধরায়॥
মূর্চ্ছাভঙ্গে রঘুবীর সীতা সীতা বলি।
বিলাপ করেন করি আকুলি বিকুলি॥

লক্ষ্মণের সনে রাম শোকাকুল মনে।
সীতা অন্বেষণ করে ঘুরে বনে বনে।।"...ইত্যাদি।[৩৪]

কল্কিপুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬ সংখ্যক শ্লোকে অতি সংক্ষেপে যে-ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, রাজকৃষ্ণ তাকে পাঁচালী কাব্যের ঢঙে অনেকটা বাড়িয়েছেন।

কিন্তু পুরাণের সংযত বর্ণনাভঙ্গি ও সংহত বাক্যবন্ধ বাংলা পদ্যানুবাদে রক্ষিত না হওয়ায় পৌরাণিক আবহ সৃষ্টি করা রাজকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিশেষত রাজকৃষ্ণ যেখানে পয়ার রূপবন্ধের পরিবর্তে ত্রিপদী ব্যবহার করেছেন, সেখানে পদান্ত মিলের প্রয়োজনে অতিরিক্ত শব্দ সংযোজন অনিবার্য হয়েছে, যেমন কল্কিপুরাণের শেষ শ্লোকটির বঙ্গানুবাদে লক্ষ্য করা যাবে—

"সজলজলদদেহো বাতবেগৈকবাহঃ
করধৃত করবালঃ সর্ব্বলোকৈকপালঃ।
কলিকুলবলহন্তা সত্যধর্ম্মপ্রণেতা
কলয়তু কুশলং বঃ কল্কিরূপঃ স ভূপঃ।।"[৩৫]

"যিনি এই ধরামাঝ ভূপরূপে ভূপসাজ,
অঙ্গে ধরি অশ্ব আরোহণে।।
খর করবাল করে সবলে ধারণ করে,
কলিকুল বিনাশিয়া রণে।।
দয়াগুণে আপনার সত্যধর্ম্ম পুনর্ব্বার
স্থাপন করেন সবিধান।
সেই সর্ব্বলোক পাতা, শ্যাম কল্কি মুক্তিদাতা,
করুন সবারে শুভদান।।"[৩৬]

এখানে বাঙালি কবির হরিভক্তি যে-ভাবে কল্কির মধ্যে 'সর্বলোকপাতা শ্যামে'র 'দয়াধর্ম' প্রত্যক্ষ করেছে, তা যেমন লক্ষণীয়, তেমনি এই শ্লোকের অনতিপূর্বে, "হরি বিনা গতি নেই/সর্ব্বদাই হরিধ্যান উচিত সবার"—জাতীয় সংযোজনের মধ্য দিয়ে ভক্তিমূলক নাটকের সঙ্গে কল্কিপুরাণ-অনুবাদের সম্পর্ক নির্দেশ করেছে।

১. 'বঙ্গীয় গ্রন্থকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা', ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৬, পৃ. ১৯২।
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১০৮।
৩. দ্র. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ, অলোক রায় সম্পাদিত, ১৯৮৪, পৃ. ১১০।

৪. *Cassel's Encyclopaedia of Literature*, Vol. II, 1953, p. 1200.

৫. E. Cobham Brewar, *The Reader's Handbook*, 1911, p. 188.

৬. 'অশ্বায়নের কবিতাবলী', বীণা, ফাল্গুন ১২৯৩, পৃ. ১৪৬-৬২, বৈশাখ ১২৯৪, পৃ. ২২৯-৪১।

৭. রাজকৃষ্ণ রায়, কতিপয় কবিতা, ১৮৯০, পৃ. ১৮।

৮. তদেব, পৃ. ৩৭।

৯. রাজকৃষ্ণ রায়, রামায়ণ, কার্ত্তিক ১২৮৪, পৃ. ।•।

১০. রাজকৃষ্ণ রায়, রামায়ণ, বালকাণ্ডের ভূমিকা, পৃ. ।/।

১১. রাজকৃষ্ণ রায়, রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ডের ভূমিকা, ভাদ্র, ১২৮৫।

১২. *The Indian Mirror*, August 4, 1877.

১৩. বান্ধব, তৃতীয় সংখ্যা, ১২৮৮, পৃ./•।

১৪. রাজকৃষ্ণ রায়, রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড, পৃ. ৮৮।

১৫. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাল্মীকি রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড, ভারবি সংস্করণ, ১৯৭৬, পৃ. ৩৯৩।

১৬. রাজকৃষ্ণ রায়, রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, পৃ. ৯২১।

১৭. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, পৃ. ১০৩৮।

১৮. রাজকৃষ্ণ রায়, রামায়ণ, ভূমিকা, পৃ. ।•।

১৯. অনুসন্ধান, ১৫ পৌষ ১২৯৪, পৃ. ১৪৭।

২০. দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ১৩৫৫, পৃ. ৩৫-৩৬।

২১. বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ চিঠির জন্য দ্র. 'জীবনকথা', পৃ. ৩২।

২২. রাজকৃষ্ণ রায়, মহাভারত, আদিপর্ব ও সভাপর্ব, ফাল্গুন ১২৯৩, পৃ. ২৬৩-৬৪।

২৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পঞ্চম রাজসংস্করণ, প্রথম খণ্ড, ২৯৫-৯৬।

২৪. রাজকৃষ্ণ রায়, মহাভারত, আদিপর্ব ও সভাপর্ব, পৃ. ১৮০।

২৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহাভারত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৯৬।

২৬. কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, 'বিজ্ঞাপন', সানুবাদ কল্কিপুরাণম্, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২৯, পৃ. ২৭৬।

২৭. রাজকৃষ্ণ রায়, উপহার, কল্কিপুরাণ, ১২৯৯।

২৮. কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, সানুবাদ কল্কিপুরাণম্, পৃ. ২৬৯।

২৯. রাজকৃষ্ণ রায়, কল্কিপুরাণ, পৃ. ১৪১।
৩০. রাজকৃষ্ণ রায়, কল্কিপুরাণ, পৃ. ১।
৩১. কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, সানুবাদ কল্কিপুরাণম্ পৃ. ১।
৩২. কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, সানুবাদ কল্কিপুরাণম্, পৃ. ১-২।
৩৩. রাজকৃষ্ণ রায়, কল্কিপুরাণ, পৃ. ১।
৩৪. রাজকৃষ্ণ রায়, কল্কিপুরাণ, পৃ. ৮৮।
৩৫. কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, সানুবাদ কল্কিপুরাণম্, পৃ. ২৭৫।
৩৬. রাজকৃষ্ণ রায়, কল্কিপুরাণ, পৃ. ১৪৩।

# উপন্যাসধারা

রাজকৃষ্ণ রায় মুখ্যত কবি ও নাট্যকার। উপন্যাস রচনায় তিনি এক সময়ে আত্মনিয়োগ করলেও, তাঁকে যথার্থ ঔপন্যাসিক বলা যায় না। উপন্যাসের মধ্যে আমরা পাই জীবনসম্পৃক্ত বাস্তব কাহিনী এবং সেই কাহিনীর মধ্য দিয়ে জীবনের ব্যাখ্যা। বলাবাহুল্য, সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে প্রকৃতির অনুকরণ নয়। সেখানে সম্ভাব্যতার বিচারে যা গ্রাহ্য অর্থাৎ যা ঘটতে পারে, তাকেই বাস্তব বলে গ্রহণ করি। রাজকৃষ্ণ পৌরাণিক নাটক রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু পুরাণকাহিনী সাধারণভাবে উপন্যাসের অবলম্বন হতে পারে না। সিদ্ধরসের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে পৌরাণিক দেব-দেবীকে নিয়ে উপন্যাস লেখা যায় না। হয়তো ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ তিনি গ্রহণ করতে পারতেন, যেমন করেছিলেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁর দুটি উপন্যাস লেখার সময় ( 'চন্দ্রা' ও 'ঝালোয়ার দুহিতা' )। সেখানেও দৃষ্টি অতীতমুখী এবং বাস্তববিমুখ। অন্যদিকে উপন্যাসের মধ্যে কালক্রম অনুসরণে গল্প বলাই যথেষ্ট নয় ( রাজকৃষ্ণ ভালো গল্প বলতে পারতেন ), গল্পকে কার্যকারণ শৃঙ্খলবদ্ধ প্লটের আধারে পরিবেশন করতে হবে। এইখানেই বঙ্কিম-যুগের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক বিপন্ন বোধ করেছেন। রূপকথা বা উপকথার মতো ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে যাওয়া কঠিন নয়, কিন্তু সেই ঘটনাকে তাৎপর্যময় করে তোলা এবং তার সঙ্গে চরিত্রের পরস্পরনির্ভর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রচনা সহজ কাজ নয়। আসলে উপন্যাস আর উপকথার মধ্যে পার্থক্য আছে। উনিশ শতকের বঙ্কিমানুসারী উপন্যাস রচয়িতারা বঙ্কিমের মতো রোমান্টিক উপন্যাস রচনায় আগ্রহ বোধ করলেও "তাঁহার সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের নিগূঢ় মর্মবাণী ও রোমান্সের বর্ণাঢ্য অনুরঞ্জন তাঁহার পরবর্তীদের নিকট অনধিগম্যই রহিয়া গেল। কিন্তু উহার বাহিরের কাঠামোটি ও স্থূল, অতিপ্রত্যক্ষ সংঘর্ষটি ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিকের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়রূপেই প্রতিভাত হইল। এই জাতীয় উপন্যাসে অন্তর-সমস্যার তীব্রতা ও জটিলতা যেমন হ্রাস পাইল, উহার সমাধানটিও তেমনি সুলভ হইল।"[১]

রাজকৃষ্ণের উপন্যাস-রচনার সূচনালগ্ন সম্পর্কে তাঁর এক বন্ধু জানিয়েছেন, "এক সময় আমিই তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—'রাজকৃষ্ণবাবু, আপনি কবিতা ছাড়িয়া উপন্যাস ধরুন। যখন আমাদের মতন লেখকের উপন্যাস বিক্রয় হইতেছে, তখন আপনার উপন্যাসও না বিকাইবে কেন?' রাজকৃষ্ণবাবু অমনি 'কিরণময়ী', 'জ্যোতির্ময়ী', 'অদ্ভুত ডাকাত' প্রভৃতি ৪/৫ খানি উপন্যাস লিখিয়া ফেলিলেন।"[২] রাজকৃষ্ণের বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সে কালে জনপ্রিয় উপন্যাস-রচয়িতা

হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কথাতেই যে রাজকৃষ্ণ উপন্যাস লেখেন তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। লক্ষণীয়, যোগেন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় দুই খণ্ড 'হিরণ্ময়ী' (১৮৮০) উপন্যাসের কথা বলেননি। আসলে 'হিরণ্ময়ী' উপন্যাসটি আগেই লেখা হয়েছে। অন্যদিকে রাজকৃষ্ণের 'গল্পকল্পতরু' নামে পত্রিকা প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজের এবং অন্যদের উপন্যাস প্রকাশ। 'ফর্মায় ফর্মায় উপন্যাস প্রকাশে'র এই রীতিটি ছিল অভিনব। আসলে নাটক লেখার সময়ই রাজকৃষ্ণের মনে হয়েছে, রঙ্গমঞ্চে স্বল্পসংখ্যক দর্শকের মনোরঞ্জনে তৃপ্তি নেই; বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর দিক তাকিয়ে সে কালে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবসৃষ্ট 'উপন্যাস' রচনা করতে হবে। তবে উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে আসলে কোনো বিরোধ নেই—নাট্যকাহিনী অবলম্বনে যেমন উপন্যাস লেখা সম্ভব, তেমনি উপন্যাসেরও নাট্যরূপদান স্বাভাবিক। 'হিরণ্ময়ী' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তিনি যেন তা দেখিয়ে দেন। (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ২ ফেব্রুয়ারি বীণা রঙ্গমঞ্চে 'হিরণ্ময়ী' নাটকের অভিনয় হয়—"A New Drama by Rajkrishna Roy / HIRMNMOYI / Sweet Melodies; Delicious Songs!!"[৩])

'হিরণ্ময়ী' উপন্যাসের রচনাকৌশল আধুনিক পাঠকের কাছে কিছুটা কৌতুককর মনে হতে পারে। উনিশ শতকে বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী' প্রকাশের পর অনেক লেখকই উপন্যাস রচনাকালে ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যবহার করতে শুরু করেন। ইতিহাসের স্পর্শে কাহিনী লাভ করে এক ধরনের 'চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ব'[৪], যার ফলে তুচ্ছ কাহিনীকেও অসামান্য মনে হতে থাকে। অন্যদিকে সুদূর অতীত কালের পটভূমিতে কাহিনী স্থাপন করলে বাস্তব-অবাস্তবের ভেদরেখা অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এদিক থেকে উনিশ শতকের অধিকাংশ উপন্যাস, লেখকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এক কল্পলোকের সামগ্রী হয়ে উঠেছে, যার সঙ্গে আধুনিক লেখক ও পাঠকের ইচ্ছাপূরণ প্রবণতার যোগ আছে—"What we should remember, then, about romance, is not that it involves an escape, but particular kind of escape. Medieval romance makes no attempt to give an impression of life in the lands and times it is dealing with, but it does attempt 'to use its subject matter as a means of conveying a new philosophy'."[৫] এখানে যদিও মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য রোমান্সের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কথাগুলি উনিশ শতকের বাংলা রোমান্সধর্মী উপন্যাস সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য। রাজকৃষ্ণ 'হিরণ্ময়ী' উপন্যাসের সূচনায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুর্কী আক্রমণের উল্লেখ করেন—"বক্তিয়ার খিলজি সতের জন অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে নবদ্বীপের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলে, মহারাজ লক্ষ্মণেয়ের ব্রাহ্মণ

সচিবেরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে গোপনে পলায়ন করিতে বলিলেন। বৃদ্ধরাজা সেই সকল দুর্বুদ্ধি বিপ্রমন্ত্রীর পরামর্শে সস্ত্রীক ও গুপ্তদ্বার দিয়া গঙ্গাতটে প্রস্থান করিলেন।...রাজা পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় প্রাণ-সদৃশী রাজধানী পলায়ন করিতে পারিল না। শত্রু করে নবদ্বীপের একশেষ দুর্দ্দশা ঘটিল। রাজ্য অরাজক হইয়া উঠিল। যবনেরা অল্পদিনের মধ্যে এতদূর অত্যাচার আরম্ভ করিল যে, হিন্দু প্রজাগণের মৃত্যুই একমাত্র মানসম্ভ্রম রক্ষার অবলম্বন হইয়া উঠিল। অনেক প্রজা যবনকরে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া, দেশত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে লাগিল।" (প্রথম পরিচ্ছেদ)। কিন্তু উপন্যাসের মূল সমস্যা বা পরবর্তী কাহিনীধারার সঙ্গে যবনের অত্যাচার অথবা দেশের অরাজক অবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। (শুধুমাত্র গোলোকনাথের সপরিবারে গৃহত্যাগের কারণ হিসাবে তুর্কী আক্রমণ-প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে)। তবে উপন্যাসের পাঠক যদি মনে রাখেন 'হিরণ্ময়ী'র কাহিনী ছ'শো বছরের আগের ঘটনা তাহলে রাজকৃষ্ণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আবার এরই মধ্যে নতুন কালের ভাবনাও সঞ্চারিত করেন ঔপন্যাসিক—উনিশ শতকের পাঠক যাতে কাহিনী-বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে অপরিচয়জনিত অতিরিক্ত দূরত্ব অনুভব না করে, তাই আধুনিক ঔপন্যাসিকের আত্মপ্রক্ষেপের প্রয়োজন হয়। জগদীশপ্রসাদের 'বাস্তবাটী'র বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক নিতান্ত অকারণে আধুনিক বাঙালির জীবনধারা নিয়ে এক দীর্ঘ ভাষণ দান করেন—"পরিবর্ত্তনশীল কালদেবতার তৌলদণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর মিঃ এ, বি, সি, বিলাইচাঁড বানারজী এস্কোয়ার, রাঘু, সাধু, মাধু প্রভৃতির সহিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর জগদীশ প্রভৃতিকে ওজন করিয়া দেখিলে চিনিয়া উঠা ভার। এখন কোন কোন বঙ্গীয় ধনী বা মধ্যবিত্তের গৃহে প্রবেশ করিলে সহসা বোধ হয় যে, যেন কোন পিক্রুর বাড়ীতে আসিয়াছি না কি? এই টেবিল—এই সানক—এই কাচের গেলাস—এই কাঁটা-ছুরী-চাম্‌চে—এই হ্যাট-কোট-পেণ্ট্‌লেন-এই রাশীকৃত মদের বোতল! এই সব দেখিয়া কে বলিবে যে, ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর জগদীশপ্রসাদের দেশ? তাই বলিতেছি যে, ভগবান্ জানেন, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলীর ভবিষ্যৎ কিরূপ ভয়ানক বা ভরসাপ্রদ।" (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। মনে হয় এইভাবে রাজকৃষ্ণ অতীতাশ্রয়ী কাহিনীকে সমকালের সঙ্গে যুক্ত করেন। 'হিরণ্ময়ী' উপন্যাসে আগাগোড়া এই দুটি স্তর বা মাত্রা রক্ষাকেই আমরা রচনাকৌশলের বৈশিষ্ট্য বলেছি।

'হিরণ্ময়ী'কে সাধারণভাবে ত্রিভুজপ্রেমের কাহিনী বলা যায়। হিরণ্ময়ী কিরণময়ী ও ধীরেন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে নাট্যদ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে। গোলোকনাথের বালকপুত্র ধীরেন্দ্রনাথ নৌকাডুবির পর মধুপুরের জগদীশপ্রসাদের গৃহে আশ্রয় লাভ করে। জগদীশপ্রসাদ নিরাশ্রয় ধীরেন্দ্রনাথকে পুত্র স্নেহে পালন করেন এবং কয়েক বছর পরে বড়ো মেয়ে কিরণময়ীর সঙ্গে বিবাহ দিতে চান। কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী

দুজনেই ধীরেন্দ্রনাথকে ভালোবাসে ; ধীরেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে হিরণ্ময়ীর প্রতি আসক্ত। ধীরেন্দ্র-হিরণ্ময়ীর গোপন সম্পর্ক প্রকাশ হয়ে পড়লে কিরণময়ী বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করে। এদিকে হিরণ্ময়ীর মানসিক বৈকল্য তাকে গৃহত্যাগী করে আত্মহননের পথে নিয়ে যায়। তার অনুসন্ধানে সকলে এমনকি কিরণময়ীও গৃহত্যাগ করলে জগদীশ-পত্নী জাহ্নবী শোকে মৃত্যুবরণ করেন।

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে হিরণ্ময়ীর বহড়া গ্রামে মঙ্গলার লালসার শিকার হওয়া, ডাকাত বীরচাঁদের সাহায্যে পুনর্জীবনলাভ, কাপালিকের হাতে বন্দীদশা, মাখনের সাহায্যে ধীরেন্দ্র ও হিরণ্ময়ীর মুক্তিলাভ ও শেষে সকলের মিলন বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের শেষে "এই অচিন্ত্য ঘটনা সঙ্ঘটিত হইতে দেখিয়া নদীতটস্থ সকলেই বিস্ময়ে পুলকিত হইল।...অদ্ভুত ঘটনার উপর অদ্ভুত ঘটনার সম্পাত দেখিয়া সকলেরই বিস্ময়, আনন্দ ও কৌতূহল স্তূপীভূত হইতে লাগিল।" ( অষ্টষষ্টি পরিচ্ছেদ )। বলাবাহুল্য এই সব অদ্ভুত ঘটনার জন্য বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গদেশে আগমনের, এমন কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পটভূমি ব্যবহারেরও প্রয়োজন ছিল না। তবে রবীন্দ্রনাথ রোমান্সের লক্ষণ-নির্দেশকালে যে-কথা বলেছেন, 'হিরণ্ময়ী' প্রসঙ্গে তা আমরা মনে রাখতে পারি—"আমাদের প্রতিদিনের জীবযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। যেমন দূরদিগন্তের নীলিমায় অরণ্য পর্বতকে একটা অস্পষ্টতার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য দেয় এও তেমনি।...তা যদি রঙিন কুহেলিকায় রচিত হয় তবুও তার রস আছে।"[৬] 'হিরণ্ময়ী'র মধ্যে এই অপরিচয়ের রসপরিস্ফুটনে কবি রাজকৃষ্ণের প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কিন্তু 'হিরণ্ময়ী'র মধ্যে অদ্ভুত ঘটনার আতিশয্য থাকলেও তাকে যথার্থ রোমান্টিক উপন্যাস বলা যায় না। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা রোমান্স বা রোমান্টিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন এই ভাবে, " 'A romance' in its modern meaning, signifies that type of novel which is more concerned with action than with character, which is more properly fictional than legendary since it is woven so largely from the imagination of the author, which is read more as a means of escape from existence than of familiarity with the actualities of life."[৯] 'হিরণ্ময়ী রচনাকালে রাজকৃষ্ণ মনে হয় একই সঙ্গে 'কপালকুণ্ডলা'-'মৃণালিনী' এবং 'বিষবৃক্ষ'-'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র আদর্শ অনুসরণ করেছেন, অর্থাৎ একই আধারে তিনি রোমান্স, সামাজিক উপন্যাস ও মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস পরিবেশন করতে চেয়েছেন। কিন্তু 'কাহিনী' ( রোমান্স ) ও 'আখ্যান' ( নভেল ) স্বভাবধর্মে স্বতন্ত্র, ফলে রাজকৃষ্ণের উপন্যাস যেমন নিছক কাহিনী নয়,

তেমনি তাকে আখ্যান বলাও কঠিন। ঘটনার ঘনঘটা পরিহার করা যায়নি, যদিও চরিত্রের 'অন্তর্বিষয় প্রকটনে' লেখকের আগ্রহ বেশি।

হিরণ্ময়ী চরিত্রকে লেখক সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন, অন্তত উপন্যাসের নামকরণ থেকে তাই মনে হয়। উপন্যাসের সূচনায় অবশ্য হিরণ্ময়ী ও কিরণময়ীর একত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে দ্বৈত নায়িকার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে ধীরেন্দ্রনাথকে নিয়ে দুই বোনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে এক ধরনের 'আয়রনি' লুকিয়েছিল। শৈশবে "দুইটি ভগিনী একপ্রাণ ও একচিত্ত, কেবল ভিন্ন দেহ। সর্ব্বদাই দুইজনে এক স্থানে খেলা করে—এক স্থানে বসিয়া আহার করে—এক দ্রব্য দুই ভাগ করিয়া ভক্ষণ করে—এক স্থানে শয়ন করিয়া থাকে। এক জনকে অপরজন দেখিতে না পাইলে কাঁদিয়া উঠে, ভাবিতে থাকে এবং কিছু খাইতে চাহে না।" অর্থাৎ "কিরণ হিরণ দুই বোন্ / দুই শরীরে এক মন।" (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। কিন্তু প্রেমের উন্মেষ উভয়ের চরিত্রবিকাশের যেমন সহায়ক হয়েছে, তেমনি চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে প্রকাশ করেছে। শৈশবে দৌড় প্রতিযোগিতায় কিরণময়ীকে পরাজিত করে হিরণ্ময়ী যেমন পুতুলের অধিকারী হয়েছে, তেমনি 'নবযুবতী' হিরণ্ময়ী প্রেমের প্রতিযোগিতায় কিরণময়ীকে হারিয়ে ধীরেন্দ্রনাথকে লাভ করেছে। পুতুল ছিঁড়ে দু'ভাগ করার মধ্যে ভগিনীপ্রেম থাকলেও এক ধরনের নির্মমতাও কাজ করেছে। পরবর্তীকালে ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কিরণময়ীর বিবাহ স্থির হলে তখনও হিরণ্ময়ী ঈর্ষাকাতর হয়ে নির্মম স্বার্থপর আচরণ করেছে। দেবপ্রসাদী পুষ্পহাতে ধীরেন্দ্রকে দিয়ে সে শপথ করায়—"কিরণময়ীকে বিবাহ করিব না।" (উনবিংশ পরিচ্ছেদ)। ধীরেন্দ্রকে লাভ করার পথে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। হিরণ্ময়ীর মানসিক সংকটের চিত্রাঙ্কনে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় মেলে। তবে প্রেম-মনস্তত্ত্ব পরিস্ফুটনের দিক থেকে কিরণময়ী চরিত্রটি আরও সুচিত্রিত। কাহিনীর প্রথম দিকে কিরণময়ীও হিরণ্ময়ীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে। হিরণ্ময়ী কাগজে ধীরেন্দ্রের নাম লিখলে তা কিরণময়ীর চোখে পড়েছে এবং মাকে বলে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছে। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে হিরণ্ময়ী ও কিরণময়ীর চরিত্রে কোন অসংগতি দেখা যায়নি। কিন্তু পরে কিরণময়ীকে যেন মানবী থেকে দেবীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তার নিঃস্বার্থতা, ত্যাগের মহিমা তাকে শ্রদ্ধার আসন দিলেও তার বেদনা প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে। ধীরেন্দ্রের প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে বলা যায় না, কিন্তু মনোভাবের প্রকাশ বিশ্বাস্যতার সীমা অতিক্রম করেছে। হিরণ্ময়ীকে সে বলে, "বন্ধুকে যেরূপ ভালবাসিতে হয়, ধীরেন্দ্রনাথকে সেইরূপ ভালবাসিব। ভগিনীপতিকে যেরূপ ভালবাসিতে হয়, আমি ধীরেন্দ্রনাথকে সেইরূপ ভালবাসিব।" (দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ)। উপন্যাসের অন্তিম

পরিচ্ছেদেও কিরণময়ীর স্বগতোক্তি—"ধীরেন্দ্রনাথ আমার মানসস্বামী, আমি যাবজ্জীবন মানসেই ইহার সেবা করিব। এইরূপ সেবা করিতে করিতেই ইহলোক পরিত্যাগ করিব। পরজন্মে যাহাতে ইহাকে বিবাহ করিতে পারি, এক্ষণ হইতে সেরূপ ব্রত করিব। আমি এক্ষণে উদাসিনী। উদাসিনীর যাহা কার্য্য, তাহাই করিব। গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থে তীর্থে পর্ব্বতে পর্ব্বতে—বনে বনে সমুদ্রতটে পরজন্মে ধীরেন্দ্রনাথ-লাভের জন্য তপস্যা করিব।" (অষ্টষষ্টিতম পরিচ্ছেদ)।

পুরুষ চরিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে রাজকৃষ্ণ তেমন সাফল্য দাবি করতে পারেন না। ধীরেন্দ্রনাথ অনেক গুণের অধিকারী হলেও তার চরিত্রে কোনো বিকাশ বা বিবর্তন দেখা যায় না। দুই নারীর প্রেম যে সংকট সৃষ্টি করতে পারতো, তা যেন সৃষ্টি করেনি। সে অবস্থাচক্রের দ্বারা চালিত অথবা সমস্যা-ভীত পলায়নতৎপর। কিরণময়ী সম্বন্ধে তার মনোভাব কোথাও স্পষ্ট নয়। অথচ চরিত্রটি সম্ভাবনাপূর্ণ, কিন্তু লেখক সে সম্ভাবনার সুযোগ গ্রহণ করেননি।

রাজকৃষ্ণের উপন্যাসে চরিত্রপরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব যেভাবে সংকেত ও ইঙ্গিতময় ভাষায় প্রকাশ পায়, রাজকৃষ্ণ তা আয়ত্ত করতে পারেননি। ফলে বঙ্কিমের প্রভাব বলতে সমালোচক দেখেছেন, "পরিচ্ছেদের নীচে শিরোনাম, ঘটনার ক্ষেত্রে পাঠককে আহ্বান, ঘটনা ও চরিত্র সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য" এবং "হিরণ্ময়ীর স্বপ্ন-প্রসঙ্গ"।[৮] তবে প্রভাব-নির্দেশে আগ্রহাতিশয্য আমাদের কখনও বিপথগামীও করে, যেমন দস্যু বীরচাঁদ চরিত্র পরিকল্পনায় ভবানীপাঠকের প্রভাব, কিংবা কাপালিক ভৈরবানন্দের আরণ্য পরিবেশ—"দেবীচৌধুরাণীর ভবানী পাঠকের আড্‌ড়াস্থলও প্রায় অনুরূপ।[৯]"—এমন মন্তব্য করেন সমালোচক। কিন্তু 'হিরণ্ময়ী'র প্রকাশকাল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ, 'দেবীচৌধুরাণী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে।

ঘটনার চমৎকারিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও আছে সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে 'হিরণ্ময়ী'র তুলনা অসংগত। রাজকৃষ্ণ যেন চমকের পর চমক সৃষ্টি করে চলেছেন, যার মধ্যে কোনোরকম কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। ছদ্মবেশ-গ্রহণ এবং বিশেষ মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ—সাহিত্যে কোনো অভিনব ব্যাপার নয়। কিন্তু চণ্ডাল বালক মাখন রূপে কিরণময়ী, ভৈরবানন্দ কাপালিকরূপে বীরেন্দ্রনাথ, কাপাসডাঙার পাচকরূপে গোলোকনাথ, ভিখারিণীরূপে তারাসুন্দরী, বীরচাঁদরূপে মধুমাঝি—তালিকাটি বড়ো দীর্ঘ। উপন্যাসের শেষে সকলেই ছদ্মপরিচয় ত্যাগ করে আত্মপরিচয় দান করেছে। উপন্যাসের মিলনান্ত পরিণামের জন্য হয়তো এর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু রূপকথার জগতে এরকম ঘটনা অপ্রত্যাশিত না হলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অবাঞ্ছিত।

'হিরণ্ময়ী' উপন্যাসের পরিশিষ্ট হিসাবে রাজকৃষ্ণ লেখেন 'কিরণময়ী' ( ১৮৮১ )। সে কালে উপন্যাস-পাঠক সম্ভবত একই কাহিনীর অনুসরণে বৃত্তের প্রসার কাম্য বিবেচনা করতেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেরও তথাকথিত 'পরিশিষ্ট' রচনা করেছেন অন্য ঔপন্যাসিক। এগুলিকে আমরা 'জোড়া উপন্যাস' বলতে পারি। 'হিরণ্ময়ী' উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদেই রাজকৃষ্ণ পরবর্তী উপন্যাসের ভূমিকা রচনা করে রাখেন—"তাহার পর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে আমি অনবকাশ প্রযুক্ত পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিবারণ করিতে পারিলাম না। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই স্থলেই 'হিরণ্ময়ী' উপন্যাসের সমাপ্তি ধরিয়া লউন।" কিন্তু 'হিরণ্ময়ী'—'শেষ হয়ে হইল না শেষ'। জগদীশপ্রসাদ চেয়েছিলেন কিরণময়ীর সঙ্গে বীরেন্দ্রনাথের বিবাহ দিতে, কিন্তু উভয়েই অসম্মত। বীরেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগ করলেন, পথে সঙ্গী জুটলো জয়রাম। এই অংশে হয়তো তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'র কিছু প্রভাব আছে, তবে রাজকৃষ্ণ যে ভাবে হিন্দুবীরকুলতিলক বীরেন্দ্রনাথকে চিত্রিত করেছেন, তার সঙ্গে তারকনাথের উপন্যাসের কোনো যোগ নেই। বীরেন্দ্রনাথের সন্ধানে বার হলেন ধীরেন্দ্রনাথ, তারপর পাঠানের হাতে তার বন্দীদশা। 'কিরণময়ী' উপন্যাসে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ কিছু বেশি পরিমাণে আনা হয়েছে—তেত্রিশ পরিচ্ছেদে নবাব গায়সুদ্দিনের শাসন ও বিচারের সবিস্তার বর্ণনা শুধু কাহিনীর অগ্রগতিতে সাহায্য করেনি ( দেবনারায়ণ শর্মার বিপদ থেকে মুক্তিলাভ), কাহিনীর মধ্যযুগীয় পটভূমিকে জীবন্ত করে তুলেছে। 'কিরণময়ী' উপন্যাসে মুসলমান শাসকদের অত্যাচার বর্ণিত হলেও নবাবের ন্যায়নিষ্ঠা ও অপক্ষপাত মনোভাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। সুড়ঙ্গ, কারাগার, অরণ্য, গৌড়নগরী নানা স্থানে ঘটনা ঘটেছে—ঘটনাগুলির মধ্যে বিশেষ কোন যোগসূত্র আছে তাও নয়। তবে কিরণময়ীর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, সাহস, কর্মতৎপরতা উপন্যাসে তাকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা দিয়েছে। ধীরেন্দ্রনাথের তুলনায় বীরেন্দ্রনাথ অবশ্যই অনেক বেশি সক্রিয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ-কাহিনীর সঙ্গে কিরণময়ী-কাহিনীর যোগসূত্র কোথাও স্পষ্ট নয়। উপন্যাসের শেষে অবশ্য মন্তব্য করা হয়েছে, "সময়ের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। বীরেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে সংসারধর্ম্মে চিত্তসংযোগ করিলেন। কালের মহিমা কে বুঝিবে? ধন্য কিরণময়ী!" বীরেন্দ্রনাথের সংসার-ধর্মে চিত্তসংযোগে 'কালের মহিমা' বা 'কিরণময়ী'র মহিমা ঠিক বোঝা যায় না। তবে কিরণময়ীর মহিমা-প্রদর্শনে লেখকের আগ্রহ 'হিরণ্ময়ী'র মধ্যেও দেখা গেছে, কিন্তু সেখানে কিরণময়ীর মধ্যে যেটুকু মানবী পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, উপন্যাসের নামভূমিকা গ্রহণের পর তা একেবারে বিলুপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও, প্রথমত তা এসেছে কাহিনীর শেষে, দ্বিতীয়ত কখনও তা আরোপিত বলে

মনে হয় না। কিন্তু রাজকৃষ্ণ উপন্যাসের প্রায় সূচনায় কিরণময়ী সম্বন্ধে কিছুটা একই ভাষায় প্রশস্তি রচনা করেন, কিন্তু কেন এই মহিমা-কীর্তন তা ঠিক বোঝা যায় না—"ধন্য কিরণময়ী! যদি পৃথিবীতে থাকিয়া দানশক্তির পরিচয় দিতে হয়, তবে যেন লোকে তোমাকে দৃষ্টান্ত করে। তোমার দানের সীমা নাই—স্বার্থপরতা নাই—আত্মগৌরব নাই—অহঙ্কার নাই—প্রশংসালাভের ইচ্ছা নাই—তবে কি আছে?—আছে সীমার অতীত সীমা—স্বার্থপরতার অতীত স্বার্থপরতা—আত্ম-গৌরবের অতীত আত্মগৌরব—অহঙ্কারের অতীত অহঙ্কার—প্রশংসালাভের অতীত প্রশংসালাভের ইচ্ছা।—সে সকল কি?—লোকাতীত দৈবভাব। দেবতার ন্যায় হৃদয় না হইলে, কেহ তোমার মত অলৌকিক দান করিতে পারে না। তাই বলিতেছি, যদি পৃথিবীতে থাকিয়া দানশক্তির পরিচয় দিতে হয়, তবে যেন লোকে তোমাকে দৃষ্টান্ত করে।" (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। লোকাতীত দৈবভাব বর্ণনার পরেই কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের প্রণয়াবিষ্ট কিরণময়ীর বর্ণনা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে—"কিরণময়ী কুঞ্জমধ্যে বসিয়া একবার হাসিতে লাগিলেন—একবার ভাবিতে লাগিলেন—একবার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন—একবার বহির্জগৎ ভুলিয়া অন্তর্জগতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মনোমধ্যে কি এক ভাবের উদয় হইল, অমনি তিনি সাধের বেলমালা দুই হাতে ধরিয়া নিজের মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন।..." ইত্যাদি (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। আসলে উপন্যাসের শেষে লেখক দেখাবেন "কাশীবাসিগণ তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা ও গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দেবী বলিয়া ডাকিত।" (চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ)। কিন্তু মানবী কেমন করে দেবীতে রূপান্তরিত হলো তা যেমন দুইখণ্ড 'হিরণ্ময়ী' থেকে জানা যায় না, তেমনি 'কিরণময়ী' নামে 'পরিশিষ্ট' ভাগ থেকেও জানা গেল না। কিন্তু সে কালের পাঠক হিরণ্ময়ী-কিরণময়ীকে শুধু ভালোবেসেছে তাই নয়, 'হৃদয়মন্দিরে' স্থান দিয়েছে। শশিশেখর বসু তাঁর স্মৃতিকথায় সে কালের পাঠকের প্রতিক্রিয়া সবিস্তারে জানিয়েছেন।[১০]

'হিরণ্ময়ী'-'কিরণময়ী' যখন লিখছেন রাজকৃষ্ণ, প্রায় সেই একই সময়ে তিনি লিখছেন 'দুই শিকারী'র (১৮৮২) মতো আধুনিক রূপকথা। রাজকৃষ্ণ অবশ্য 'দুই শিকারী'কে রূপকথা না বলে 'আর এক ধরণের খোসগল্প' বলেছেন। একদা পদ্যে তিনি অনেক খোসগল্প লিখেছেন, যেগুলিকে সরস নীতিগল্প বলা যায়। 'দুই শিকারী'র কাহিনীকে অবশ্য পদ্যের আধারেও পরিবেশন করা যেত। কিন্তু এখানে প্রচলিত খোসগল্পের মতো পরিহাস রসিকতার স্থান নেই। খুঁজলে নীতিউপদেশ মিলবে না তা নয়, (সপ্তম অধ্যায়ে দুর্বৃত্ত সেনাপতির পরিণাম প্রসঙ্গে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে।) কিন্তু নীতিপ্রচারের জন্য 'দুই শিকারী' লেখা হয়নি। গল্পের জন্যই যেন গল্প বলা—আর সে গল্প দিগন্ত

বিস্তৃত তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কল্পনার ঘোড়া ছোটানো। তবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা বাস্তবতা-অবাস্তবতার প্রশ্ন তুলি, রূপকথার ক্ষেত্রে সব কিছুই সহজভাবে মেনে নিই। রূপকথাকে যদি রূপক-হিসাবে গ্রহণ করি, তাহলে তার মধ্যেও বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন আবিষ্কার করা সম্ভব। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রূপকথার স্বরূপ ব্যাখ্যাকালে তাই লেখেন, "রূপকথা কতকগুলি অসম্ভব বাহ্যঘটনার ছদ্মবেশ পরিয়া আমাদের মনের সহিত ইহার প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হইবে। বাস্তব জগতে যে শক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান করি রূপকথার রাজ্যেও সেই মানব-মনের আদিম-সনাতন নীতিরই আধিপত্য। সেই পরিপূর্ণ সুখের সন্ধান, সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ, সেই সৌন্দর্য-পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি, সেই আশাতীত শক্তি-সম্পদ লাভ। পাপপুণ্যের জয় পরাজয়—পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন জিনিষই এই নূতন রাজ্যের অধিবাসী।"[১১] 'দুই শিকারী' রূপকথার মধ্যেও সোনা-রূপোর কাজ করে যে বড়ো ভাই, তার লোভ ও বিদ্বেষবুদ্ধি; রাজা ও রাজকন্যার বিপদ; রাক্ষসের অত্যাচার; দুর্বৃত্ত সেনাপতির দুষ্কর্মের ফল ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

"দুই শিকারী'র কাহিনী দেশ বিদেশের নানা রূপকথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। রূপকথার আঙ্গিকেই গল্পের সূচনা—"সে অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে দুই ভাই বাস কত্তো। বড় ভাই ছিল বড় মানুষ আর ছোট ভাই গরীব।" (প্রথম অধ্যায়)। তারপর সোনার পাখি, সোনার পাখির বদলে হাঁসের মাংস, বনের মধ্যে শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ, বনের পশুদের মুখে মানুষের মতো কথা ও আচরণ, রাক্ষসের হাতে রাজকন্যা-সমর্পণের ঘটনা, রাক্ষস বধ, ডাইনীর মায়া প্রভৃতি নানা বৃত্তান্তের (মোটিফ্) অবতারণা থেকে বোঝা যায়, রাজকৃষ্ণ সচেতন ভাবেই রূপকথা লিখতে চেয়েছেন। লক্ষণীয়, 'দুই শিকারী' গল্পে কোনো চরিত্রই ব্যক্তিনামের দ্বারা চিহ্নিত নয়। আসলে এখানে বিশেষ ব্যক্তির কাহিনী নয়, নির্বিশেষ কতকগুলি অভিজ্ঞতাকেই নানাজনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। তবে বিপদ-বাধা অতিক্রম করে মিলনান্ত পরিণামের আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন। তাই রূপকথার মধ্যে মানবচরিত্র ও মানবমনস্তত্ত্বের রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা অসংগত নয়—"In its written form the fairy tale tends to be a narrative in prose about the fortunes and misfortunes of a hero or heroine who, having experienced various adventures of a more or less supernatural kind, lives happily ever after. Magic, charms, disguise and spells are some of the major ingredients of such stories, which are often subtle in their

interpretation of human nature and psychology."[১২]

'দুই শিকারী' উপন্যাস হিসাবে বিচার্য নয়। তবে গদ্যে লেখা নাতিদীর্ঘ আখ্যান হিসাবে 'দুই শিকারী'কে রোমান্সেরই একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। রাজকৃষ্ণের পরবর্তী উপন্যাস 'অদ্ভুত ডাকাত'কেও আমরা শুধু রোমাঞ্চকর রচনা নয়, রোমান্সেরই আর একটি রূপ বলে গ্রহণ করতে পারি।

গৌড়ের পতনকালে বাংলা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের পটভূমিতে রচিত হয়েছে রাজকৃষ্ণের 'অদ্ভুত ডাকাত' (১৮৮৯) উপন্যাস। অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় উপন্যাসটির কাহিনী, দুই ভাই-এর বিচ্ছেদ-মিলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। জমিদার ধনেশ্বর সিংহরায় এবং ভীমভাম ডাকাতরূপী ছোট-ভাই রত্নেশ্বর সিংহরায়ের চরিত্র-বৈপরীত্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধনেশ্বর ধনলোভী, অধার্মিক অত্যাচারী; রত্নেশ্বর পরোপকারী, দয়ার্দ্রচিত্ত। গৃহত্যাগী রত্নেশ্বরের অপহৃত কন্যা সরলাকে কেন্দ্র করে কাহিনী দানা বেঁধেছে। শৈশবাবস্থায় অপহৃতা সরলা পরিচয়হীনভাবে ধনেশ্বরের কন্যারূপে প্রতিপালিত হয়। সরলার প্রাণরক্ষক এবং ধনেশ্বরের কর্মচারী যাদবেন্দ্রের সঙ্গে ধনেশ্বর কন্যার বিবাহে অসম্মত হয়, অবশেষে ভীমভামের সহায়তায় প্রতিশ্রুত যাদবেন্দ্রের সঙ্গে সরলার বিবাহ হয়। সরলার জন্য নির্দিষ্ট পাত্র নীলকান্ত রায়ের সঙ্গে কনিষ্ঠা কন্যা তরলার মিলন ঘটে। এই উপলক্ষে দুই ভাই-এর পুনর্মিলন হয়। কূটবুদ্ধি ধনেশ্বর একদা ভাইকে বঞ্চিত করে যে সম্পত্তি গ্রাস করেছিল, তা সে ফিরিয়ে দেয়। ভীমভামের সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ উন্মোচিত হলে দেখা যায়—সে-ই হলো রত্নেশ্বর—যাকে বলা যায়—'অদ্ভুত ডাকাত'।

কাহিনীতে ঐতিহাসিক যুগকালের উল্লেখ থাকলেও তার প্রভাব বা ভূমিকা উপন্যাসে বিশেষ দেখা যায় না। উপন্যাসটি ঘটনার চমৎকারিত্বে পরিপূর্ণ। ধনেশ্বরের অধর্মাচরণের পরিবর্তে ধার্মিক, সৎ জীবনাচরণ—অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। আকস্মিক পরিবর্তন মনস্তত্ত্বসম্মত তো নয়ই—পূর্বপ্রস্তুতিহীন। রত্নেশ্বরকে কিছু পরিমাণে বঙ্কিমের ভবানী পাঠকের আদর্শে অনুপ্রাণিত বলা যায়। তার কর্তব্যনিষ্ঠা, এবং সৎ-জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে সে আদর্শ চরিত্রে রূপান্তরিত। মানুষের মঙ্গলপ্রচেষ্টায় গৃহত্যাগী রত্নেশ্বর ডাকাতের ছদ্মবেশ ধারণ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। স্ত্রী দ্রবময়ীর চরিত্রটি নারী-সুলভ কোমলতায় পরিপূর্ণ।

'অদ্ভুত ডাকাত' উপন্যাসটি রাজকৃষ্ণের 'চমৎকার' নাটকের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। (তবে নাটকের তুলনায় উপন্যাসে কাহিনী বিস্তার ঘটেছে)। অতএব উপন্যাসের আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা গেল।

সৎ-সংসর্গে মানবচরিত্রের রূপান্তরের চমকপ্রদ তথা আকর্ষণীয় বিবরণ নিয়ে রচিত হয়েছে রাজকৃষ্ণ রায়ের উপন্যাস অনুপমা (১৮৮৯)। উপন্যাসের কেন্দ্রীয়

চরিত্র অনুপমা। বাগ্‌দত্তা জাহ্নবীর পরিবর্তে কালিপদর অনুপমাকে বিবাহ, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে অনুপমার কালিপদকে কারাগারে প্রেরণ, প্রসন্নের আশ্রয়গ্রহণ, প্রসন্নের দুর্ব্যবহারে তাকে হত্যা করে পলায়ন, সন্ন্যাসী-দলে যোগদান, তাদের সহায়তায় শিক্ষাগ্রহণ এবং দলের অধিনেত্রী পদ অধিকার—শেষে কালিপদর সঙ্গে পুনর্মিলন—এভাবেই কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে।

অজ্ঞাতকুলশীল, অশিক্ষিতা, দুশ্চরিত্রা নারীর স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা, হৃদয়হীনতা অনুপমা চরিত্রে প্রকাশ পেলেও সন্ন্যাসীদের সাহচর্যে তার পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করবার মতো। তার শিক্ষার যথার্থতা—কালিপদর সঙ্গে পুনর্মিলনে সম্পূর্ণ হয়েছে—লেখকের রচনাবৈশিষ্ট্য এখানেই ধরা পড়ে।

অনুপমার সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বদান—বঙ্কিমের 'দেবীচৌধুরাণী'র দেবীকে স্মরণ করায়।

শরচ্চন্দ্র দেবকে উৎসর্গীকৃত 'জ্যোতির্ময়ী' (১৮৮৯) উপন্যাসটির 'বিজ্ঞাপনে' রাজকৃষ্ণ রায় জানান, "একটি প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই জ্যোতির্ময়ী উপন্যাসখানি রচনা করিলাম। জানি না, ইহা সাধারণের নিকট কিরূপ হইয়া দাঁড়াইবে...।"[১৩] উপন্যাসটির প্রকাশকালে তার সাফল্য নিয়ে রাজকৃষ্ণের মনে আশঙ্কা থাকলেও ভাবীকালের বিচারে তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের মধ্যে 'জ্যোতির্ময়ী' সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে।

উপন্যাসটির বিষয় নরনারীর প্রেমভালোবাসা হলেও, তাকে কেন্দ্র করে সমাজের নানা সমস্যা, কুপ্রথা (পণপ্রথা), দুশ্চরিত্র মানুষের কূট অভিসন্ধি প্রকাশিত হয়েছে। অমরকুমার কাহিনীর নায়ক, তবে সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করেছে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্যামলাল। নায়িকা জ্যোতির্ময়ীর সঙ্গে অমরকুমারের বিবাহ স্থির হলেও প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় অমরের পিতা চক্রধরের অর্থলালসা, যার সুযোগ নেয় শ্যামলাল। অর্থের বিনিময়ে ভাবী বন্ধুপত্নীর সঙ্গে বিনোদবিহারী নামে এক স্বল্পশিক্ষিত যুবকের বিয়ের চেষ্টা চালায়। পরিশেষে সব ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। গুণ্ডাদের হাতে নিগৃহীত হয়ে শ্যামলাল মৃতপ্রায় হয়।

পণপ্রথার কুফল বর্ণিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। শোকাহত অমর উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত হয়েছে, জ্যোতির্ময়ীর অন্যত্র বিবাহ হওয়ার পরিণাম—বৈধব্যে ব্রহ্মচারিণী জীবনযাপন। পরিণাম আকস্মিক মনে হলেও পূর্বাপর সংগতিহীন নয়।

কাহিনীতে যথেষ্ট জটিলতা থাকলেও লেখকের উদ্দেশ্য বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয় না—ত্রিকোণ প্রেমকাহিনী বর্ণনের মধ্যে প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁর পণপ্রথার নির্মমতাকে তুলে ধরা, যে সামাজিক ব্যাধির হাত থেকে বর্তমান কালেও মেয়েরা অব্যাহতি পায়নি। চক্রধরের লোভ-লালসাই অমর-জ্যোতির্ময়ীর জীবনকে পূর্ণতা দিল না। তার কাছে রূপ নয়, রূপোর মূল্য বেশি। কুলীন-পিতা পুত্রের শিক্ষার

জন্য অর্থব্যয় করেন, তার বিবাহে প্রভূত অর্থলাভের আশায়। স্ত্রী জানতে চান, "ছেলে পাশ করানো কি মেয়ের বাপের গলায় ফাঁস জড়ানোর জন্যে ?" (চতুর্থ অংশ, প্রথম পরিচ্ছেদ)। অর্থগৃধ্নু চক্রধরের চরিত্রচিত্রণ যথোচিত হয়েছে। তার কৃপণতা যেমন স্পষ্ট, নির্মমতা-নিষ্ঠুরতাও তেমনি মর্মান্তিক। তার স্ত্রী অচলবাসিনীর ভূমিকা উপন্যাসে যৎসামান্য হলেও, দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার কোমল -প্রাণতা, পুত্রের প্রতি মাতৃস্নেহ-বাৎসল্য। পুত্রকে তিনি সস্নেহে জানান, "বউ বড়, না টাকা বড় ?…আমি সুন্দরী বউ চাই। মেয়ের বাপ চারশো টাকা দেবে তো। আমি দুশো টাকা তোকে দেবো। তুই এই দুশো টাকা, সেই চারশো টাকা একসঙ্গে ছশো টাকা করে চন্দরের কাছে দিস্। বলিস্, কনের বাপ ছশো টাকা দিয়েছে। তার জন্যে ভাবনা কি বাবা ?" (চতুর্থ অংশ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। বুকে বিষ, মুখে মধু শ্যামলাল কূট, ছলনাকারী হিসাবে সুচিত্রিত। বিনোদ সম্পর্কে মন্তব্যের মধ্য দিয়ে তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়—"বাস্তবিক, এমনতর দু'চারটে বোকা এয়ার না পেলে আমাদের থোকা টাকা হয় কৈ ?" আবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমর সম্পর্কে বলে—"অমরাটার বাবা ব্যাটা বেঁচে থেকেই যত কণ্টক হয়েছে। নৈলে এরই মাথায় হাত বুলুতেম।" (তৃতীয় অংশ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। উপন্যাসের ঘটনাধারার নিয়ন্ত্রক চরিত্র ধনলোভী এই শ্যামলাল সম্বন্ধে লেখকের বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে—পরম হিতৈষী বলে পরিচয় দিয়ে সে যখন অমরের সঙ্গে শঠতা করে, লেখক তখন মন্তব্য করেন—"বাহবা শ্যামলাল ! বাহবা তোমার বন্ধুতা ! তোমার মত বন্ধু এ জগতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায় ! তোমার মত বন্ধুর খর্পরে পড়িয়া অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে—হইতেছে—হইবে !" (তৃতীয় অংশ, প্রথম পরিচ্ছেদ)। অমরকুমার উপন্যাসের নায়ক হলেও নায়কোচিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী নয়, দুর্বল, পরনির্ভর চরিত্র। গুরুজনের প্রতি একনিষ্ঠা কৃষ্ণকান্তের প্রতি তার প্রতিজ্ঞাকে ভুলিয়ে দিয়েছে ; পিতার প্রতি আনুগত্য তাকে শেষপর্যন্ত মস্তিষ্ক বিকৃতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। উপন্যাসের নায়িকা—জ্যোতির্ময়ী। তার নামে উপন্যাসটির নামকরণ করা হলেও লেখক তাকে সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত করেননি—চরিত্রটি বিকশিত হতে পারেনি। কাহিনীতে তার উপস্থিতিও সামান্য—ছ'টি অংশবিশিষ্ট উপন্যাসের পঞ্চম অংশের প্রারম্ভে জ্যোতির্ময়ীর আবির্ভাব। সে বালিকা, তবু অমরের সঙ্গে তার পরিণয় সম্পন্ন না হওয়ার ব্যথা তার বেজেছে। বিবাহকালে তার মনে পড়ে গিয়েছে মহাভারতের সাবিত্রী-সত্যবান উপাখ্যানের কয়েকটি পংক্তি। বর্ণনায় জানতে পারি,—"যে সময়ে জ্যোতির্ময়ী বরের গলদেশে মাল্য প্রদান করিতে যাইবে, সেই সময়ে তাহার সুকোমল ভুজলতা কাঁপিয়া উঠিল। সকলের অলক্ষ্যে অবগুণ্ঠনের মধ্যে বালিকার কমলনিন্দিত কোমল নয়নযুগল ফুটিয়া হু হু করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল।" এবং শেষপর্যন্ত "…কম্পিত হস্ত আরও কাঁপিয়া উঠিল। মালা ভূতলে

পড়িয়া গেল।" (পঞ্চম অংশ, সপ্তম পরিচ্ছেদ)। অমঙ্গলের তথা দুর্ভাগ্যের পূর্বাভাস এখানেই সূচিত হয়। বিনোদের মনের আকস্মিক পরিবর্তন তার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কৃষ্ণকান্ত ও তার পিতা মধুসূদনের চরিত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয়নি। মধুসূদনের বয়স এবং পরিহাসরসিকতা বাদ দিলে দু'টি চরিত্রের চিন্তা ভাবনা এক। জগা কুমোরের প্রাগলামী উপন্যাসে ভিন্ন রস পরিবেশন করেছে।

উপন্যাসের 'দ্বিতীয় অংশ প্রথম' পরিচ্ছেদে কবি রাজকৃষ্ণ প্রকৃতি-বর্ণনার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। তারাপুরের প্রভাত বর্ণনায় রজনী ও উষার আলাপ-চারিতা তাদের সজীব মূর্তিতে উপস্থাপিত করেছে।

রাজকৃষ্ণ সমাজসমস্যা বর্ণনাকালে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। 'অর্থবোধিনী'র ভুলের কথা উত্থাপন করেছেন, ইংরেজি শিক্ষার কুফলের নিন্দা করেছেন, সেই সঙ্গে ব্যঙ্গচ্ছলে ইংরেজি শিক্ষিত বরের বাজার-দরের কথা বলেছেন। শিক্ষিত পুত্রের বিবাহকালে, "কন্যেকর্ত্তার গলায় ফাঁস—বরকর্ত্তার টাকার রাশ" (দ্বিতীয় অংশ, প্রথম পরিচ্ছেদ) বলে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। ইংরেজের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সঙ্গে সাহেবের তোষামোদকারী বাঙালির হীনমন্যতাবোধের প্রতি তাঁর বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে মনসাদাসের উক্তিতে— "বাঙালীর ঐ একটা কেমন দোষ। নিজের জুতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে সারিয়ে নেব, তাতে এত লোকলজ্জা, কিন্তু চাকরী স্থলে কত লোকের সম্মুখে সাহেবের জুতো খাবে, তার বেলা লজ্জা-সরম হয় না। উল্টে যেন কত মান-সম্মান!" (তৃতীয় অংশ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। সাময়িক প্রসঙ্গ উত্থাপনে বা সামাজিক অসংগতির চিত্র অঙ্কনে চিরকালই রাজকৃষ্ণ আগ্রহ পোষণ করেন। তবে উপন্যাসটির শিল্পসার্থকতা সম্বন্ধে মতদ্বৈততা থাকতে পারে। আধুনিক সমালোচক 'জ্যোতির্ময়ী' উপন্যাসের যথেষ্ট প্রশংসা করেন, "গ্রন্থটি লেখকের অন্যান্য উপন্যাসগুলির তুলনায় সুগ্রন্থিত ও পরিণত।—ঘটনা সংস্থাপনে লেখকের কৌশল, শিল্পকে বিঘ্নিত করেনি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিণত কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।...লেখক গল্পের মধ্যে কৌতূহল উদ্রেককর পরিবেশ সৃষ্টি করে গল্পকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।"[১৪] লেখকের শিল্পকৌশল ও পরিণত কল্পনাশক্তির নিদর্শন কাহিনীর অন্তিম কয়েকটি পংক্তিতে লক্ষ্য করা যায়। একদা অমর-প্রদত্ত 'সীতার বনবাস' গ্রন্থে রাম-সীতা রূপে যথাক্রমে অমর-জ্যোতির্ময়ীর নাম লিখেছিল জ্যোতির্ময়ী। কিন্তু নিয়তির লিখন ভিন্ন। গ্রন্থকার তাই মন্তব্য করেন—"আজ আমি, সেই পুস্তকখানি পাইলে, উপরের তিনটি পংক্তি কাটিয়া দিয়া, কেবল রাখিতাম নীচের পংক্তিটি—"সীতার বনবাস।" (ষষ্ঠ অংশ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

কিন্তু 'জ্যোতির্ময়ী' উপন্যাসে ঘটনার চমৎকারিত্ব, চরিত্রাঙ্কনে অতিরঞ্জন এবং

প্রতিপাদ্য উদ্দেশ্যের অতিপ্রকটতা উপন্যাসের শিল্প-সার্থকতার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। অবশ্য 'হিরণ্ময়ী' ও 'কিরণময়ী'র তুলনায় 'জ্যোতির্ময়ী'কে রাজকৃষ্ণের পরিণততর সৃষ্টি বলা যায়।

'প্রতিফল' ( ১৮৯৩ ) রাজকৃষ্ণের শেষ উপন্যাস। রোগশয্যায় শায়িত কবি জীবনের প্রান্তভাগে পৌঁছে উপন্যাসটি লেখেন। খুবই দ্রুত লেখা,[১৫] তা বোঝা যায়। কাহিনী এবং চরিত্র কোথাও দানা বেঁধে ওঠেনি—চরিত্র পরিস্ফুটনের দিকে মনোযোগী না হয়ে রাজকৃষ্ণ এখানে যেন দ্রুত একটি গল্প বলে ফেলতে চেয়েছেন। আখ্যাপত্রে জানানো হয়েছে 'প্রতিফল: প্রকৃত-ঘটনা-মূলক উপন্যাস।' দুশ্চরিত্র জমিদার বাস্তব চরিত্র হওয়াই সম্ভব, কিন্তু প্রকৃত-ঘটনা কখনও কল্পিত-ঘটনার থেকেও চমৎকারিত্বপূর্ণ হয়। এদিক থেকে 'প্রতিফল'কে রাজকৃষ্ণের 'চমৎকার' নাটকের মতো 'আশ্চর্য-ঘটনা-মূলক নাটক' বললে অন্যায় হবে না। গঠনগত ত্রুটি আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নাট্যগতি, নাট্যদ্বন্দ্ব, অতিনাটকীয় ঘটনাসংস্থান উপন্যাসটিকে অনেক পরিমাণে নাট্যলক্ষণাক্রান্ত করে তুলেছে।

গোবর্ধনপুরের প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যুবতী স্ত্রী সরোজিনীর চক্ষু-চিকিৎসার জন্য হরিষপুর এসেছেন, সেখানে ডাক্তার মহেন্দ্রনারায়ণ বটব্যালের সুচিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি আছে। ঘটনাচক্রে প্রমথনাথ হরিষপুরে মধু নামে এক নমঃশূদ্রের গৃহে কিছুদিন থাকতে বাধ্য হলেন। তারপর সরোজিনীর চোখ যখন অনেকটা সেরেছে, তখন মধুর চক্রান্তে তিনি গিয়ে পড়লেন দুর্বৃত্ত জমিদার যামিনীকান্তের কবলে। তবে দুষ্কৃতকারী সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করলেও শেষরক্ষা করতে পারে না—তাই বাঘশিকারীদের হাতে যামিনীকান্তের মৃত্যু হয়। সরোজিনীকে ফিরে পান প্রমথনাথ। মধু দুষ্কর্মের জন্য অনুশোচনায় কাতর হয়ে নিজের ঘরে আগুন দিয়ে মরে। 'পোয়েটিক্ জাস্টিস'-এর ইঙ্গিত হয়তো উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। কিন্তু 'প্রতিফলে'র কাহিনী নিয়ে রাজকৃষ্ণ 'খোসগল্প' লিখলে যতটা সফল হতেন, উপন্যাস লিখতে গিয়ে তা হননি। 'অদ্ভুত ডাকাত'কে যেমন উপন্যাস বলা কঠিন, 'প্রতিফল'কেও তেমনি উপন্যাস বলতে দ্বিধা হবে।

সমাজচিত্র হিসাবে 'প্রতিফল'কে রাজকৃষ্ণের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণশক্তির নিদর্শন বলা যেতে পারে। সমাজে অনেক শ্রেণীর মানুষের জীবনাচরণ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। মধ্যবিত্ত প্রমথনাথ, জমিদার যামিনীকান্ত, দরিদ্র চণ্ডাল মধু। কিন্তু শ্রেণীবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ফোটে নি কারো ক্ষেত্রে। রাজকৃষ্ণের উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে সাধারণত বিকাশ ও বিবর্তন দেখা যায় না, যেখানে পরিবর্তন ঘটে সেখানে তা আকস্মিক ও অবাস্তব। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুটনের দিকেও তাঁর আগ্রহ কম। ঘটনার গতি তাঁর উপন্যাসের চরিত্রকে গতিময় করে তোলে। স্থির চরিত্রকেও মনে হয় সচল ও

সজীব। প্রধান চরিত্র প্রমথনাথ ও সরোজিনীর পরিণাম সম্বন্ধে পাঠক কৌতুহল বোধ করে সত্য, কিন্তু তাদের প্রতি তেমন আকর্ষণ অনুভব করে না। তুলনায় পার্শ্বচরিত্রগুলি স্বল্পপরিসরে অনেক সুচিত্রিত এবং সেই জন্যই আকর্ষণীয়, যেমন তারামণি বা পরাণী, অক্ষয়কুমার বা মধুমাঝি।

'প্রতিফল' উপন্যাস হিসাবে রাজকৃষ্ণের সুনাম বৃদ্ধি করেনি। তবে তাঁর পরিণত রচনা হিসাবে অংশবিশেষ সুন্দর ও সার্থক বলেপরিগণিত হতে পারে। যেমন উপন্যাসের সূচনায় নিসর্গপ্রকৃতির বর্ণনা—

"পশ্চিমে নিশা, মধ্যে ঊষা, পূর্বে পূষা, সাঁ সাঁ করিয়া চলিতেছে। তাই দেখিয়া ভয়েই হউক, বা ভরসাতেই হউক, গাছের পাখী চিচিকুচি করিয়া সাড়া দিল। হরিষপুরের নরনারীরা বুঝিল, ভোর হইয়াছে, দোর খোলো।" (প্রথম পরিচ্ছেদ)।

এখানে নিশ্চয়ই কৌতুক সৃষ্টির কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্যে বর্ণনাভঙ্গিতে এসেছে সরসতা। তবে যেখানে সচেতন প্রয়াস, সেখানেই বর্ণনাভঙ্গি সরস হয়েও কিছুটা গ্রাম্যতা লাভ করে, যেমন—

"যেন কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া গেল, তাই রাঙা চোখে 'আরে কি কর, কোথা যাও ঊষে, ও কেলে মাগীটার পশ্চাতে কেন ছুটিতেছ, ফিরিয়া আইস, দাঁড়াও, আর যেও না' বলিতে বলিতে, ঊষার পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন।" (প্রথম পরিচ্ছেদ)।

অবশ্য সাধারণভাবে রাজকৃষ্ণের নাটকে স্থূল হাস্যরসের যে বাড়াবাড়ি দেখা যায়, উপন্যাসে তার অভাব দেখবো। উপন্যাস এদিক থেকে অনেকটা পরিশীলিত রচনা। 'প্রতিফল' উপন্যাসে তারামণিকে অবলম্বন করে যে-হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে তা খুবই উপভোগ্য—

"তারামণি বিরক্ত হইয়া বলিল—'তা তোমরা হাসবে বই কি! যার কষ্ট, সেই বোঝে, ডাক্তোরেও বোঝে না, ডাক্তোরের রূপোর পিণ্ডী ভাজা-ইটও বোঝে না, আর তোমরাও বোঝ না।'

প্রমথনাথ হাস্যমুখে বলিলেন—'বুঝি বাছা সব, কেবল বুঝি না তোমার ভাজা-ইট।'

তারামণি যেন একটু চটিয়া উঠিয়া বলিল,—'ডাক্তোরের ডাইনে-বাঁয়ের ব্রেহ্মাণ্ডীগেলা ঢলঢলে বগ্লীতে কত ভাজা-ইট গোঁজো, অথচ বোঝো না।'

প্রমথনাথ বলিলেন—'ভাজা ইট নয়,—ভিজিট।" (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)।

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৬৫, পৃ. ১৩৬।
২. যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়', প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃ. ৭৩।
৩. দ্র. শঙ্কর ভট্টাচার্য, বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান, ১৯৮২, পৃ. ৩০২।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', সাহিত্য, ১৩৬১, পৃ. ১৫৮।
৫. Arnold Kettle, ***An Introduction to the English Novel***, Vol. I, 1962, p. 36.
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৭৭, পৃ. ১০২।
৭. William Flint Thrall & Addison Hibbard, ***A Hand Book of Literature***, New York, 1936.
৮. রামদুলাল বসু, বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ, ১৯৭৪, পৃ. ১৪৩।
৯. তদেব, পৃ. ১৪১-৪২।
১০. শশিশেখর বসু, 'রাজকৃষ্ণ রায়', কথাসাহিত্য, শ্রাবণ ১৩৬১, পৃ. ৭৮৫।
১১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রূপকথা', বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ১৩৫৩, পৃ. ৪।
১২. J. A. Cuddon, ***A Dictionary of Literary Terms***, 1985, p. 258.
১৩. রাজকৃষ্ণ রায়, 'বিজ্ঞাপন', জ্যোতির্ময়ী, ১৫ চৈত্র ১২৯৫, পৃ. [ ৫ ]।
১৪. রামদুলাল বসু, বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ, পৃ. ১৪৬-৪৭।
১৫. দ্র. "তিনি [ রাজকৃষ্ণ ] 'প্রতিফল' নামক একখানি উপন্যাস, আমাদের 'মাসিক উপন্যাস' পত্রের জন্য, তিনদিনে সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন—তাহাও বৈকালে দুই এক ঘণ্টা মাত্র লিখিয়া!"—অনুসন্ধান, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১, পৃ. ১৫৪।

স্বল্পপরিসর জীবনে নানা সমস্যা ও ঘাতপ্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন রাজকৃষ্ণ রায়। কিন্তু তারই মধ্যে অসাধারণ পরিশ্রমশক্তি, অধ্যবসায় ও উদ্যমের অধিকারী রাজকৃষ্ণ নানা ধরনের গ্রন্থ রচনা করে চলেছেন। অবশ্য কাব্যরচনায় তিনি যে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন, গদ্যরচনায় তা থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বহুবিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও অনুশীলন তাঁকে নানা ধরনের গ্রন্থরচনায় প্রণোদিত করেছে। মনে হয়, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব-বিদ্যায় রাজকৃষ্ণের বিশেষ প্রবণতা ও অধিকার ছিল। তাঁর গদ্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে দুটি ইতিহাস-বিষয়ক, অন্যটি বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক দেবতত্ত্ব থেকে শুরু করে ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ সংকলন।

রাজকৃষ্ণ যখন 'কাশীমবাজার রাজবংশের বিবরণ' (১৮৭৫) বইটি লেখেন, তখনও পর্যন্ত বাংলা দেশের কোনো যথার্থ ইতিহাস লেখা হয়নি। ইংরেজ রাজকর্মচারীরা যে কয়েকটি বই লেখেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, সেগুলিকে "আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধ-পুরাণ মাত্র।"[১] রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায় নিয়ে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ লিখলেও, কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেননি। এ অবস্থায় তথ্যনির্ভর আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার প্রশ্নই ওঠে না। অথচ আঞ্চলিক ইতিহাস সংগ্রহের মধ্য দিয়ে যে-ভিত্তি রচনা করা হয়, তার উপরই সমগ্র দেশের ইতিহাস-সৌধ দাঁড়িয়ে আছে। এদিক থেকে রাজকৃষ্ণের লেখা 'কাশীমবাজার রাজবংশের বিবরণ' খুবই মূল্যবান আকর গ্রন্থ। কাশিমবাজারের রাজবংশ স্থাপনের ইতিহাস আধুনিক বঙ্গীয় সমাজ-ইতিহাসের শুধু অঙ্গ নয়, ইংরেজ শাসনাধীন মুর্শিদাবাদের ইতিহাস বলেও পরিগণিত হতে পারে। কান্তবাবু, যিনি পরে কৃষ্ণকান্ত নন্দী নামে প্রভূত বিত্ত ও ভূসম্পত্তির অধিকারী হন, তাঁর উত্থান-ইতিহাস নিঃসন্দেহে বঙ্গীয় বহু অভিজাত পরিবারের তথাকথিত আভিজাত্যলাভের ইতিহাস। নবাব সিরাজউদ্দৌলার ক্রোধ থেকে ওয়ারেন হেস্টিংসকে রক্ষা করে আশ্রয়দান, তাঁর ভাগ্যোদয়ের কারণ। "প্রতিদানে পরবর্তীকালে হেস্টিংস তাঁহাকে নিজ ব্যবসায়ের মুৎসুদ্দি নিযুক্ত করেন এবং গভর্নর জেনারেল হইবার পর (১৭৭৩ খ্রী) বহু লাভজনক জমিদারি, খামার ও বারাণসীর চৈৎসিংহের লুণ্ঠিত সম্পত্তির কিয়দংশ দান করেন। এই ভাবে হেস্টিংসের সহায়তায় কান্তবাবু কাশিমবাজার রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।"[২] কাশিমবাজার রাজপরিবার নিয়ে সম্ভবত প্রথম তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ লেখেন কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-৭৩)। কিশোরীচাঁদ 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় 'Territorial Aristocracy of Bengal' নামে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন (১৮৭২) যার বিষয় ছিল যথাক্রমে

বর্ধমানরাজ, নদীয়ারাজ, রাজশাহীরাজ এবং কাশিমবাজার রাজপরিবারের বৃত্তান্ত। রাজকৃষ্ণ 'কাশীমবাজার রাজবংশের ইতিহাস' লেখার সময় সম্ভবত কিশোরীচাঁদের প্রবন্ধ থেকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য গ্রহণ করেন। তবে কিশোরীচাঁদ বা রাজকৃষ্ণ, এমন কি আরও পরবর্তীকালে লোকনাথ ঘোষ[৩]—কেউই কৃষ্ণকান্ত-লোকনাথ-কৃষ্ণনাথ-স্বর্ণময়ীর যথার্থ ইতিহাস লিখে উঠতে পারেননি। কারণ মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ এবং তাঁর কাছে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাবোধ।[৪] তাছাড়া জনশ্রুতিমূলক কাহিনী ভিন্ন ইতিহাস রচনার যথার্থ উপকরণও তাঁদের হাতে ছিল না। আধুনিককালে সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর লেখা দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ ***Life and Times of Cantoo Baboo*** কাশিমবাজার রাজপরিবার সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করেছে, তবে প্রভূত তথ্যের সংগ্রহ হিসাবে বইটি মূল্যবান হলেও ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতা রক্ষা সেখানেও সম্ভব হয়নি।

কাশিমবাজার রাজবংশের ইতিহাস লেখার পিছনে মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ইচ্ছা রাজকৃষ্ণের মধ্যে কাজ করেছে। রাজকৃষ্ণ তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বঙ্গভূষণ' উৎসর্গকালে লেখেন—

"আর্য্যধর্ম্মপরায়ণা, দানানিরতা, দেশহিতৈষিণী শ্রীযুক্তা শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া কর-কমলেষু—মহারাজ্ঞি, আমি আমার এই বহুল শ্রমসম্ভূত ক্ষুদ্র 'বঙ্গভূষণ' খানি আপনারই সর্ব্ববিদিত দাননিরত কর-পঙ্কজে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত অর্পণ করিলাম। ভগবতী ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে নির্গন্ধ বা সুগন্ধযুক্ত কুসুমদাম অর্পণ করিলে, তিনি যেমন আনন্দ সহকারে তরঙ্গ-কর বিস্তার করিয়া উহা গ্রহণ করেন। সেইরূপ 'বঙ্গভূষণ' মন্দই হউক বা ভালই হউক, আপনি সস্নেহে গ্রহণ করিলে আমি চিরজীবনের জন্য বাধিত হইব। আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।"

স্বর্ণময়ীর "অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী" রাজকৃষ্ণ কাশিমবাজারের মহারাণীকে নিয়ে আরও কয়েকটি কবিতা লেখেন (দ্র. অবসর-সরোজিনী)। শুধু মহারাণী নন, মহারাণীর সচিব রাজীবলোচন রায়ের কাছেও রাজকৃষ্ণ নানাভাবে উপকৃত হন। 'কাশীম-বাজার রাজবংশের বিবরণ' বইটি 'বিবিধগুণ মণ্ডিত সুবিজ্ঞ সচিববর রায় শ্রীরাজীবলোচন রায় বাহাদুরে'র করকমলে অর্পণ করা হয়েছে। রাজীবলোচনের উদ্দেশে রাজকৃষ্ণ লিখেছেন, "ভরসা আছে যে, আপনি যে রাজবংশের সুনিপুণ মন্ত্রী, এবং আপনার অত্যুৎকৃষ্ট মন্ত্রণায় যে রাজবংশের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে—সেই 'কাশীমবাজার রাজবংশের বিবরণ' অবশ্য আপনার নিকট কিয়ৎপরিমাণেও আদৃত হইতে পারিবে।" ফলে ইতিহাসের কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য বইটি মূল্যবান হলেও, বর্ণিত পাত্রপাত্রীদের প্রতি লেখকের সশ্রদ্ধ মনোভাব কোথাও গোপন করা হয়নি।

গ্রন্থের সূচনায় প্রদত্ত কাশিমবাজারের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ শতাধিক বৎসর পরে এখন বেশ মূল্যবান মনে হবে। রাজকৃষ্ণ মুর্শিদাবাদের অধিবাসী না হলেও এই অঞ্চল সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন, যেমন ভাগীরথীর থেকে একটি 'কাটী-খালকর্ত্তিত' হওয়ায় পূর্বপ্রবাহ পরিবর্তিত হয় এবং "এই কৃত্রিম প্রবাহ প্রস্তুত করাতে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের স্থানীয় স্বাস্থ্যের সাতিশয় ব্যাঘাত ঘটে। সেই ব্যাঘাত—প্রাণীনাশিনী বিষময়ী মহামারী!" কিংবা কাশিমবাজারে বৈষ্ণব-চৈতন্যমতাবলম্বীর সংখ্যা চিরকালই বেশি, এমনকি ১২৮২ সালে বই লেখার সময়েও। কান্তবাবুকে মহাপুরুষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা সত্ত্বেও রাজকৃষ্ণ জানান, কান্তবাবুর পিতা রাধাকৃষ্ণের 'গুবাকের দোকান' ছিল, এবং কান্তবাবুর 'মানসিক তেজস্বিতা তাদৃশ উৎকৃষ্ট ছিল না।' কিংবা কৃষ্ণনাথের অকালমৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—"আহা, একমাত্র ক্রোধরিপুই তাঁহার অকাল-মরণের মূল!" ফলে রাজবংশের মহিমাকীর্তনের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য সর্বত্র যে রক্ষিত হয়েছে তা নয়, কোথাও কোথাও তিনি যথোচিত ঐতিহাসিক সংযম ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

'রুশিয়ার ইতিহাস' (১৮৮৫) লেখার সময়ও ব্যবহারিক প্রয়োজন এবং যথার্থ ইতিহাস রচনার আগ্রহ একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "দুর্গাদাস ভায়া [ লাহিড়ী ] একদিন কহিলেন—'ভারতে রুষ আসিতেছে, এই সময় রুষের ইতিহাস লিখিলে বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইতে পারে।' তৎপর দিবসেই 'রুষের ইতিহাস' লিখিতে আরম্ভ করিলেন।"[৫] ভারতবর্ষে রুশ আক্রমণের গুজব উনিশ শতকে একাধিকবার প্রচারিত হয়েছে। আমাদের মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র বর্ণনা—"বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনো-এক সময়ে ইংরেজ গবর্মেণ্টের চিরন্তন জুজু রাসিয়ান-কর্তৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তখন পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ের কোন্-একটা ছিদ্রপথ দিয়া যে রুসীয়েরা সহসা ধূমকেতুর মতো প্রকাশ পাইবে, তাহা তো বলা যায় না। এইজন্য মার মনে অত্যন্ত উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তালাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন, 'রাসিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একখানা চিঠি লেখো তো।' মাতার উদ্বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি।"[৬] 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'তথ্যপঞ্জী' অংশে জানানো হয়েছে, "ইং ১৮৬৮ মে হইতে ১৮৭০ ডিসেম্বরের মধ্যে কোনো এক সময় পত্রটি লিখিত হয়।"[৭] কিন্তু শুধু এই সময় নয়, পরেও দীর্ঘদিন রুশ-আক্রমণ-ভীতি

বাঙালির মনে দেখা দিয়েছে, যার পিছনে ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্যমূলক প্রচার কাজ করেছিল। 'ভারত-রুশ কথা : বাঙালীর রুশচর্চা' গ্রন্থে বাংলা ভাষায় লেখা রুশ ইতিহাস বিষয়ক রচনার পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, "রুশ-রাজাদের ভারতাভিযানের বাসনা দীর্ঘকালের। ভারতাভিমুখে রুশবাহিনীর একাধিকবার অভিযান, পথিমধ্যে অবসান, তার কারণাবলীর ইতিহাস আছে। এশিয়ার রাজ্যগুলির একের পর এক, রুশসাম্রাজ্যভুক্তির অতিকায় আকৃতি নিয়ে, ত্রিশের দশকে জারের পারস্যাভিযান, নিশ্চিত ভারতাভিযানের শেষ মহড়া অনুমান করে, ভারতে ইংরেজ সমাজ, ইংরেজ পত্রপত্রিকা, হৈ চৈ বাধিয়ে দিল।"[৮] এই হৈ-চৈ বাধার ফলে একটাই লাভ হয়েছিল,—বাঙালির মনে জাগে রুশিয়া সম্বন্ধে জানার আগ্রহ। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' পত্রিকায় প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'রুষিয়া রাজ্যের ইতিহাস'[৯] প্রবন্ধটি হয়তো সাময়িক উত্তেজনার ফল নয়, কিন্তু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রুসিয়াধিপতির জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৫৯), দ্বারকানাথ ভট্টাচার্যের 'রুসিয়ার রাজ্ঞী ক্যাথারীনের উপাখ্যান' (১৮৮০), নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 'রুসীয় ভাষা ও সাহিত্য' (ভারতী, চৈত্র ১২৮৮), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র' প্রভৃতি রচনা সাধারণ পাঠকের কৌতূহল মেটাবার জন্যই লেখা। রাজকৃষ্ণও সাধারণ পাঠকের কথা ভেবেই 'রুশিয়ার ইতিহাস' লেখেন। কিন্তু তাঁর বইটি একাধিক কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দাবি করতে পারে, যদিও যে কোনো কারণেই হোক বইটি যথোচিত প্রচার বা প্রশংসা লাভ করেনি।

অথচ রাজকৃষ্ণ রায়ের 'রুশিয়ার ইতিহাস' শুধু বাংলা ভাষায় লেখা রুশ দেশ সম্বন্ধীয় প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নয়, সম্ভবত উনিশ শতকে বাংলায় লেখা একমাত্র গ্রন্থ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রবন্ধটি আকারে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, অন্যান্য যে অল্প কয়েকটি বই লেখা হয়েছে সেগুলি রুশদেশের বিশেষ কোনও প্রসঙ্গের বিবরণ মাত্র। রাজকৃষ্ণ একাধিক ইংরেজি গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রুশিয়ার ইতিহাস লেখেন। ফলে এক জায়গায় এত তথ্য আর কোথাও পাওয়া যাবে না। অবশ্য রাজকৃষ্ণের অন্যান্য রচনার মতো 'রুশিয়ার ইতিহাস'ও খুব দ্রুত লেখা, ফলে বিষয়-বিন্যাসে ধারাবাহিকতা নেই। একুশটি অধ্যায়ে রুশিয়ার ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জীবনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। রুশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া ও প্রধান শহরগুলির বিবরণ পাই প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে। আঠারো এবং উনিশ পরিচ্ছেদে রুশিয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পসামগ্রী ও জাতিপুঞ্জের যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা অনেক পরিমাণে ভৌগোলিক পরিচয় নির্দেশে সহায়ক। রুশিয়ার রাজবৃত্ত গ্রন্থে সবচেয়ে কম স্থান লাভ করেছে—দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পিটার দি গ্রেট এবং তাঁর উত্তরাধিকারিগণের সংক্ষিপ্ত

বিবরণ, আর একবিংশ পরিচ্ছেদে আরও সংক্ষেপে রাশিয়ার পূর্ব ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। ইংরেজ লেখকের গ্রন্থ থেকে নিশ্চয় বৃত্তান্তটি সংগ্রহ করা হয়েছে, কিন্তু সমসাময়িক ঘটনা একজন মধ্যবিত্ত বাঙালি লেখককে কি ভাবে উত্তেজিত করেছে তার নিদর্শন হিসাবে এই অংশটি উদ্ধারযোগ্য—

"পিটার দি গ্রেট হইতে রুশিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট পর্য্যন্ত সকলেরই ভারত অধিকার করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা দ্বিতীয় আলেকজান্দার মধ্য এসিয়ার মার্ভ প্রভৃতি অনেক স্থান যুদ্ধে অধিকার করিয়া, ক্রমশঃ ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি পিতৃপথাবলম্বী হইয়াছেন। আজ আমরা যে ইংরাজ-রুশ যুদ্ধের আয়োজন দেখিতেছি, ইহার সূত্রপাত পিটার দি গ্রেট করিয়া গিয়াছেন। গত ৩০ এ মার্চ (খ্রীঃ ১৮৮৫) রুশিয়ার অন্যতর সেনাপতি কমারফ, সহকারী সেনাপতি আলিখানফের সহিত পাঁজদে, এপ্রিল মাসে মামুচক প্রভৃতি আফগানরাজ্যভুক্ত কয়েকটি স্থান রুশিয়ার অধীন করিয়াছেন। পাঁজদের যুদ্ধের সময় রুশীয়দের হস্তে দশহাজার আফগান সৈন্য নিহত হয়। এই যুদ্ধের প্রধান গোলযোগ, রুশিয়া ও আফগানিস্তানের সীমা নির্দ্ধারণ লইয়া। ইংরেজ পক্ষ হইতে স্যার পিটার্স লম্‌সডেন মধ্যস্থ হইয়া বিবাদী ভূমির বিবাদ মিটাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যে কিছুই হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত ভয়ানক গোলযোগ চলিতেছে। ভবিষ্যতে যে কি হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। তবে সিংহ-ভল্লুকের যুদ্ধনীতির ব্যাপার দেখিয়া আমাদের মনে বিপদের আশঙ্কাটাই জাগিতেছে। আজ কয়েকমাস ধরিয়া, উভয় পক্ষে যেরূপ যুদ্ধের আয়োজন, সন্ধি-প্রস্তাব ও সন্ধিভঙ্গ হইয়া আসিতেছে, সে সকল বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিবার স্থান নাই। পাঠকগণ সমস্ত সংবাদপত্রেই সে বিষয়ের বিবরণ জানিতে পারিতেছেন বলিয়া আমরা উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহি। তবে, যে সকল বিষয় সংবাদপত্রে প্রায় পাওয়া যায় না, উহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।"

রাশিয়া সম্বন্ধে বাঙালির জানবার আকাজ্ক্ষা পূরণ করা হয়েছে বাকি অধ্যায়গুলিতে,—সেগুলি হলো যথাক্রমে রুশিয়ার আয়তন, লোকসংখ্যা, রুশীয় গভর্মেণ্ট, সৈন্য ও রণতরী, পুলিস-পোস্টাফিস ইত্যাদি, ধর্ম ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়, চলিত মুদ্রা ও রাজস্ব, ব্যবসায়, বাণিজ্য ও উৎপন্ন দ্রব্য, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি, সাধারণ শিক্ষা, রাজদণ্ড, রাজদত্ত গৌরবচিহ্ন ও উপাধি এবং উদ্ভিদ জন্তু। বলাবাহুল্য, রুশিয়ার ইতিহাস লেখার সময় রাজকৃষ্ণ কোনো গবেষণা-কর্মে আত্মনিয়োগ করেননি, কিন্তু মাঝে মাঝে পাদটীকায় সংযোজিত মন্তব্য থেকে তাঁর সজীব কৌতূহলী মনের পরিচয় মেলে—"হরিবংশের ২১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, কালযবন, শক, তুখার, দরদ, পারদ, খশ ও পহ্লব প্রভৃতি শত শত পার্ব্বতীয় ম্লেচ্ছগণের সহিত মথুরাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এ দিকে

দেখা যাইতেছে, শক=Scythians ; জাক্জাটিস ও অক্ষস্ নদীর মধ্যস্থলে তোখারিস্তানের লোক তুখার বা তুষার ; দর্দিস্তানের লোক দরদ ; পারদ= Parthians ; পহ্লব=পারস্যের পূর্ব্বে ইহাদের বাস, ইহাদের ভাষা Pehlvi বা পালী। এই সকল জাতির নিবাস মধ্য-এসিয়ায়। হিন্দুপুরাণে শকদ্বীপ বলিয়া যে একটি স্থানের কথা লিখিত আছে, উহাও মধ্য এসিয়ায় অবস্থিত। হিরো-ডোটাস, টাসিটস, প্লিনি, টলেমি প্রভৃতি প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঐ স্থানকে সিথিয়া বলিয়া গিয়াছেন। আরও তাঁহারা ঐ প্রদেশে শকি (Sacoe) নামে একটি জাতির কথা বলিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় বর্ত্তমান কসাকেরাই প্রাচীন শকিদের সন্তান। যাবনিক ভাষায় 'কো' শব্দের অর্থ পর্ব্বত। পর্ব্বতে বাস করিত বলিয়া কোশক বা কশাক্ নাম হইয়াছে।" এখানে রাজকৃষ্ণের বক্তব্যের সত্যাসত্য নিরূপণ অপ্রয়োজনীয়, শুধু ইতিহাস রচনার বিশেষ প্রবণতার পরিচয় হিসাবেই মন্তব্যটি বিচার্য।

জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার সুযোগ রাজকৃষ্ণ কতটা পেয়েছিলেন তা জানা যায় না। তবে তাঁর পড়াশোনার পরিধি যে বিস্তীর্ণ ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। তাই শরচ্চন্দ্র দেব যখন তাঁর কাছে কোষগ্রন্থ বা এনসাইক্লোপিডিয়া সংকলনের প্রস্তাব দিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাতে সম্মতি জানিয়েছেন।[১০] অবশ্য তাঁরা দুজনেই জানতেন, এই রকম ব্যক্তিগত প্রয়াসে 'ভারতকোষে'র মতো সুবৃহৎ উচ্চাভিলাষী গ্রন্থপ্রণয়নের "চেষ্টা আমাদিগের পক্ষে পঙ্গুর পর্ব্বতলঙ্ঘন চেষ্টার মত উপহসনীয়। তথাপি এ উদ্যম বঙ্গভাষায় প্রথম এবং হয়ত ভবিষ্যতে বঙ্গবাসিগণকে প্রত্নসিন্ধু মন্থন করিয়া অগণ্য অমূল্য রত্নে কোষ পূর্ণ করিতে শিক্ষা দিবে।"[১১]

ইউরোপে কোষগ্রন্থ সংকলনের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। সেখানে তিন ধরনের কোষ-গ্রন্থ সাধারণত দেখা যায়—"(a) those which are encyclopaedic in intent but not universally comprehensive ; (b) comprehensive encyclopaedias ; (c) special encyclypaedias."[১২]

এর মধ্যে কোন্ শ্রেণীর কোষগ্রন্থ রচনা করা হবে, তা সংকলয়িতার উদ্দেশ্য ও উপকরণের উপর নির্ভর করে। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তারপর দশখণ্ডের সেই বিশ্বকোষ আজ বিভিন্ন সংস্করণের মধ্য দিয়ে ক্রমশ বিস্তার ও উৎকর্ষ লাভ করেছে। বাংলায় আদি কোষগ্রন্থ বলতে অনেক সময় রাধাকান্ত দেব সংকলিত 'শব্দকল্পদ্রুমে'র (১৮২২-৫৮) উল্লেখ করা হয়, কিন্তু প্রথমত গ্রন্থটি সংস্কৃতে লেখা, দ্বিতীয়ত গ্রন্থটি মুখ্যত অভিধান। ফেলিক্স কেরী যখন 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮১৯-২১) প্রকাশ করতে শুরু করেন, তখন তা বাংলায় লেখা বলে মূল্যবান হলেও তা ছিল বিষয়ানুসারে

বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত, অর্থাৎ প্রথম খণ্ড 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা', দ্বিতীয় খণ্ড 'স্মৃতিশাস্ত্র'। অন্যদিকে দ্বিতীয় খণ্ডও তিনি সম্পূর্ণ প্রকাশ করে উঠতে পারেননি। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'ও ( ১৮৪৬-৫১ ) অনেকটা এই ধরনের বিবিধ বিদ্যার আকর গ্রন্থ, কিন্তু দ্বিভাষিক এই বইগুলি ইংরেজির অনুবাদ মাত্র। তাছাড়া বিষয়বস্তুও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

এই সব দিক থেকে "তিন ভাগে ১৬৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ( ১২৮৯-৯৯ বঙ্গাব্দ ) ভারতবর্ষ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ-পূর্ণ 'ভারতকোষ' বর্ণানুক্রমে সজ্জিত প্রসঙ্গ সংবলিত প্রথম বিশ্বকোষ। ১২৮৭ বঙ্গাব্দ হইতে ইহা খণ্ডশঃ প্রচারিত হইতেছিল; রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব ছিলেন ইহার সংকলক।"[১৩] প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রটি ছিল এই রকম—

> "ভারতকোষ / অর্থাৎ / বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবতত্ত্ব; ভারতবর্ষীয় প্রাচীন / সাহিত্য, সঙ্গীতশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র, / শিল্পশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, আর্য্যগণের / কর্ম্মকাণ্ড, প্রাচীন ভূগোল, ঐতিহাসিক / ব্যক্তিবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রভৃতি / বিষয়ক অভিধান।"

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সংগ্রাহক হিসাবে রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেবের নাম দেখি। তৃতীয় খণ্ড আকারে ক্ষুদ্র এবং রচনাগুলিও সংক্ষিপ্ত ( অর্থাভাব তার কারণ হতে পারে ), আখ্যাপত্রে সংগ্রাহক হিসাবে চারজনের নাম মুদ্রিত হয়েছে— রাজকৃষ্ণ রায়, হরিশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর কবিরাজ এবং শরচ্চন্দ্র দেব। তবে অনেকের সাহায্য গ্রহণ করলেও 'ভারতকোষ' যে মুখ্যত রাজকৃষ্ণ রায়ের উদ্যম ও রচনার নিদর্শন তা সে কালের গ্রন্থ সমালোচনা থেকে জানতে পারি—"This is the first dictionary of its kind in Bengali, compiled with the view of furnishing information regarding Vaidik, Pauranik and Tantrik theology, the literature, music, arts, sciences, philosophy, Dharma, Sastras, geography, the mythical and historical personages, &c., of ancient India. The importance of a work of this kind cannot be over-estimated. ...The value of this dictionary, it may be also suggested, would be greatly enhanced by making the references a little more minute and explicit. Babu Raj Krisha Raya has commenced a good work, which, we hope, he will be enabled by persevering industry on his own part, and by literal patronage on the part of the public to bring to a successful completion."[১৪]

'ভারতকোষ' থেকে আমরা কিছু দৃষ্টান্ত গ্রহণ করলেই উপরের মন্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবো—

অকৃতব্রণ—কশ্যপবংশীয় মুনি, পরশুরামের বন্ধু, রোমহর্ষণের শিষ্য, বিষ্ণুপুরাণ হইতে একখানি উপসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু, মহা)

অজয়—নদবিশেষ; 'এই নদ ভাগলপুর জেলার দক্ষিণাংশে উৎপন্ন হইয়া প্রথমতঃ সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণাংশ দিয়া দক্ষিণ দিকে, তৎপরে বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া কাটোয়ার নিকটে ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে।' (বঙ্গদেশের বিবরণ)

অয়ন—সূর্য্যের পথ। উহা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ ভেদে দুইটি। দক্ষিণায়ণ দেবতাদিগের রাত্রি ও উত্তরায়ণ দেবতাগণের দিবা। (জ্যোতিষ)

অর্শ—মলদ্বারে মাংসাঙ্কুরবৎ রোগবিশেষ; প্রবাহিণী, বিসর্জ্জনী ও সম্বরণী নামধেয় শংখাবর্ত্তবৎ বলীত্রয়ে বাতিক, পৈত্তিক, শৈষ্পিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ ও সহজ এই ছয় প্রকার অর্শ হয়। এই রোগ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। (নিদান)

জয়জয়ন্তী—কানাড়া, শ্রী ও গৌরী অথবা গৌরী ও বেহাগড়া কিম্বা ধবলশ্রী, সুরট ও বেলাবেলী যোগে উৎপন্ন রাগিণী বিশেষ। ইহার ঋষভ বাদী। স্বরগ্রাম যথা—

Δ ঋ গ ম প ধ Δ নি সা। (স-রত্না)

নাস্তিক—যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ইহারা ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত; মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, চার্ব্বাক ও দিগম্বর।

বাসবদত্তা—১। উদয়নের পত্নী। (রত্না) ২। সুবন্ধুকৃত কাব্যবিশেষ।

সব ধরনের বিষয় গ্রহণ করা হলেও রাজকৃষ্ণের 'ভারতকোষে' পৌরাণিক তথা প্রাচীন ভারতীয় প্রসঙ্গ সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। তাই অনেকে 'ভারতকোষ'কে পৌরাণিক অভিধান হিসাবেই গ্রহণ করেছেন,[১৫] যদিও সবগুলি বিষয়ের তালিকা গ্রহণ করলে দেখা যাবে অপৌরাণিক প্রসঙ্গও অপ্রতুল নয়। রাজকৃষ্ণের 'ভারতকোষে'র ব্যাবহারিক মূল্য তো ছিলই, কিন্তু পরবর্তীকালে তার ঐতিহাসিক মূল্য অধিকতর স্বীকৃতি লাভ করেছে। নগেন্দ্রনাথ বসু 'বিশ্বকোষ', অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'বঙ্গীয় মহাকোষ', এমনকি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 'ভারতকোষ' প্রকাশকালে রাজকৃষ্ণকে পথিকৃতের সম্মান দান করেছেন।

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬, পৃ. ৩৩০।
২. ভারতকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬৬, পৃ. ২৫১।
৩. দ্র. Lokenath Ghose, *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, &c.* Part II, 1881, p. 334 45.
৪. শরচ্চন্দ্র দেব জানিয়েছেন, "স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী এই স্বজাতীয় কিশোর-বয়স্ক কবিটিকে বড়ই স্নেহচক্ষে দেখিতেন, তাঁহার দেওয়ান রায় রাজীব-লোচন রায় বাহাদুরও তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের আনুকূল্যেই রাজকৃষ্ণ বাবুর এইরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে [কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ] প্রবৃত্তি হইয়াছিল।"—'রাজকৃষ্ণ জীবনী', রামায়ণ, ১৯১৫, পৃ. ।.।
৫. যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়', প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃ. ৩৭।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা, ১৩৬৮, পৃ. ৩৯।
৭. তদেব, পৃ. ২৪৩।
৮. কেশব চক্রবর্তী, ভারত-রুশ কথা : বাঙালীর রুশচর্চা, ১৯৭৬, পৃ. ৬৩।
৯. বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ, শ্রাবণ ১৭৭৫ শকাব্দ।
১০. হরিমোহন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "শ্রদ্ধাস্পদ যোগেশবাবুর [বন্দ্যোপাধ্যায়] মধ্যস্থতায় ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের সহিত ইঁহার প্রথম আলাপ হয়, সেই আলাপ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উত্তরকালে সুদৃঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এনট্রান্স পরীক্ষার পর হইতেই ইনি পৌরাণিক অভিধান সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন; তাহাই পরে ৺রাজকৃষ্ণবাবুর যত্নে ও সহায়তায় 'ভারতকোষ' নামে ইহা প্রকাশিত হয়। ১২৮৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়; ১২৯৯ সালের বৈশাখ মাসে সম্পূর্ণ হয়। ৺রাজকৃষ্ণ বাবুর আর্থিক অসচ্ছলতা নিবন্ধন ইহার শেষাংশ অতি সংক্ষিপ্ত ভাবেই মুদ্রিত হইয়াছিল।"—'শরচ্চন্দ্র দেব', বঙ্গ-ভাষার লেখক, ১৩১১, পৃ. ৮৮৫।
১১. রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব সংগৃহীত ভারতকোষ, 'ভূমিকা' : প্রথম খণ্ড, ১৮৮০, পৃ. ৭।
১২. J. A. Cuddon, *A Dictionary of Literary Terms*, 1985, p. 219.
১৩. ভারতকোষ, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭১, মুখবন্ধ পৃ. ৯।
১৪. *Calcutta Review*, Vol. 74, No. 9, 1882.

১৫. দ্র. "Barring the unsuccessful attempt made by the late Rev. Mr. O'Brien Smith, which resulted in issue of one or two numbers of a cyclopedia, known as the *Pauranic Itibritta*, the *Bharata Kosha* is, so far as we can recollect at the present moment, the first attempt in Bengali, at compiling a Classical Dictionary, embracing all the varieties of Mythological, Historical, Biographical, Philosophical, Scientific and General Literature of the Hindus. The short compass of twelve parts similar the one before us, in which the compilers hope to finish the work, will, we fear, not allow them much scope for putting in anything like exhaustive accounts of the subjects treated. The venture, however, as it stands, is a great national importance and eminently deserves all encouragement from the literary public. The compilers have herein shown considerable command over our classical litereture. Besides, they have the additional advantage of possessing a knowledge of western literature of which they have not let slip the opportunity of making the best use."—*The Indian Mirror*, September 21, 1880.

# পরিশিষ্ট

## ।। রাজকৃষ্ণ রায়ের সাহিত্য-সমালোচনার নিদর্শন ।।

**সারদামঙ্গল—বিহারীলাল চক্রবর্তী ॥**

"...কিন্তু কি শুভক্ষণেই সারদামঙ্গল আমাদের হস্তে উপহার প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা এই কাব্যখানি যতক্ষণ পাঠ করিয়াছি, ততক্ষণ যেন সমস্ত সুখের একত্র সমাবেশরাজ্য স্বর্গে অবস্থান করিয়াছিলাম। সারদামঙ্গলের বিশুদ্ধ ও প্রকৃত ছন্দোবিন্যাস, অপূর্ব্ব ও অসাধারণ হৃদয়োচ্ছ্বাস-প্রসূত ভাব, সুধাবিনিন্দিত রসতরঙ্গ, মধুর, কোমল, সরল অথচ তীব্রমদিরাতরল ভাষা এবং অপূর্ব্ব অমূল্য অলঙ্কার ইহার আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। সারদামঙ্গলের প্রতি পংক্তিই প্রায় মনকে মাতাইয়া তুলে, ভুলাইয়া দেয় এবং কল্পনাতীত এক চিরানন্দময় মহারাজ্যে লইয়া যায়। দীনহীন বাঙ্গালা ভাষায় যে এরূপ অভিনব ভাবময় কাব্য রচিত হইতে পারে, আমরা সেরূপ আশা করি নাই। আজ কবিবর বিহারীলাল আমাদের সে আশার ফল দেখাইয়া দিলেন। বিহারীবাবুর সারদামঙ্গল আমাদের পক্ষে বর্ত্তমান বাঙ্গালা কাব্যের প্রধান সম্বল। তাঁহার বঙ্গসুন্দরী আমাদের চিত্তকে মোহিত করিয়াছে, কিন্তু সারদামঙ্গল তদপেক্ষাও যে কি করিল, তাহা বুঝান সাধ্যাতীত। কবি ১৮ পৃষ্ঠার ৩১ শ্লোকে বীণাপাণি সারদাকে বলিয়াছেন—

যত মনে অভিলাষ, তত তুমি ভালবাস,
তত মন প্রাণ ভোরে আমি ভালবাসি;
ভক্তি ভাবে এক তানে মজেছি তোমার ধ্যানে;
কমলার ধনমানে নহি অভিলাষী।
থাক হৃদে জেগে থাক, রূপে মন ভোরে রাখ,
তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে ॥

কিন্তু আমাদের বিবেচনায় দেবী সারদা কবিকে কবির অভিলাষাতীত ভালবাসিয়া থাকেন, তা নহিলে এই স্বর্গীয় অপূর্ব্ব সুধাপ্রস্রবণ সারদামঙ্গলের উৎপত্তি হইত না। বিহারীবাবুর বঙ্গসুন্দরী বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে একপ্রকার লুক্কায়িত থাকিলেও এই এক সারদামঙ্গল তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তির সম্বল করিয়া দিল। তিনি এই মাহেন্দ্রক্ষণ-প্রসূত সারদামঙ্গলের গুণে বর্ত্তমান বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। আমরা নিঃসংশয় চিত্তে বলিতেছি, কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তীই বঙ্গদেশের জীবিত কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। অদ্য এই পর্য্যন্ত;—আমরা বীণার আগামী সংখ্যায় সারদামঙ্গলের সবিস্তার সমালোচনা করিবার ইচ্ছায় রহিলাম।" (বীণা, কার্ত্তিক ১২৮৬)।

## গ্রন্থপঞ্জী

।। রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত গ্রন্হ ।।

### ক। নাটক ।।

১। পতিব্রতা। কলিকাতা, ১লা অগ্রহায়ণ ১২৮২। ৬-৫০ পৃষ্ঠা।
২। নাট্যসম্ভব। কলিকাতা, ভাদ্র ১২৮৩। ১৪ পৃষ্ঠা।
৩। অনলে বিজলী। কলিকাতা, ১লা বৈশাখ ১২৮৫। ১৫৫, ৫ পৃষ্ঠা।
৪। দ্বাদশ গোপাল। কলিকাতা, ১২৮৫। ২০ পৃষ্ঠা।
৫। লৌহকারাগার। কলিকাতা, ১২৮৬। ১১৬ পৃষ্ঠা।
৬। তারক-সংহার। কলিকাতা, ২৬শে আষাঢ় ১২৮৭। ১৮৭ পৃষ্ঠা।
৭। হরধনুর্ভঙ্গ। কলিকাতা, ১২৮৮। ১২০ পৃষ্ঠা।
৮। রামের বনবাস। কলিকাতা, ১২৮৯। ১২৫ পৃষ্ঠা।
৯। যদুবংশধ্বংস। কলিকাতা, ১২৯০। ১২৪ পৃষ্ঠা।
১০। তরণীসেনবধ। কলিকাতা, ১২৯১। ১০৪ পৃষ্ঠা।
১১। রাজা বিক্রমাদিত্য। কলিকাতা, ১২৯১। ১২, ১৪৪ পৃষ্ঠা।
১২। চন্দ্রহাস। কলিকাতা, ১২৯৫। ১১৫ পৃষ্ঠা।
১৩। হরিদাস ঠাকুর। কলিকাতা, শ্রাবণ ১২৯৫। ৯০ পৃষ্ঠা।
১৪। কলির প্রহ্লাদ। কলিকাতা, ১২৯৫। ৭০ পৃষ্ঠা।
১৫। কাণাকড়ি। কলিকাতা, ১২৯৫। ২২ পৃষ্ঠা।
১৬। মীরাবাই। কলিকাতা, ১২৯৬। ৮১ পৃষ্ঠা।
১৭। চমৎকার। কলিকাতা, ১৮৮৯। [?]
১৮। খোকাবাবু। কলিকাতা, ১২৯৬। ১২ পৃষ্ঠা।
১৯। বেলুনে বাঙালী বিবি। কলিকাতা, ১২৯৬। ১৩ পৃষ্ঠা।
২০। ডাক্তারবাবু। কলিকাতা, ১২৯৬। ১৪ পৃষ্ঠা।
২১। সত্যমঙ্গল বা সত্যনারায়ণ-লীলা। কলিকাতা, ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭। ৯৮ পৃষ্ঠা।
২২। চতুরালী। কলিকাতা, [ ১১ জুলাই ১৮৯০ ]। ১২ পৃষ্ঠা।
২৩। চন্দ্রাবলী। কলিকাতা, ১২৯৭। ২৬ পৃষ্ঠা।
২৪। টাটকা-টোটকা। কলিকাতা, ১২৯৭। ২০ পৃষ্ঠা।
২৫। জগা পাগলা বা জ্যান্তে মরা। কলিকাতা, ১২৯৭। ৩২ পৃষ্ঠা।
২৬। লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র। কলিকাতা, [ ৪ অক্টোবর ১৮৯০ ]। ৬৪ পৃষ্ঠা।

২৭। জুজু। কলিকাতা, ১২৯৭। ২৪ পৃষ্ঠা।
২৮। রাজা বংশধ্বজ। কলিকাতা, ১লা মাঘ ১২৯৭। ২৯ পৃষ্ঠা।
২৯। হীরে মালিনী। কলিকাতা, ১২৯৭। ২৯ পৃষ্ঠা।
৩০। লক্ষহীরা। কলিকাতা, ১৯শে পৌষ ১২৯৭। ৯০ পৃষ্ঠা।
৩১। প্রহ্লাদ মহিমা, বা প্রহ্লাদ চরিত্র—২য় খণ্ড। কলিকাতা, ৫ই কার্ত্তিক ১২৯৭। ৫১ পৃষ্ঠা।
৩২। নরমেধযজ্ঞ। কলিকাতা, ১২৯৮। ১১১+৫ পৃষ্ঠা।
৩৩। লয়লা-মজ্নু। কলিকাতা, ১২৯৮। ৬৮ পৃষ্ঠা।
৩৪। বনবীর। কলিকাতা, ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৯৯। ১২৪ পৃষ্ঠা।
৩৫। ঋষ্যশৃঙ্গ। কলিকাতা, ১২৯৯। ৫৪ পৃষ্ঠা।
৩৬। বেনজীর-বদরেমুনীর। কলিকাতা, ১৩০০। ১১৬ পৃষ্ঠা।

## খ। কাব্য ॥

১। মহন্ত বিলাপ!!! কলিকাতা, ১২৮০। ১২ পৃষ্ঠা।
[কাব্যটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। 'বঙ্গভূষণ' কাব্যগ্রন্থের শেষে এই 'বিজ্ঞাপন'টি মুদ্রিত হয়েছে—"মদ্বিরচিত 'মহন্ত-বিলাপ !!!' নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে এবং পাথুরিয়াঘাটা-ব্রজদুলালের স্ট্রীট—১৬ নং ভবনে প্রাপ্য। নগদ মূল্য দুই পয়সা। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়। কলিকাতা, ২৫এ পৌষ, ১২৮০।]।
২। বঙ্গভূষণ। কলিকাতা, সম্বৎ ১৯৩০ ['বিজ্ঞাপন' ও 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' অংশে প্রদত্ত তারিখ ১লা পৌষ, ১২৮০]। ৮+৮২ পৃষ্ঠা।
৩। কবিতাকৌমুদী। প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১২৮১। ৪৮ পৃষ্ঠা।
কবিতাকৌমুদী। দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা, ১২৮১। ৭২ পৃষ্ঠা।
[শিশুপাঠ্য এই দুটি কবিতাসংকলন 'সেণ্ট্রাল টেক্সট-বুক কমিটির অনুমোদিত ও ডিরেক্টর মহোদয় কর্তৃক স্কুলপাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট' ছিল। দ্র. 'বেনজীর-বদরেমুনীর' নাটকের পিছনে মুদ্রিত 'বিজ্ঞাপন']।
৪। ভারতে যুবরাজ। কলিকাতা, শকাব্দা ১৭৯৭ ['ভূমিকা'র তারিখ ১লা পৌষ, ১২৮২] ৪২ পৃষ্ঠা।
৫। অবসর-সরোজিনী। প্রথম ভাগ, কলিকাতা, বৈশাখ ১২৮৩। ২৩৪ পৃষ্ঠা।
অবসর-সরোজিনী। দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা, আষাঢ় ১২৮৬। ২৭১ পৃষ্ঠা।
অবসর-সরোজিনী। তৃতীয় ভাগ। দ্র. বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী প্রকাশিত 'গ্রন্থাবলী' দ্বিতীয় ভাগ (১৮৮৫)
অবসর-সরোজিনী। চতুর্থ ভাগ। দ্র. বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী প্রকাশিত

'গ্রন্থাবলী' চতুর্থ ভাগ ( ১৮৮৯ )।

৬। স্তবমালা। কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩। ২৪ পৃষ্ঠা।

৭। ভারত-ভাগ্য। কলিকাতা, [ ২৪ জানুয়ারি ১৮৭৭ ]। ১২ পৃষ্ঠা।

৮। নিশীথ-চিন্তা। কলিকাতা, ১লা আশ্বিন ১২৮৪। ৩৮ পৃষ্ঠা।

৯। নিভৃত নিবাস। ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১২৮৫। ১২১ পৃষ্ঠা।
[ দ্র. "নিভৃত নিবাসের এই সর্গটি [ প্রথম সর্গটি ] নিশীথ চিন্তা নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবার একত্রে প্রকাশ করা গেল।"—ভূমিকা ]।

১০। ভারত-গান। কলিকাতা, ১২৮৫। ৫৪ পৃষ্ঠা।

১১। দেবসঙ্গীত। কলিকাতা, ১২৮৬।

১২। ভারত-সান্ত্বনা। কলিকাতা, ১২৮৬। ৩০ পৃষ্ঠা।
[ 'অবসর-সরোজিনী' দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গে একত্রে মুদ্রিত ]।

১৩। শিশুকবিতা। কলিকাতা, ১লা আশ্বিন ১২৮৮। ৩৪ পৃষ্ঠা ( সচিত্র )।

১৪। শ্মশান ও জীবন। কলিকাতা, ১২৯০। ১৬ পৃষ্ঠা।

১৫। কেশব-বিয়োগ। কলিকাতা, ১২৯০ [ 'বিজ্ঞাপনে' প্রদত্ত তারিখ ১০ই মাঘ, ১২৯০ ]। ৮+২৪+১০ পৃষ্ঠা।

১৬। কবিতা। কলিকাতা, আশ্বিন ১২৯৪। ৫৪৮ পৃষ্ঠা।
[ অক্ষয়কুমার বড়াল সম্পাদিত রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতা-সংকলন )।

১৭। গান। কলিকাতা, ৩রা শ্রাবণ ১২৯৫। ২৫৪ পৃষ্ঠা।
( শরচ্চন্দ্র দেব সম্পাদিত রাজকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গীত-সংগ্রহ )।

১৮। পূজার বাজার। কলিকাতা, ১২৯৫। ৮ পৃষ্ঠা।

১৯। কতিপয় কবিতা। [ বা ] Specimens of Bengali Poetry. কলিকাতা, ১৮৯০। ৪২ পৃষ্ঠা। ( রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতার 'ইংরাজি অনুবাদ ও টীকা সহিত' )।

২০। সরল কবিতা। কলিকাতা, ১২৯৮। ৩০ পৃষ্ঠা।

## গ। খোসগল্প ॥

১। ঘোড়ার ডিম। কলিকাতা, ১২৮৭। ১২ পৃষ্ঠা।

২। কুঁপোকাৎ। কলিকাতা, ১২৮৭। ১২ পৃষ্ঠা।

৩। পাঁচ ঝাঁটা। কলিকাতা, [ ১৮৮২ ]। ১২ পৃষ্ঠা।

৪। ষোল বছুরে পেত্নী। কলিকাতা, ১২৯০। ২৪ পৃষ্ঠা।

৫। আদুরে ছেলে। কলিকাতা, ২রা ফাল্গুন ১২৯১। ২৪ পৃষ্ঠা

৬। রসগোল্লা। কলিকাতা, ৩০শে ফাল্গুন ১২৯১। ১২ পৃষ্ঠা।
৭। গেঁজেল গদা। কলিকাতা, ৯ই চৈত্র ১২৯১। ১২ পৃষ্ঠা।
৮। এ মেয়ে পুরুষের বাবা। কলিকাতা, ১২ই বৈশাখ ১২৯২। ১২ পৃষ্ঠা।
৯। টাকার তোড়া। কলিকাতা, ২০শে বৈশাখ ১২৯২। ২০ পৃষ্ঠা।
১০। নূতন বৌ। বীণা, কার্ত্তিক ১২৯৩, পৃ. ১৩-২৯।
১১। বোকা শিবে। বীণা, অগ্রহায়ণ ১২৯৩, পৃ. ৫৪-৬৪ ; মাঘ ১২৯৩, পৃ. ১১২-৩৯।

[ 'খোসগল্প' গ্রন্থমালায় নয়টি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। শেষ দুটি খোসগল্প স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়নি। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী প্রকাশিত 'গ্রন্থাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে এগারোটি খোসগল্প একত্রে মুদ্রিত হয়। ]

## ঘ। উপন্যাস ॥

১। হিরণ্ময়ী। প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১২৮৬। ১৯২ পৃষ্ঠা।
হিরণ্ময়ী। দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১২৮৭। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যার অনুসরণে ১৯৩-৩৪০ পৃষ্ঠা।
২। কিরণময়ী। কলিকাতা, ১২০৭।
৩। দুই শিকারী। আর এক রকম খোসগল্প। নং ১। কলিকাতা, ১২৮৯। ৮৬ পৃষ্ঠা।
৪। অদ্ভুত ডাকাত। কলিকাতা, ৩রা পৌষ ১২৯৫। ১৮৮ পৃষ্ঠা।
৫। জ্যোতির্ম্ময়ী। কলিকাতা, ১৫ই চৈত্র ১২৯৫। ১৯৪ পৃষ্ঠা।
৬। প্রতিফল। কলিকাতা, কার্ত্তিক ১৩০০। ৪৮ পৃষ্ঠা।

## ঙ। অনুবাদ ॥

১। রামায়ণ, সাতকাণ্ড। কলিকাতা, ১২৮৪-১২৯২ [ ১৮৭৭-১৮৮৫ ]।
অখণ্ড ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণ, শরচ্চন্দ্র দেব সম্পাদিত, এলাহাবাদ, ২০শে জানুয়ারি ১৯১৫। ৯৩১ পৃষ্ঠা।
২। মহাভারত। প্রথম খণ্ড, আদি ও সভাপর্ব। কলিকাতা, ফাল্গুন ১২৯৩। ৩৫৬ পৃষ্ঠা।
মহাভারত। দ্বিতীয় খণ্ড, বনপর্ব ও বিরাটপর্ব। [ প্রকাশের তারিখ নেই ]। ৩০৪ পৃষ্ঠা।
*মহাভারত। তৃতীয় খণ্ড, উদ্যোগপর্ব অবধি স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত [ প্রকাশের তারিখ নেই ]। ১৬০ পৃষ্ঠা।*

অখণ্ড গার্হস্থ্য সংস্করণ, ১২৯৮।

৩। কল্কিপুরাণ। কলিকাতা, ১০ই ভাদ্র ১২৯৯। ১৪৩ পৃষ্ঠা।

## চ। বিবিধ॥

১। কাশীমবাজার রাজবংশের বিবরণ। কলিকাতা, ১লা আশ্বিন ১২৮৮। ৬২ পৃষ্ঠা।

২। হিন্দী-বাঙ্গালা বর্ণপরিচয়। কলিকাতা, ১৮৭৫ [?]।

৩। ভারতকোষ। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় এবং শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্তৃক সংগৃহীত।
[১২৮৭ সাল থেকে খণ্ডাকারে প্রথমে 'ভারতকোষ' প্রকাশিত হতে থাকে। পরে তিনটি ভাগে 'ভারতকোষ' সম্পূর্ণ হয়]।
প্রথম ভাগ, ১২৮৯, পৃষ্ঠা ১-৫৩৮।
দ্বিতীয় ভাগ, ১২৯২, পৃষ্ঠা ৫৩৯-১১১০।
তৃতীয় ভাগ, ১২৯৯, পৃষ্ঠা ১১১১-১৬৫০।

৪। রুশিয়ার ইতিহাস। কলিকাতা, ২৫শে আষাঢ় ১২৯২। ১০২ পৃষ্ঠা।

### ॥ রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী ॥

রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী বিভিন্ন প্রকাশনসংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীর নাম দিয়ে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সাতটি খণ্ডে 'গ্রন্থাবলী' (১৮৮৪-১৮৯৪) প্রকাশ করেন। শরচ্চন্দ্র দেব সম্ভবত রাজকৃষ্ণের নিজের উদ্যোগে বীণা যন্ত্র থেকে কয়েক খণ্ডে গ্রন্থাবলী প্রচারের চেষ্টা করেন। তবে বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী ও বীণা যন্ত্র প্রচারিত গ্রন্থাবলী পরে আর মুদ্রিত না হওয়ায়, সেগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিংশ শতাব্দীর সূচনায় নয় খণ্ডে 'রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন, এবং একাধিক সংস্করণ বা মুদ্রণের মধ্য দিয়ে বসুমতী গ্রন্থাবলীই রাজকৃষ্ণকে দীর্ঘদিন পাঠকের কাছে সহজপ্রাপ্য করে রাখে। তবে গ্রন্থাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, রাজকৃষ্ণের এমন গ্রন্থ যেমন আছে, তেমনি গ্রন্থাবলীতে অন্তর্ভুক্ত কিছু রচনা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। কয়েকটি গ্রন্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাবলীতে আছে, বসুমতীর গ্রন্থাবলীতে নেই। আমরা সাধারণ ভাবে বসুমতী প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর 'পাঠ' গ্রহণ করেছি, তবে প্রয়োজনে মূল গ্রন্থ ও বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সঙ্গেও 'পাঠ' মিলিয়ে নিয়েছি। এখানে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত 'রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী'র সূচী দেওয়া হলো।

প্রথম ভাগ। ১। নরমেধযজ্ঞ ২। বনবীর ৩। ঋষ্যশৃঙ্গ ৪। চতুরালী ৫। চন্দ্রাবলী ৬। প্রহ্লাদ-চরিত্র ৭। খোকাবাবু ৮। হীরে মালিনী ৯। বেনজীর বদ্‌রেমুনীর ১০। লয়লা-মজনু।

দ্বিতীয় ভাগ। ১। মীরাবাই ২। পতিব্রতা ৩। দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ ৪। ষড়্‌ঋতু ৫। খোসগল্প—ঘোড়ার ডিম, কুঁপোকাৎ, পাঁচ ঝাঁটা, ঘোল্‌ বছুরে পেত্নী, আদুরে ছেলে, রসগোল্লা, গেঁজেল গদা, এ মেয়ে পুরুষের বাবা, টাকার তোড়া, নূতন বৌ, বোকা শিবে ৬। অদ্ভুত ডাকাত।

তৃতীয় ভাগ। ১। চীনের কলসী ২। দুই সন্ন্যাসী ৩। সঙ্গীত-স্বপ্ন ৪। অদ্ভুত গল্প ৫। দুটি মনচোরা ৬। পূজার বাজার ৭। ভারত গান ৮। লক্ষহীরা ৯। হেঁয়ালী অভিনয় ১০। ডাক্তারবাবু ১১। সিন্ধুবধ বা দশরথের মৃগয়া।

চতুর্থ ভাগ। ১। হিরণ্ময়ী ২। লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র ৩। হরিহর-লীলা ৪। টাট্‌কা টোটকা ৫। বেলুনে বাঙালী বিবি ৬। জুজু ৭। সাময়িক কবিতা ৮। বঙ্গভূষণ ৯। অবসর-সরোজিনী [ চতুর্থ ভাগ ] ১০। হেঁয়ালী অভিনয় ১১। ব্রজবিহার।

পঞ্চম ভাগ। ১। দুর্বাসার পারণ ২। ভীষ্মের শরশয্যা ৩। তরণীসেন বধ ৪। তারক-সংহার ৫। বামন-ভিক্ষা ৬। উৎকট বিরহ-বিকট মিলন বা আগমনী বিজয়া ৭। দ্বাদশ গোপাল ৮। জন্মাষ্টমী ৯। নাট্যসম্ভব।

ষষ্ঠ ভাগ। ১। কিরণময়ী ২। যদুবংশ-ধ্বংস ৩। রাজা বিক্রমাদিত্য ৪। চন্দ্রহাস ৫। গঙ্গা-মহিমা।

সপ্তম ভাগ। ১। জ্যোতির্ময়ী ২। চমৎকার ৩। কাণাকড়ি ৪। অবসর-সরোজিনী [ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ] ৫। পাঞ্জাবী কাহিনী ৬। আগমনী ৭। অশ্বায়নের কবিতাবলী।

অষ্টম ভাগ। ১। অনলে বিজলী ২। রামের বনবাস ৩। হরধনুর্ভঙ্গ ৪। প্রমদ্বরা ৫। লক্ষপতি ৬। রাজা বংশধ্বজ ৭। গিরি-গোবর্ধন ৮। লৌহ-কারাগার ৯। হরিদাস ঠাকুর ১০। কলির প্রহ্লাদ ১১। জগা পাগলা।

নবম ভাগ। ১। ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনী ২। দৃষ্টান্তকলিকাশতক ৩। রুক্সিয়া ৪। প্রতিফল ৫। প্রশ্নোত্তর-সুধালহরী ৬। শ্মশান ৭। জীবন ৮। জীবনের মিলন ৯। ভারত-সান্ত্বনা ১০। অনন্ত কি? ১১। অবসর-সরোজিনী [ তৃতীয় ভাগ ] ১২। দুই শিকারী।

॥ রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত সাময়িক পত্র ॥

১। সমাজ-দর্পণ। যশোদানন্দন সরকার প্রচারিত সাপ্তাহিক 'সমাজ-দর্পণ' (প্রথম প্রকাশ ২৯ কার্ত্তিক ১২৭৯) পত্রিকায় রাজকৃষ্ণের কিছু রচনা প্রকাশিত হয়। যশোদানন্দন পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলে রাজকৃষ্ণ 'সমাজ-দর্পণে'র

পরিচালনা ও সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। রাজকৃষ্ণের সম্পাদনায় পত্রিকাটি ঠিক কতদিন প্রকাশিত হয় জানা যায় না।

২। বীণা : বিবিধকবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা। রাজকৃষ্ণ রায়ের সম্পাদনায় 'বীণা' মাসিক পত্র ১২৮৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭৮) প্রকাশিত হয়। প্রথম দুই বৎসর (১২৮৫-৮৬) আলবার্ট প্রেস থেকে এবং শেষ দুই বৎসর (১২৩৮ ও ১২৯৩-৯৪) বীণা যন্ত্র থেকে মুদ্রিত হয়। প্রথম বৎসরের 'বীণা' ছিল মুখ্যত কবিতা পত্রিকা, দ্বিতীয় বৎসর থেকে বীণা—'নানাবিষয়িণী, কবিতা প্রসবিনী ও সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।' তৃতীয় বৎসর থেকে পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। ১২৯৪ সালের ১৫ কার্তিক 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় জানানো হয়—"বীণা বন্ধ করিতে হইল। সুতরাং বীণার পঞ্চম বর্ষের জন্য যে কয়জন গ্রাহক অগ্রিম মূল্য জমা দিয়াছিলেন, এখন তিনি [ রাজকৃষ্ণ ] টাকা ফেরত বা তাঁহাদের অভিলষিত পুস্তকাদি দিয়া তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিতেছেন।

৩। গল্পকল্পতরু। 'বীণা' পত্রিকা প্রকাশকালে ১২৮৬ সাল থেকে রাজকৃষ্ণ 'গল্পকল্পতরু' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'গল্পকল্পতরু' মুখ্যত উপন্যাসের পত্রিকা ছিল। পত্রিকাটি দুইটি পর্যায়ে প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্যায়ে রাজকৃষ্ণের 'হিরণ্ময়ী' এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে 'জ্যোতির্ম্ময়ী' প্রকাশিত হয়। 'গল্পকল্পতরু' ঠিক কতদিন প্রচারিত হয়েছিল, তা জানা যায় না। রাজকৃষ্ণ ছাড়া অন্য যে সব লেখকের রচনা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে শরচ্চন্দ্র দেবের 'শান্তিকুটীর' (১২৯৫) অন্যতম। 'গল্পকল্পতরু'র আখ্যাপত্রে দেখি—'শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত দ্বিতীয় শাখা-প্রথম কুসুম শান্তিকুটীর।'

## সহায়ক গ্রন্থ

### রাজকৃষ্ণ রায় সম্পর্কিত রচনা


অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, ১৯৭০, পৃ. ১৭৬-৮০।

অনুসন্ধান (পত্রিকা)। ১৫ কার্ত্তিক, ১২৯৪, ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৪, ১৫ পৌষ ১২৯৪, ১৫ মাঘ ১২৯৫, ৩১ আষাঢ় ১২৯৫, ৩১ ভাদ্র ১২৯৫, ১৫ আষাঢ় ১২৯৬, ১৫ শ্রাবণ ১২৯৬, ১৫ কার্ত্তিক ১২৯৬, ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৬, ১৫ আষাঢ় ১২৯৭, ৩০ কার্ত্তিক ১২৯৭, ১৫ পৌষ ১২৯৭, ১৫ মাঘ ১২৯৭, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮, ৩১ শ্রাবণ ১২৯৮, ৩০ চৈত্র ১২৯৮, ৩০ ফাল্গুন ১৩০০, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১।

আর্য্যদর্শন (পত্রিকা)। বৈশাখ ১২৮৮, চৈত্র ১২৮৯।

আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৬০, পৃ. ৫০২-১৮। বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন, ১৯৬৪। ২৫৭-২৯৭

এডুকেশন গেজেট (পত্রিকা)। ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১২৮২, ৮ মাঘ ১২৮২, ৩ আষাঢ় ১২৮৩, ৮ আশ্বিন ১২৮৮, ১৪ শ্রাবণ ১২৯৭।

কর্ণধার (পত্রিকা)। ১২৯৫-৯৬।

কল্পনা (পত্রিকা)। শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৮, চৈত্র ১২৮৮, বৈশাখ ১২৮৯, আষাঢ় ১২৮৯, ফাল্গুন ১২৯০।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বান্ধব, পৌষ ১২৮৯।

জ্ঞানাঙ্কুর (পত্রিকা)। জ্যৈষ্ঠ ১২৮২।

জয়ন্ত গোস্বামী, সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন, ১৯৭৪, পৃ. ১২৮, ৫৭২-৭৬, ৬৩৬-৩৯, ৬৭৪-৭৮, ৮১৫-১৮, ১০৫৯-৬৮, ১২২১-২২।

জীবেন্দ্র সিংহ রায়, আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতা : সনেট, ১৯৬৮, পৃ. ১৩৭-৪৪।

দূত (পত্রিকা)। ১৪ ভাদ্র ১২৮৭।

নবকৃষ্ণ ঘোষ, 'রাজকৃষ্ণ রায়', তর্পণ, ১৩২২।

নববিভাকর (পত্রিকা)। ৪ আশ্বিন ১২৮৮।

নববিভাকর সাধারণী (পত্রিকা)। ১২ ডিসেম্বর ১৮৮৭।

নবযুগ (পত্রিকা)। ১৬ শ্রাবণ ১২৯৭।

বঙ্গদর্শন ( পত্রিকা )। চৈত্র ১২৮০, চৈত্র ১২৮৯।
বঙ্গবাসী ( পত্রিকা )। ১৭ চৈত্র ১২৯০।
বঙ্গমহিলা ( পত্রিকা )। আষাঢ় ১২৮৩।
বান্ধব ( পত্রিকা )। শ্রাবণ ১২৮২, মাঘ ১২৮২, ফাল্গুন ১২৮২, আষাঢ় ১২৮৮।
বিদ্যোদয় ( পত্রিকা )। আগস্ট ১৮৮৩।
বিষ্ণু বসু, বাংলা নাট্যরীতি : বিকাশ ও বৈচিত্র্য, মার্চ ১৯৭৭, পৃ. ২১৬-১৮।
বৈদ্যনাথ শীল, বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা, ১৩৬৯, পৃ. ২১৪-২১৫।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় ( সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৫০ ) শ্রাবণ ১৩৫৫, পৃ. ৫-১০৬।
ভারত-সংস্কারক ( পত্রিকা )। ৮ ফাল্গুন ১২৮১, ১ মাঘ ১২৮২, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩।
ভারতী ( পত্রিকা )। শ্রাবণ ১২৮৬, আশ্বিন ১২৮৬।
মধ্যস্থ ( পত্রিকা )। ভাদ্র ১২৮২।
যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়', প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃ. ৭১-৭৭।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী,' রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৭৩, পৃ. ১০৬-১২।
রামদুলাল বসু, বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ, বৈশাখ ১৩৮১, পৃ. ১০৯-১৪৯।
শঙ্কর ভট্টাচার্য, বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান, ১৯৮২, পৃ. ৩৯১-৩২৩।
শরচ্চন্দ্র দেব, 'রাজকৃষ্ণ জীবনী', রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯১৫।
শশিশেখর বসু, 'রাজকৃষ্ণ রায়', কথাসাহিত্য, শ্রাবণ ১৩১৬, পৃ. ৭৮২-৮৭।
শিশির বসু, একশ বছরের বাংলা থিয়েটার, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৩, পৃ. ৪৩৪-৬৯।
সংবাদ প্রভাকর ( পত্রিকা )। ২৫ ফাল্গুন ১২৮১, ৮ পৌষ ১২৮২।
সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, দৃশ্যকাব্য-পরিচয়, ১৯৫০, পৃ. ৩৬৪-৭৯।
সঞ্জীবনী ( পত্রিকা )। ৩ চৈত্র ১২৯০।
সমাজদর্পণ ( পত্রিকা )। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩।
সহচর ( পত্রিকা )। ১৫ শ্রাবণ ১২৯৭।
সাধারণী ( পত্রিকা )। ১২ আষাঢ় ১২৮৩, ৩ আশ্বিন ১২৮৮।
সাহস ( পত্রিকা )। ১২ ভাদ্র ১২৮৮।
সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭৭, পৃ. ৩৩৩-৩৬, ৪১৬-২০।

সুলভ সমাচার ( পত্রিকা ) । ১৯ ভাদ্র ১২৮৮ ।

সুলভ সমাচার ও কুশদহ ( পত্রিকা ) । ৯ নভেম্বর ১৮৮৮, ৭ ডিসেম্বর ১৮৮৮ ।

সোমপ্রকাশ ( পত্রিকা ) । ১৬ চৈত্র ১২৮১, ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩ ।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, প্রথম ভাগ, ১৩১১, পৃ. ৮৪৪-৪৯ ।

হিন্দুহিতৈষিণী ( পত্রিকা ) । ২৫ পৌষ ১২৮২, ৪ আষাঢ় ১২৮৩ ।

*Bengal Magazine*, August 1876, June 1877, July 1877, December 1877.

*Bengalee*, July 8, 1876.

*Calcutta Review*, Vol. 73, no. 145, 1881, p. xi-xiv. Vol. 74, no. 147, 1882 p. ix-xi ; Vol. 79, no, 157, 1884, p. xxix.

*Hindoo Patriot*, March 30, 1874.

*Indian Christian Herald*, July 7, 1876, August 31, 1877.

*Indian Daily News*, March 14, 1894.

*Indian Mirror*, August 4, 1877 ; Januray 9, 1878 ; June 6, 1878, June 12, 1878 : July 27, 1878 ; September 21, 1880, December 27, 1992.

*Indian Nation*, April 7, 1884.

*National Magazine*, July 1890.

*National Paper*, July 5, 1876.

*Reis and Rayyet*, March 17, 1894.

*Statesman*, December 10, 1887.

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৫৯।

অহীন্দ্র চৌধুরী, বাংলা নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র, ১৩৬৫; বাঙালীর নাট্যচর্চা, ১৩৭৯।

আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ১৯৭০।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত, ১৩০৮।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭২।

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, তিনকড়ি বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী, ১৯৮৫।

সানুবাদ কল্কিপুরাণম্, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, ১৩২৯।

কালিদাসের গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, ১৩৬০।

কালীপ্রসন্ন সিংহ, হুতোম প্যাঁচার নক্সা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৩।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৯২।

কেশব চক্রবর্তী, ভারত-রুশকথা: বাঙালীর রুশচর্চা, ১৯৭৬।

ক্ষেত্র গুপ্ত, কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, ১৩৭০।

•গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গিরিশ-গ্রন্থাবলী, দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১—৩ খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৭২।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, সন্ন্যাসিনী মীরাবাই, ১৮৯২।

গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য সংকলিত, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে লেখা অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ, পুরশ্রী, ১০ নভেম্বর, ১৯৭৯।

গোপালচন্দ্র রায়, অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৭৯।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭১।

জৈমিনী ভারত, চন্দ্রনাথ বসু অনুবাদিত, ১৩১৭।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ১৯৩৭।

দিলীপকুমার রায়, ভিখারিণী রাজকন্যা, ১৯৫২।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, দুইখণ্ড, সাহিত্য-সংসদ্ ১৯৬৪।

দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৯২৬।

দেবনারায়ণ গুপ্ত, একশো বছরের নাট্যপ্রসঙ্গ, ১৩৮৯।

নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্মৃতি, ১৩২৭।

নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন', নবীনচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১৩৮১।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ছোটগল্পের সীমারেখা, ১৩৭৬; সাহিত্যে ছোটগল্প, ১৩৬৯।

প্রভাময়ী দেবী, বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য, ১৯৫৮।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম-রচনাবলী, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ, ১৩৬৬।

বনোয়ারীলাল রায়, জয়াবতী, ১৮৬৪।

বরুণ চক্রবর্তী, টডের রাজস্থান ও বাঙ্গালা সাহিত্য, ১৩৮৮।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, প্রজ্ঞাভারতী সংস্করণ, ১৩৮৯।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ১৩৪০।

সটীক বিষ্ণুপুরাণ, তিনকড়ি বিশ্বাস ভাষান্তরিত, ১৩০৩।

বুদ্ধদেব বসু, তপস্বী ও তরঙ্গিনী, ১৯৬৬।

বৃন্দাবন দাস, শ্রীচৈতন্যভাগবত, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন্, ১৯৮৩।

বৈদ্যনাথ শীল, বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, ১৩৭৭।

শ্রীমদ্ভাগবত, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন অনূদিত, ১৯৮৪।

শ্রীমদ্ভাগবত, হরফ্ প্রকাশনী, ১৯৭৭।

ভারতকোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম খণ্ড, ১৩৭১, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৭৩।

ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, ১৯৮২।

মৎস্যপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৩১৬।

মনোমোহন বসু, 'দৃশ্যকাব্য', মধ্যস্থ, পৌষ ১২৮১।

মন্মথনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৪৫।

মন্মথমোহন বসু, বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ১৯৪৮।

মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত, পাঁচ খণ্ড, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মধুসূদন-রচনাবলী, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, সাহিত্য-সংসদ, ১৯৬৫।

যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি, 'গল্প', কি লিখি, ১৩৬৩।

রথীন্দ্রনাথ রায়, ছোটগল্পের কথা, ১৯৫৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা, ১৩৬৮।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮-৭৩।

রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৯৫৬।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 'রুষিয়া রাজ্যের ইতিহাস', বিবিধার্থ সংগ্রহ, শ্রাবণ ১৭৭৫ শকাব্দ।

রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুবাদিত, দুইখণ্ড, ভারবি, ১৩৮২।
শঙ্খ ঘোষ, ছন্দের বারান্দা, ১৩৯১।
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৯৬৫; 'রূপকথা', বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ১৩৫৩।
শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের পাঁচালী, জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রিণ্টার্স।
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ, অলোক রায় সম্পাদিত, সাহিত্য-সংসদ, ১৯৮৪।
স্কন্দ-পুরাণ, কাশীখণ্ড, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৩০৮।
সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৫।
সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, ১৯৫৮।
সুবলচন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গালা অভিধান, ১৯১৭।
সুবোধ চৌধুরী, কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসু, ১৯৮৩।
সুশীল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ১৯৬৩।
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, ১৯৬৬।
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, 'শরচ্চন্দ্র দেব', বঙ্গভাষার লেখক, প্রথমভাগ, ১৩১১।
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ, ১৩৩৬; সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ১৩৬৪।
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, গিরিশচন্দ্র, ১৯৩৮।
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বাঙ্গালা নাটক, ১৯৫২।

Arnold Kettle, *An Introduction to the English Novel*, 1962.
Brewar, E. C., *The Reader's Handbook*, 1911.
Butcher, S, H., *Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art*, 1951.
Cassel's *Encyclopaedia of Literature*, 1953.
Cuddon, J. A., A *Dictionary of Literary Terms*, 1985
Das Gupta, Alokeranjan, *The Lyric in Indian Poetry*, 1962
Ellis-Fermor, Una, *The Frontiers of Drama*, 1964.
Flint Thrall, William, *A Handbook of Literature*, New York, 1936.
Forster, E. M., *Aspects of the Novel*, 1949.
Ghose, Lokenath, *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars & c.*, Part II, 1881.
Grierson, H. J. C., *Lyrical Poetry from Blake to Hardy.*
Keith, A. B., *Classical Sanskrit Literature*, 1958.

Lee, Sir Sidney, ed. *The Concise Dictionary of National Biography*, 1920.

Maughm, W. S, *Ten Novels and their Authors*, 1875.

Mookerjee, Sambhu Chunder, 'The Baroda Yellow Book'. *Mookerjee's Magazine*, March & April, 1875.

Nicoll, A., *The Theory of Drama*, 1931.

Preminger, Alex., ed. *Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*, 1875.

Shakespeare, W., *The Tudor Edition of William Shakespeare, The Complete Works*, 1875.

Shipley, J, T., *Dictionary of World Literature*, 1875.

Tod, James, *Annals and Antiquities of Rajasthan*, 1875.